বিশহাজার বছর আগে

প্রস্তর যুগের শেষে ঘর বাড়ি

অমূল্য সম্পদ

অলৌকিক কথা

আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার জনক
হিপোক্রেটিস

লিওনার্দো-দা-ভিন্সি

অমূল্য সম্পদ

লিওনার্দো-দা-ভিন্সির মোনা লিসা
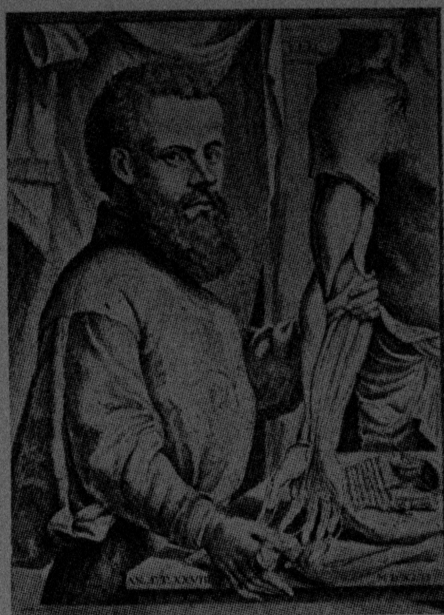
শব-ব্যবচ্ছেদ

শব-ব্যবচ্ছেদের আধুনিক রীতির প্রবর্তক
অ্যাণ্ড্রিআস ভেসালিআস

সভ্যতার মানদণ্ড
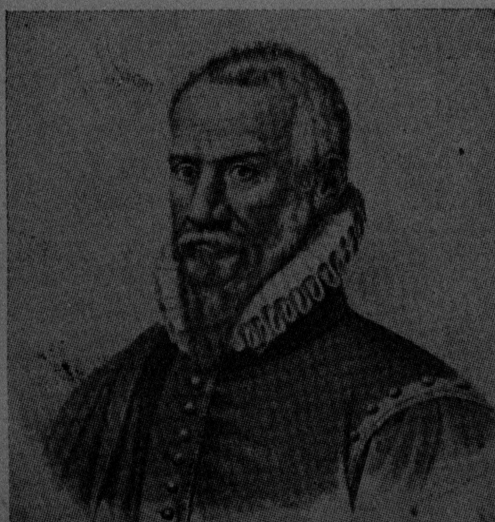
ষোল শতকে সার্জারীর যুগপ্রবর্তক আঁবরোজ পারী

ভেলকি থেকে ভেষজ

সার্জন হাণ্টার
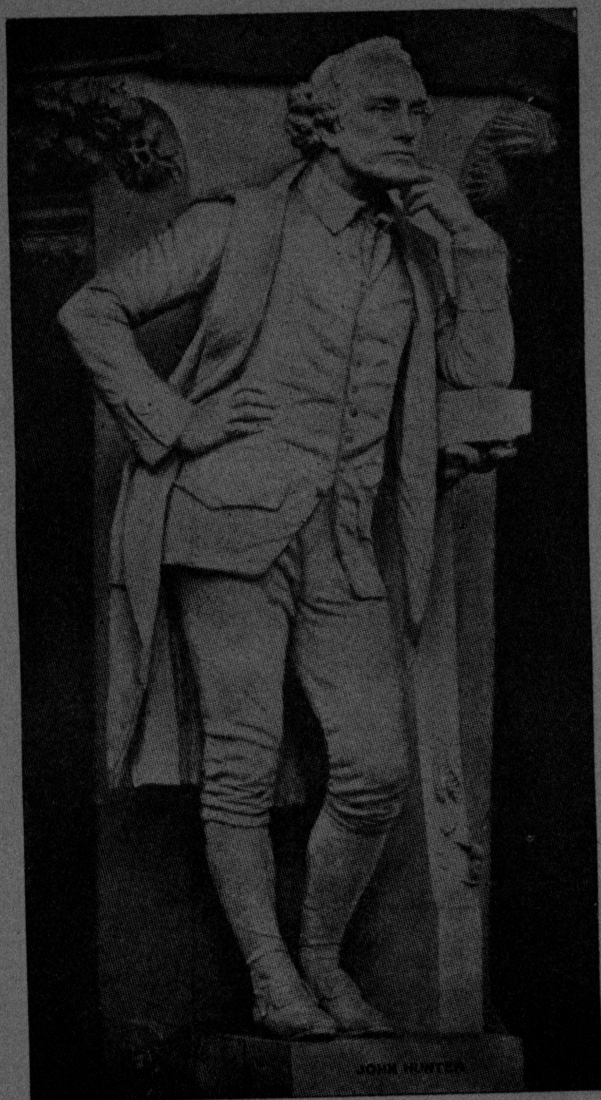
আঠারো শতকে সার্জারীর নতুন যুগের প্রবর্তক
জন হাণ্টার

আমি দেবদূত

জেনার ও বসন্ত
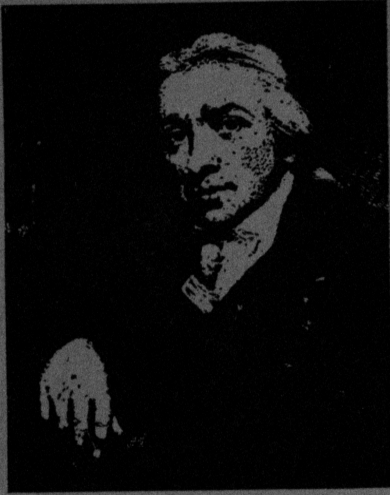
বসন্তের টিকা আবিষ্কারক
এডওয়ার্ড জেনার
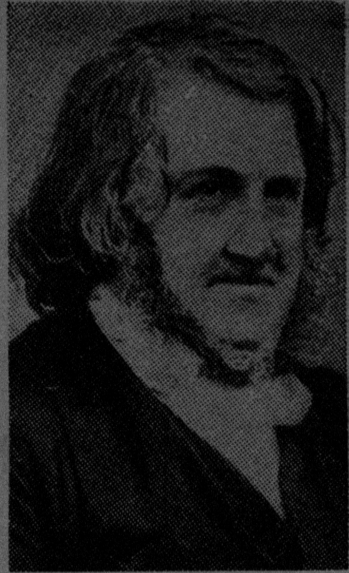
ক্লোরোফরমের প্রবর্তক
স্যার জেমস ইয়ং সিমসন

আমি দেবদূত
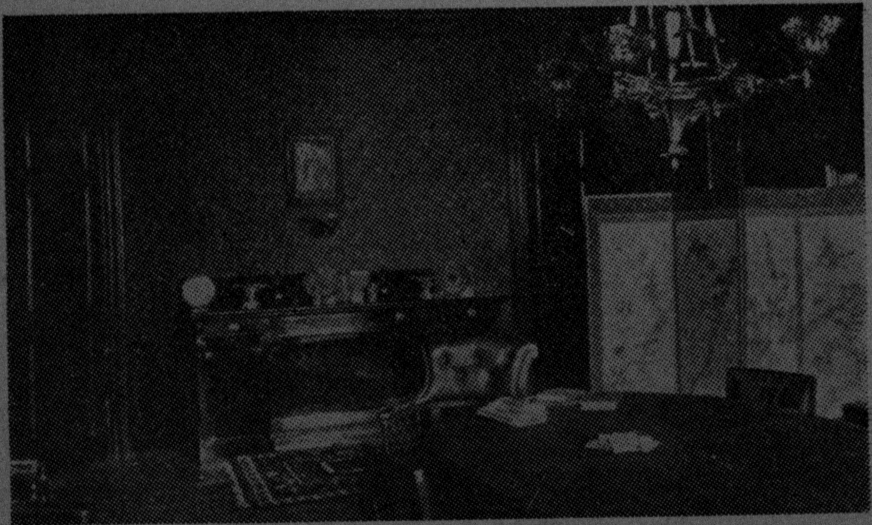
সিমসনের খাবার ঘর : এই ঘরে ক্লোরফরমের গুণ
সর্ব প্রথম পরীক্ষা করা হয়

ভেলকি থেকে ভেষজ

আনন্দকিশোর মুন্সী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো
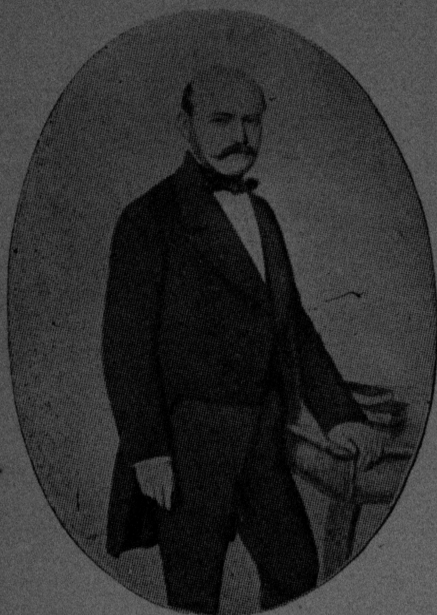
লুই পাস্তুর

প্রসব জনিত জ্বরের কারণ আবিষ্কারক
ইগনাজ ফিলিপ সেমেলভিস
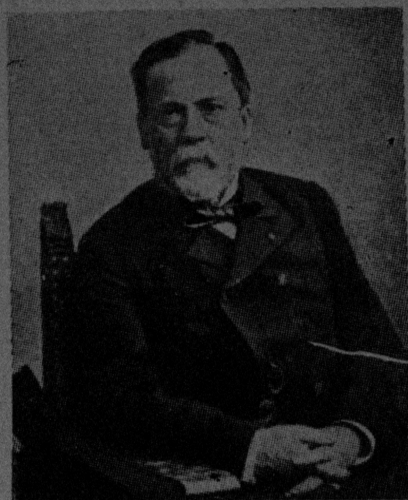
জীবাণুতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা
লুই পাস্তুর
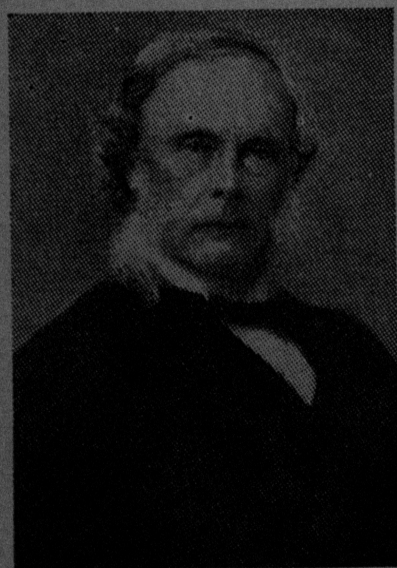
লর্ড লিষ্টার

সার্জারীতে জীবাণুশূন্য রীতির প্রবর্তক
লর্ড লিষ্টার
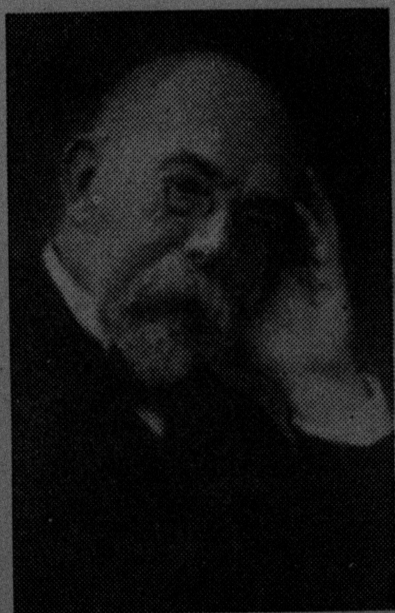
রবার্ট কক

কলেরা ও যক্ষ্মা জীবাণুর আবিষ্কারক
রবার্ট কক

প্রথম প্রকাশ—১লা বৈশাখ, ১৩৬৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—কালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, চালতাবাগান লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ—
অহিভূষণ মালিক

ব্লক—
স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই—
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

ছয় টাকা

পরশ পাথর

ক্যাম্পবেল হাসপাতালের এই ঘরে
স্যার উপেন্দ্রনাথ
ইউরিয়া ষ্টিবামাইন আবিষ্কার করেন

মধু মেহ

ইনসুলিনের আবিষ্কারক
স্যার ফ্রেডরিক গ্রাণ্ট ব্যানটিং

মধু মেহ

সতেরো শতকে প্যাংক্রিয়াসের
জারক রসের আবিষ্কারক
রেগনার দা গ্রাফ

সূচী

আশ্চর্য ফল

পারনিসাস অ্যানিমিয়ায় লিভার খাইয়ে
আরোগ্য রীতির প্রবর্তক রিচার্ড মিনো

ব্রহ্মাস্ত্র
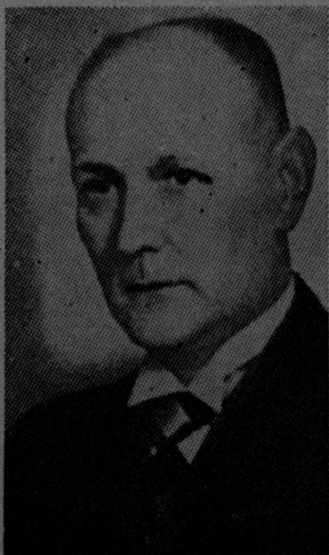
প্রনটসিল অর্থাৎ প্রথম
সালফাড্রাগের আবিষ্কারক
গেরহার্ড ডোমাগ

ভেলকি থেকে ভেষজ

আমেরিকার লেভারলি গবেষণাগারের
প্রথম ভারতীয় পরিচালক
ইয়েলা প্রাগডা সুব্বারাও

এই লেখকের অপর গ্রন্থ—

ডাক্তারের ডায়েরী (২য় সংস্করণ)

বাবা ও মাকে

আমার বিশিষ্ট এবং বহু পুরনো বন্ধু ডাঃ বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েক বছর আগে একবার আমাকে বলেছিলেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অভিনব সব আবিষ্কার নিয়ে কিছু লিখতে। বলেছিলেন, ইংরেজীতে এসব নিয়ে কত ভালো ভালো বই আছে কিন্তু বাঙলাতে কিছু নেই। ডাক্তারদেরও এদিকে উৎসাহ নেই মোটেই। আপনি কিছু লিখুন।

এই বলে তাঁর নিজের কয়েকখানা ভালো ভালো ইতিহাসের বইও আমাকে তিনি দিয়েছিলেন। যদিও বই ক-খানা সবই আমি পড়ে ফেলেছিলাম তখন, কিন্তু লিখতে কিছুই পারি নি সেই সময়। বইগুলি অবশ্য আর হাত-ছাড়া করি নি সেই থেকে।

বছর দুই আগে 'দেশ' পত্রিকার আলোচনা বিভাগ পড়তে পড়তে একদিন দেখলাম, ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কার হয়েছে কোথায় তাই নিয়ে বেশ একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই পুরনো বই ঘেঁটে স্যার রোনাল্ড রসের অদ্ভুত সেই জীবনীটি আবার আমাকে পড়তে হল। তারপর মনে হল, ম্যালেরিয়ার কারণ এবং বাহক সত্যিই যে মশা সে তথ্য যে প্রতিকূল অবস্থায় রস আবিষ্কার করেছিলেন আমাদেরই এই ভারতবর্ষে, সেই বিস্ময়কর কাহিনীটি ভালোই হয়ত লাগবে দেশ পত্রিকার পাঠকদের তুমুল এই বিতর্কের সময়।

দু-একদিনের মধ্যেই দেখা হল 'দেশ' পত্রিকার সহঃ সম্পাদক, আমার ছোট ভাইএর মত সাগরময় ঘোষের সঙ্গে। বললাম তাকে এই কথা। স্যার রোনাল্ড রসের অভিনব এই আবিষ্কারের গল্প শুনে উল্লসিত হয়ে বলল সাগর, এক্ষুণি লিখে ফেলুন আপনি। বেরিয়ে যাক 'দেশ' পত্রিকায় সামনের সপ্তাহেই।

কিছুদিন পরে সেবার এই কলকাতা শহরে বসন্ত রোগ হঠাৎ একদিন এপিডেমিক বলে ঘোষণা করা হল। তাই নিয়ে কথায় কথায় আবার একদিন সাগরের কাছে গল্প করলাম জেনারের কথা এবং বসন্ত রোগ

প্রতিরোধের অব্যর্থ সেই আবিষ্কারের কথা। আবার উৎসাহ দিয়ে বলল সাগর, লিখুন আপনি।

এমনি করেই লেখা হয়েছে 'ভেলকি থেকে ভেষজ,' সাগরের উৎসাহে; এবং ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'দেশ' পত্রিকায়। শুধু 'মোহাবেশ'টি নতুন রচনা, অন্য কোথাও এটি প্রকাশিত হয়নি ইতিপূর্বে।

এই রচনাগুলি তৈরি করবার সময় আবার নতুন নতুন বই যোগাড় করে এনে দিয়েছেন আমার বন্ধু ডাঃ বনবিহারী। উৎসাহ দিয়েছেন প্রতিটি লেখা পড়ে, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন আমাকে ডাঃ ফণীভূষণ ব্রহ্মচারীর কাছে, যাঁর অনুগ্রহে পেয়েছি আমি স্যার উপেন্দ্রনাথের কাহিনী।

তবু কিছুই হয়ত লেখা যেত না যদি ডাঃ অমল ঘোষ হাজরা গ্যারিসনের বিখ্যাত ইতিহাসখানা দীর্ঘদিনের জন্য আমার কাছে ফেলে না রাখতেন; আর আমার ছোট ভাই চুনী মাস্টার্স অফ মেডিসিন এবং ডেভিলস ড্রাগস অ্যাণ্ড ডক্টরস্‌খানা নিজে কিনে না দিত আমাকে।

সর্ব শেষের ঋণ স্বীকার করি লেডারলি প্রতিষ্ঠানের কাছে। সুব্বারাওএর জীবনী এবং ছবি এঁরাই আমাকে পাঠিয়েছেন।

যে সমস্ত পুস্তক এবং পুস্তিকা থেকে এই গ্রন্থে বর্ণিত সব ঘটনা এবং ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে তার বিস্তারীত তালিকা দেওয়া হল 'ভেলকি থেকে ভেষজের' শেষে।

'পাথর থেকে সোনার' দুটি চিত্র অহিভূষণের আঁকা।

গ্রন্থকার

বিশ হাজার বছর আগে

পাহাড়ের গা বেয়ে নদী। নিচে সমতল ভূমি। সবে ভোর হয়েছে। গাছে গাছে পাখির কাকলি শোনা যাচ্ছে।

সূর্য এখনও পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা; কিন্তু তার বিচিত্র বর্ণচ্ছটা আকাশময় ছড়ানো। সাদা মেঘের গায়ে তাই লাল রঙের আভা।

নদীর ধারে পাহাড়ের গুহায় একদল আদিম মানুষের বাস। গুহার মুখে বড় বড় সব পাথর। পাশে সারি সারি নানা রকমের অস্ত্র; সব পাথর ঘষে তৈরী।

কয়েকটি যুবতী মরা জন্তুর চামড়া হাতে ঐ গুহা থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। আশেপাশে কটাক্ষ হেনে হেলেদুলে নদীর দিকে চলে গেল। গত রাত্রে যে বুনো শুয়োর শিকার করা হয়েছে, তারই চামড়া আজ এরা পাথরের নুড়ি দিয়ে ঘষবে। নদীর জলে ধুয়ে তা পরিষ্কার করবে।

কাছেই এক গাছের তলায় আগুন জলছে। শুকনো পাতা আর ডালপালা কুড়িয়ে পাথর ঠুকে তাতে আগুন লাগানো হয়েছে। আগের দিনের ভুক্তাবশিষ্ট মাংস এই আগুনে আজ ঝলসানো হচ্ছে।

চারিধারে এক দঙ্গল বাচ্চা ছেলেমেয়ে লুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে এই মাংস সেঁকা দেখছে।

এমনি সময় একটি ছেলে টলতে টলতে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। মাত্র ১২।১৪ বৎসর তার বয়েস। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের সিংহদ্বারে এসে আজ যেন সে ভয় পেয়েছে। থমকে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু মুখখানা ওর শুকনো। কুঞ্চিত ভ্রূ। ভয়ে আতঙ্কে চোখ দুটি যেন কপালে উঠে গেছে।

একটু আগেও বেচারা গুহার ভেতর আরাম করে ঘুমিয়েছিল। মজার মজার স্বপ্ন দেখে মশগুল হয়ে পড়েছিল। দিদিরাই ওকে ঠেলে তুলেছে।

কাতুকুতু দিয়ে জাগিয়েছে। শেষে ঘুমকাতুরে বলে নদীর জলে চামড়া ধুতে চলে গেছে।

একটু পরেই এই বিপত্তি ঘটল। কোথা থেকে এক হিমশীতল দমকা হাওয়া এসে ওর দেহের প্রতি রন্ধ্রে যেন ঢুকে গেল। সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল।

এ-জিনিস যে কি, ঝড়ের মত হঠাৎ কে যে এল, ছেলেটি তা জানে। বেশ ভাল করেই চেনে। আশ্চর্য এই ভূত। প্রতিটিবার ঠিক এমনি করেই আসে। আগে থেকে খবর দিয়ে শেষে এসে টুঁটি চেপে ধরে। তাই বেচারা ভয় পেয়েছে। পাহাড় ছেড়ে নরম মাটি খুঁজছে।

একটু দূরে ঘাসে ছাওয়া সবুজ মাঠ। ঘাসের ওপর একঝাঁক শাদা রঙের পাখি। টলতে টলতে ছেলেটি এই মাঠে এসে ধপ করে বসল। ভয় পেয়ে ঝটপট ডানা মেলে পাখিরা সব আকাশে উড়ে পালিয়ে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে এই ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে ছেলেটি যেন হাল ছেড়ে দিল। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে অশরীরী ঐ শত্রুর হাতে অবশেষে নিজেকে সঁপে দিল।

মনে হল, কে যেন হঠাৎ ওকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। বুকের ওপর চেপে বসে দুহাত দিয়ে গলা টিপে ধরেছে।

অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মুখ দিয়ে তার করুণ এক আর্তনাদ বেরিয়ে গেল। সংজ্ঞাহীন দেহে সাংঘাতিক এক খিঁচুনি শুরু হল।

ভীষণ এই আর্তনাদ পাহাড়ের গায়, গুহায় গুহায়, করুণ এক প্রতিধ্বনি তুলে দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে গেল।

পাহাড়ের পাশে গুহার ভিতর, নদীর ধারে, গাছতলায়, ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ হরেক রকমের মানুষ। তবু কি আশ্চর্য, ভয়ার্ত এই চিৎকার শুনে একটুও কেউ চমকাল না! কেউ ছুটে এল না! নদীর পথে যেতে যেতে যুবতীরা পর্যন্ত মুচকি হেসে চলে গেল। কেউ ফিরে তাকাল না।

সবাই জানে, এই চিৎকার নতুন কিছু বস্তু নয়। কারু মনে তাই কোন শঙ্কা নেই, ভয় নেই। এমন কি সামান্য একটু কৌতূহলও নেই। মাঝে মাঝে ছেলেটার দেহে এমনি এক ভূত ঢোকে। খানিকক্ষণ কষ্ট দিয়ে আবার ছেড়ে চলে যায়।

কিন্তু এই আর্তনাদ শুধু মাত্র একটি বুকে গিয়ে তীরের মত বিঁধল।

সে ওর মা। গাছের তলায় আগুনের ওপর মাংস সেঁকা ফেলে রেখে তাই বেচারী ছুটে এল। ছেলের মাথা কোলে নিয়ে শুধু বিলাপ করে কেঁদে উঠল।

ছেলেটার মুখ দিয়ে এখন ফেনা উঠছে। চোখ দুটি গোল হয়ে চারিদিকে ঘুরছে। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। হাতে পায়ে খিঁচুনি হচ্ছে।

দুঃখিনী মায়ের করুণ ঐ কান্না শুনে এক বুড়ী লাঠি হাতে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। এই বুড়ী ওর ঠাকুরমা। শাদা চুল। ফোকলা দাঁত। কিন্তু বুড়ী জাদু জানে। দেহে কোথাও ক্ষত হলে কিংবা কোন ভূত ঢুকলে, কী দিতে হয়, সব তার ঝুলিতে থাকে।

এই ঝুলি থেকে বুড়ী ধারালো এক মাছের কাঁটা নিয়ে ছেলেটার হাতে শিরার ওপর প্যাঁট করে বিঁধিয়ে দিল। দরদর করে রক্ত বেরুল, তবু ভূত ছাড়ল না।

এমনি সময়ে ছেলের বাবা এসে নতুন এক মন্ত্র ছাড়ল। বিকট শব্দ করে গাছের ডাল হাতে নিয়ে এই মন্ত্র পড়তে হয়। আর থেকে থেকে লাফিয়ে উঠে ঐ গাছের ডাল রুগীর গায় মারতে হয়।

বিশ হাজার বছর আগে
চিকিৎসকের পোশাক

এত সব করেও যখন দেহ থেকে ভূত তাড়ানো গেল না, তখনই ওঝা ডাকা হল।

এই ওঝাই মানব জাতির প্রাচীনতম চিকিৎসক। দলের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন অসাধারণ এক ব্যক্তি। যেমন অদ্ভুত তার ক্ষমতা, তেমনি বিচিত্র তার পোশাক। মৃত জন্তুর রোমশ চামড়া দিয়ে তার সর্ব অঙ্গ ঢাকা। মাথায় বড় বড় দুটি হরিণের মত শিং। পেছনে শেয়ালের মত একটি লেজ আর বাঁদরের মত মুখ।

দেহে যখন ভূত ঢোকে, সুস্থ দেহ হঠাৎ যখন পঙ্গু হয়, এই লোকটিই ভয় দেখিয়ে, মন্ত্র পড়ে কিংবা কোন গাছ-গাছড়ার তিক্ত রস খাইয়ে ঐ শয়তানকে বশীভূত করে। দেহ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

শয়তান অথবা ভূত পর্যন্ত যার কাছে জব্দ হয়, মানুষ তাকে ভয় করবে তাতে আর আশ্চর্য কি? কাজেই ছেলে বুড়ো সবাই একে ভয় করে। ভক্তি-শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

প্রস্তর যুগের মানব-দম্পতি

আদিম মানুষ জানে, বাঁচতে হলে লড়তে হবে। তাই শত্রুকে সে ভয় পায় না। নিজের শক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে হিংস্র জন্তু সে শিকার করে, বিষধর সর্প মেরে নিজের প্রাণ রক্ষা করে। এমন কি, ভিন্ন দলের অজানা মানুষও তার কাছে শত্রু। তাই দলে দলে যুদ্ধ হয়। একদল অন্য দলকে পরাজিত করে। সেই দলের নারী বিজেতার ভোগ্যা হয়।

কিন্তু যে শত্রু হাওয়ার সঙ্গে লুকিয়ে থাকে, চোখে যাকে দেখা যায় না, হাতে যাকে ধরা যায় না, তার সঙ্গে লড়াই করবে কে?

এই কাজ যার, তার নাম ওঝা। তার নাম পুরোহিত। তারই অন্য নাম চিকিৎসক। তাই অমন বিদ্‌ঘুটে তার পোশাক। অমন ভয়াল তার আচরণ।

মুমূর্ষু এই ছেলেটিকে দেখে অমন জবরদস্ত ব্যক্তিও আজ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। ভূত তাড়াবার প্রচলিত মন্ত্রতন্ত্র আস্ফালন কি মারধোর কিছুই সে আজ করল না। বারকয়েক ছেলেটির চারপাশে ঘুরে শুধু নিজের দাড়িতে ঘন ঘন হাত বুলোতে লাগল।

স্থির দৃষ্টি দিয়ে খানিকক্ষণ ছেলেটিকে দেখে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, এ-ভূত ওর মাথায়। খুলি ফুটো না করলে ও আর বেরুবে না।

এই কথাটা নূতন। বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বুড়ী ঠাকুরমা বলল, তাই আজ কোন মন্ত্রই ধরে নি। সব জাদু ব্যর্থ হয়েছে। শয়তানটা খুলির ভেতরই আটকে আছে।

ছেলেটির মাথা নিজের কোলে নিয়ে মা এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। মাথা ফুটো করা হবে শুনে ভয়ব্যাকুল চোখে একবার ঐ চিকিৎসক আর একবার তার স্বামীর দিকে চেয়ে মুমূর্ষু ঐ ছেলেকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে বজ্রপাত-ভীত মানব

রুগীর কিন্তু কোন হুঁশ নেই। কোন কষ্ট নেই। মার কোলে মাথা রেখে অকাতরে ঘুমিয়ে আছে।

মুহূর্তের মধ্যে রটে গেল, মাথার খুলি ফুটো করে ভূত বার করা হবে। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। হাতের কাজ ফেলে রেখে সবাই এখন ছুটে এল।

কিন্তু মাথার খুলি ফুটো করা যার তার কর্ম নয়। বিশেষ একটি লোক শুধু এই কাজই শেখে। বংশপরম্পরায় কাটা-ছেঁড়া করে নিজের হাত পাকায়। তারই কাছে অগত্যা আজ খবর পাঠানো হল।

এই লোকটির চেহারা যেমন রুক্ষ, হাতও তেমনি শক্ত এবং পাকা। চোখ দুটি যেন জবাফুলের মত লাল। হাতে তার চামড়া দিয়ে মোড়া পাথরের সব অস্ত্র। এই সেই আদিম কালের প্রাচীনতম সার্জন।

এই সার্জন যখন এল তখনও ছেলেটি মার কোলে ঘুমিয়ে আছে আরামে।

এইবার তাকে তুলে ঘাসের ওপর শোয়ানো হল। তিন-চারজন জোয়ান লোক তার হাত পা মাথা শক্ত করে ধরে রাখল।

খবর পেয়ে দলপতি এখন নিজে এসে দাঁড়িয়েছে। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ শুরু করেছে। পাশেই একটা অগ্নিকুণ্ড। একটু দূরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েরা এই আজব কাণ্ড দেখছে।

কয়েকজন পুরুষের গলায় ঢাকের মত এক বাদ্য এবং হাতে সরু গাছের ডাল। সার্জনের ইঙ্গিতে এরা এখন ঢাক বাজাতে শুরু করল।

খুব ধারালো দেখে একটি অস্ত্র নিয়ে সার্জন রুগীর মাথায় বসিয়ে দিল। একটানে চামড়া কেটে ফেলল। এইবার ছেলেটির হুঁশ হল। আর একটি পাতলা পাথর দিয়ে সার্জন ঐ কাটা চামড়া সরিয়ে দিল। অমনি মাথার শাদাখুলি বেরিয়ে গেল।

প্রস্তরযুগের শিকারী

ক্ষতের মুখ দিয়ে এখন ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। এই রক্ত বন্ধ হবে কি করে? প্রস্তর যুগের আদিম সার্জন তাও ভাল করে জানে।

অগ্নিকুণ্ড থেকে জ্বলন্ত একটি সরু ডাল তুলে সে ক্ষতের মুখে ঘষে দিল। আগুনে পুড়ে রক্তপাত নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু নিদারুণ যন্ত্রণায় ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল! হাত-পা তার শক্ত করে ধরা। তাই ছটফট করবার উপায় নেই। মাথাটিও তার আটকা। তাই মাথাও সে নাড়তে পারে না। শুধু মুখটি তার খোলা। সেই মুখ দিয়ে মর্মান্তিক এক ডাক ছেড়ে বেচারা কেঁদে উঠল।

কিন্তু তখন সমবেত জনতা পুরোহিতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করছে। ঢাকীরা প্রাণপণে ঢাক বাজাচ্ছে। এই বিকট শব্দের মধ্যে ছেলেটির ঐ ব্যাকুল আর্তনাদ কারু কানে পৌঁছল না।

সার্জন চটপট আর একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুলি কেটে গোল একটি চাকতি তুলে ফেলল। একমুঠো কচি ঘাস চিবিয়ে ক্ষতের ওপর বসিয়ে দিল।

অপারেশন শেষ হল। জ্ঞানহীন ঐ ছেলেটাকে তুলে এখন গুহার ভেতর নিয়ে যাওয়া হল।

ছেলেটা কয়েকদিন অজ্ঞান হয়েই পড়ে রইল। গা তার তপ্ত পাথরের মত গরম। মাথার ফুটো দিয়ে সেই ভূত যেন তরল হযে গলে গলে বেরিয়ে গেল।

দিনরাত পাশে বসে মা তার সেবা করল। বুড়ী ঠাকুমা বন থেকে গাছ-গাছড়া তুলে এনে খাওযাল। পাতা চিবিয়ে ক্ষতের ওপর লাগিয়ে দিল। ধীরে ধীরে ছেলেটি আবার একদিন উঠে বসল। মাথার ক্ষত শুকিয়ে গেল।

তারপর আবার একদিন তার খিঁচুনি শুরু হল। এইবার মাথার উল্টো দিকে আর একটি ফুটো করা হল।

বিনা উপদ্রবে আবার কিছুদিন কেটে গেল। শেষে একদিন কী যে ওর হল। আর সে গুহায় ফিরল না। খুঁজে খুঁজে কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

৪।৫ দিন পর হাত-পা-ভাঙা তার মৃতদেহ পাওয়া গেল, পাহাড়ের নিচে।

প্রস্তরযুগের শিল্পী

আবার সেই চিকিৎসককে খবর দেওয়া হল। মৃতদেহ দেখে বিজ্ঞের মত সে বলল, পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েই বেচারার মৃত্যু হয়েছে। পাহাড়ের ওপরে যখন উঠেছিল, তখনই হযতো আবার ঐ ভূত ঢুকেছে। খিঁচুনি শুরু হয়েছে। টাল সামলাতে না পেরে তাই বেচারা পড়ে গিয়ে মরে গেছে।

যদিও এই ঘটনা নিতান্তই কাল্পনিক, তবু এটা একেবারে আজগুবি নয়। বাস্তবের ভিত্তিতেই এই কাহিনী গড়া।

পৃথিবীর সর্বদেশে প্রত্নতাত্ত্বিকরা যে সব প্রস্তর যুগের মাথার খুলি মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছেন, তার মধ্যে এইরকম ফুটো খুলি অনেক পাওয়া

গেছে। খুলি ফুটো করবার পরেই যে তাদের মৃত্যু হয় নি বরং আরো অনেকদিন তারা বেঁচে ছিল, তারও প্রমাণ আছে।

এমনও খুলি আছে যার মধ্যে অনেকগুলি ফুটো। এক-একটা ফুটোর পাশ থেকে নতুন নতুন হাড় গজিয়েছে। এই গজানো হাড় কোন ফুটোয় কত বেশী শক্ত তাই দেখে ঐ ফুটো করার সময় পর্যন্ত নির্ণয় করা যায়। এইভাবে অনেকবার মাথার খুলি ফুটো করেও যে তখনকার মানুষ বেঁচে ছিল তা বোঝা যায়।

অথচ তখনকার মানুষ এখনকার মত এত সভ্য হয় নি। বিজ্ঞানের কোন সাহায্যই সে পায় নি। মনুষ্যদেহের বিচিত্র সব কলকব্জা কিছুই সে জানত না। আর হাতে ছিল তার একটিমাত্র অস্ত্র। শুধু এক টুকরো পাথর।

সেই পাথর দিয়ে এত বড় কঠিন অপারেশন ঐ যুগে কি করে যে সম্ভব হত আজও কেউ তা বোঝে না।

আঘাত পেয়ে কিংবা কোন অসুখে পড়ে যেদিন মানুষ প্রথম কাবু হয়, সেইদিন থেকেই চিকিৎসা-বিদ্যার শুরু। সেই আদিম কালে। গভীর অরণ্যে। অথবা পাহাড়ের কোন এক নিভৃত গুহায়।

প্রয়োজনের তাগিদে মায়া, মমতা এবং সহানুভূতি দিয়ে এই বিদ্যার জন্ম। মূলে সেই একটিমাত্র প্রবৃত্তি। জীবনযুদ্ধে মানুষের আত্মরক্ষা এবং বংশবৃদ্ধি।

পাখিরা পায়ে আঘাত পেলে সরু সরু ডাল এনে ভাঙা পায় জড়িয়ে রাখে। তাই দেখে মানুষ ভাঙা পায়ে গাছের ডাল লতা দিয়ে বেঁধেছে। পশুরা দেহের ক্ষত জিব দিয়ে চাটে। মানুষও তাই কাটার ক্ষত থুতু দিয়ে ভিজিয়েছে। নখ দিয়ে কাঁটা তুলে সেই ক্ষতে কাদামাটি প্রলেপ লাগিয়েছে। গাছের পাতা চিবিয়ে কখনও হয়তো খেয়েছে, কখনও বা বিস্বাদে ভয় পেয়ে থু থু করে ফেলে দিয়েছে। বিষাক্ত সর্পের দংশনে ক্ষতে মুখ লাগিয়ে সেই বিষ চুষে বার করেছে।

এমনি করেই মানুষ চিকিৎসাবিদ্যা শিখেছে। লতাপাতা-গাছগাছড়ার গুণ আবিষ্কার করেছে। ভেষজের সন্ধান মানুষ পেয়েছে ভুলের পর ভুল করে। হোঁচটের পর হোঁচট খেয়ে।

পৃথিবীর সর্বদেশে আদিমকালে মানুষ প্রাকৃতিক সব ঘটনা দেখেই ভয় পেয়েছে। অরণ্যে পাতার মর্মর শুনে চমকে উঠেছে। ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত

ভূমিকম্প সূর্য- অথবা চন্দ্র-গ্রহণ সবই অদৃশ্য এক হিংস্র দেবতার প্রচণ্ড রোষ বলে ভেবেছে।

মানুষের মৃত্যুও যে স্বাভাবিক এক পরিণতি সে কথা সে বোঝে নি। মনে হয়েছে, এ যেন নিষ্ঠুর এক দানবের হিংস্র প্রতিশোধ। সেই থেকে মানুষ মরে ভূত হয় এবং সেই ভূত মানুষের ঘাড়ে চাপে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে।

তাই সুস্থ দেহ বিকল হলে সেও যে ঐ অপদেবতারই কীর্তি অথবা রুষ্ট দেবতার অভিশাপ তাতে আর সন্দেহ কি ?

কাজেই ভূত তাড়াবার দুর্বোধ্য সব মন্ত্র ও নানাবিধ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হল। রুষ্ট দেবতার তুষ্টির জন্যে যাগ-যজ্ঞ ও পশুবলির ব্যবস্থা হল।

প্রাচীন কালের চিকিৎসা-মন্দির

তাই সর্বদেশে প্রাচীনকালে মন্ত্র দিয়ে রোগ সারাবার ব্যবস্থা দেখা যায়। মন্ত্রপূত পাথর, গাছের শেকড় অথবা মানুষ এবং জীবজন্তুর নখ, দাঁত বা হাড় দেহে ধারণ করে রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা দেখা যায়।
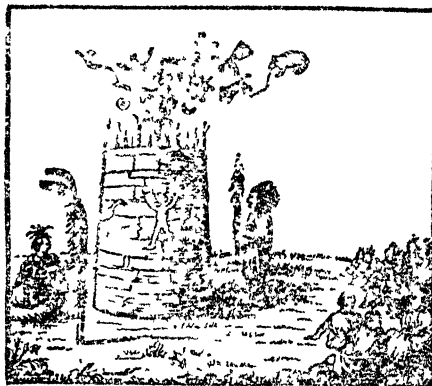
প্রাচীনকালের সেই প্রচেষ্টা পরবর্তী যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন সংস্কারে রূপান্তর নিয়েছে। সভ্য দেশে এখনও তার প্রভাব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। আজও তাই সভ্য মানুষ দেহে মাদুলি ধারণ করে। ঐজাতীয় পাথর অথবা অন্য কোন ধাতু দেহের সঙ্গে বেঁধে রাখে।

কিন্তু আশ্চর্য এই মানুষ! অদ্ভুত তার প্রকৃতি। রোগ-সৃষ্টিকারী অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে নেমে একদিকে যেমন সে ধর্মবিশ্বাস এবং সংস্কারের গণ্ডি তৈরি করেছে, তেমনি আবার বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ভেষজের আবিষ্কার করেছে। লতাপাতা ফলমূল থেকে ওষুধ তৈরি করেছে। ভবিষ্যতের জন্য সেই গাছ-গাছড়া সঞ্চিত করে রেখেছে কিংবা নিজের বাগানে চাষ করেছে।

এই পৃথিবীতে এমন কোন খনিজ জান্তব, অথবা উদ্ভিজ্জ বস্তু নেই যা মানুষ রোগ সারাতে ব্যবহার করে দেখে নি।

আজকালকার অনেক চিকিৎসারীতিই সেই আদিমকালের ভূত তাড়াবার পন্থা থেকে উদ্ভূত। যেমন গা দলাই-মলাই বা মাসাজ। গরম জলে রুগীকে স্নান করানো। ঠাণ্ডা গরম নানারকমের স্নানের পদ্ধতি। ব্যথায় গরম সেঁক কিংবা পুলটিস। বাতের ব্যথায় উগ্রগন্ধী চামড়া-জ্বালানো মালিশ। এ সবই দেহ থেকে ভূত তাড়াবার রকমফের। এমন কি কোষ্ঠকাঠিন্যে জোলাপের ব্যবহারও ঐ একই কারণ থেকে উদ্ভূত।

কাজেই আদিম যুগের মানুষের অদ্ভুত এই প্রচেষ্টা থেকেই বর্তমানকালের চিকিৎসা-বিদ্যার সৃষ্টি। সেকালের ভূততত্ত্ব এ-কালের জীবাণু-তত্ত্বে পরিণত হয়েছে।

পাথর কিংবা মাদুলি ধারণ করে ভূতের হাত থেকে রক্ষা পাবার বুদ্ধি থেকেই রোগ থেকে আত্মরক্ষার বুদ্ধি এসেছে; বিজ্ঞানসম্মত রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

পাথর থেকে সোনা

কথিত আছে, বাঁদরের পেটে একবার যদি কোন ক্ষত হয়, কোথাও যদি একটুও একবার কেটে যায়, সে বাঁদর আর বাঁচে না।

জীবজন্তুর মধ্যে বাঁদরেরই কৌতূহল সবচেয়ে বেশী। তাই একের দেহে আঘাত লাগলে অপরে ছুটে আসে। তুহাত দিয়ে টেনে ঐ ক্ষত পরীক্ষা করে। নখ দিয়ে খুঁটে দেখে।

প্রত্যেকে ভাবে, তারও বুঝি কিছু কর্তব্য আছে। তাই একের চিকিৎসা শেষ হলে আর-একটি বাঁদর ছুটে আসে। গম্ভীর হয়ে ক্ষত পরীক্ষা করে; নখ দিয়ে খোঁটে। শেষে বিজ্ঞের মত খড়-কুটো পাতা যা পায় তাই দিয়ে ঐ ক্ষত ঢেকে রাখে।

এমনি করে দলসুদ্ধ সবাই যখন একে একে ঐ ক্ষত খোঁটে, সে ঘা আর সারে না। বাড়তে বাড়তে অবশেষে বেচারার মৃত্যু হয়।

মানুষের স্বভাবও অনেকটা এইরকম। দুর্নিবার কৌতূহল ও জিজ্ঞাসায় ভরা। এই স্বভাবগত কৌতূহলের ফলেই মানুষ সভ্য হয়েছে। নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও যুগে যুগে মানুষ দূরন্ত অভিযানে যাত্রা করেছে। বাধার পর বাধা পেয়েছে; তবু কৌতূহল যায়নি।

কবে মানুষ প্রথম সভ্য হয়, নিজের তুখানা হাত এবং বুদ্ধি দিয়ে কবে সে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে এই পৃথিবীর মাটির ওপর নিজেকে একদিন সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আজও কেউ তা জানে না।

তাই মানবজাতির অভ্যুদয় এবং তার সভ্যতার ইতিহাস বড় বড় ফাঁকে ভরা। শুধু মাত্র আন্দাজ এবং কল্পনা করে সেই ফাঁক ভরতে হয়। মাটির নিচে, পাহাড়ের গায়, গুহার গহ্বরে, সমুদ্রের তলায় এই ইতিহাস খুঁজতে হয়।

মনে হয়, মানুষ প্রথমে জীবনধারণ করেছে গাছের ফল খেয়ে, আর শিকার করা মাছ এবং পশুপাখির মাংস খেয়ে। সেই পশুপাখিকেই মানুষ পরে পোষ

মানিয়েছে; নিজের কাজে লাগিয়েছে। মাতৃদুগ্ধের বদলে শিশুরা গোরু-ছাগলের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছে। তারপর সৃষ্টি হল কৃষিকাজ, শিল্প এবং বাণিজ্য। মানবজাতি সভ্য হল।

আগে পুরুষদের প্রধান কাজ ছিল শিকার। শিকার ছাড়া দল রক্ষা হত না, আত্মরক্ষাও সম্ভব হত না।

আর মেয়েদের কাজ ছিল, খাদ্য সংগ্রহ। বন জঙ্গল থেকে ফলমূল মধু ইত্যাদি জোগাড় করা। নিজের গুহায় এনে সঞ্চিত করা। সেই থেকেই গুহার আশেপাশে মাটিতে মেয়েরা ফলের বীচি থেকে চারাগাছ গজিয়েছে। কৃষিকাজ সৃষ্টি করেছে।

স্ত্রী-জাতিই বোধহয় প্রথম মালা গাঁথে। বুননশিল্পের সৃষ্টি করে।

অসুখ হলে এই মেয়েরাই চিরদিন প্রাথমিক চিকিৎসা করেছে। সেবা করেছে।

প্রাচীনকালে সভ্য ব্যাবিলনে নিয়ম ছিল, কঠিন কোন অসুখ হলে রোগীকে বাজারে নিয়ে রাস্তার ধারে শুইয়ে রাখতে হবে। রাস্তা দিয়ে যে যাবে সেই এসে রোগীকে দেখবে, কষ্ট উপশমের ব্যবস্থা দেবে।

অথচ তখন ব্যাবিলনে চিকিৎসকের কোন অভাব ছিল না। এমনকি সুসভ্য মিশরের মত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও যথেষ্ট ছিল। তবু তখন চিকিৎসকের বিধানের চেয়ে রোগে সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশী বলে স্বীকৃত হত।

পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে রোগ এবং তার চিকিৎসা জানে না। আজও দেখা যায় প্রতিটি লোকই যেন এই বিদ্যায় পারদর্শী। বিজ্ঞ চিকিৎসক নিজে যে রোগের ওষুধ জানেন না, সাধারণ লোক তার ওষুধ জানে। নির্ভয়ে ব্যবস্থা দেয়। অব্যর্থ বলে গর্বভরে ঘোষণা করে।

পণ্ডিতদের মতে আধুনিক সভ্যতা শুরু হয় খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বছর থেকে। সেই সময়ে একদিন আগুনে এক ধাতব প্রস্তর গলতে দেখে মানুষ চকচকে এক ধাতুর সন্ধান পায়। সেই ধাতু তামা। তার আগে চল্লিশ হাজার বছর ধরে ছিল প্রস্তর যুগ। অথচ ঐ পাথর ঘষেই মানুষ অস্ত্র তৈরি করেছে। সেই অস্ত্রে শিকার করেছে, কৃষিকাজ করেছে, পাহাড়ের গুহায় খোদাই করে চিত্র এঁকেছে। এমন কি হাড়ের ওপর, শিংএর ওপর সূক্ষ্ম সব নকশা কেটেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য, মাথার খুলি ফুটো করে অপারেশন পর্যন্ত করেছে।

ঐ যুগের শেষে পাথরের অস্ত্র দিয়ে গাছের গুঁড়ি কেটে কাঠ ও লতাপাতা দিয়ে মানুষ যে বাড়িঘর পর্যন্ত তৈরী করেছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মানবসভ্যতার উৎপত্তি সর্বপ্রথম এই পৃথিবীর কোন দেশে যে হয় তাও সঠিক জানা নেই। তামার সঙ্গে টিন মিশে যে ধাতু তৈরী হয় তার নাম ব্রোঞ্জ। এই যুগ শুরু হয় খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বছরে। প্রাচ্যদেশে। মিশর, মেসোপোটামিয়া এবং ভারতবর্ষে।

মিশরের সবচেয়ে আশ্চর্য যেমন পিরামিড, তার চেয়েও বড আশ্চর্য তার মামী। সত্তর দিন লবণ-জলে মৃতদেহ ডুবিয়ে রেখে, পরে তেল মশলা ইত্যাদি মেখে কাপড জড়িয়ে ঐ মৃতদেহ মামীতে পরিণত হত। কি সে বিচিত্র পদ্ধতি মানুষ এখন আর তা জানে না। অথচ সেই মামী এখনও অবিকৃত আছে। মানুষের হাতে গডা কাদামাটি ও পাথর দিযে তৈবী বিরাট ঐ পিরামিডেব গর্ভে। হাজাব হাজার বছর আগে মানুষের দেহে যে রোগ হত তারই সাক্ষ্য বহন কবে।

আধুনিক চিকিৎসার উৎপত্তি
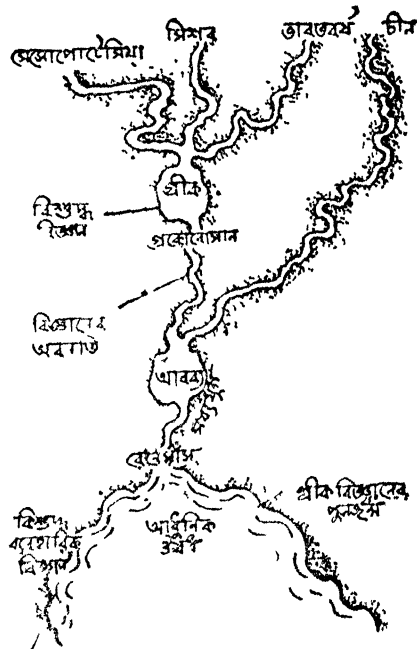
ঐ মামীর গায় দাগ দেখেই জানা যায সে যুগে বসন্ত রোগ ছিল। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মেরুদণ্ড আজকালকাব মতই বেঁকে যেত। পাইওবিযা হয়ে দাঁত নষ্ট হত। গল-ব্লাডার এবং কিডনিতে পাথব হয়ে সেকালেও লোকের মৃত্যু হত।

সেকালে নীল নদের ধারে প্যাপিরাস নামে একরকমের গাছ প্রচুর জন্মাত। সেই গাছের ছাল থেকে কাগজ তৈরী করে পণ্ডিতরা যা লিখে গেছেন আজও তা নষ্ট হয় নি।

খ্রীঃ পূঃ ২১৬০-১৭৮৮ বছরের পুরনো এমনি এক প্যাপিরাস, পশু চিকিৎসা এবং স্ত্রীরোগ সম্বন্ধে লেখা। বিভিন্ন অসুখের প্রতিরোধক সম্বন্ধে যে সব

ওষুধের নাম এতে লেখা আছে এখনও পণ্ডিতরা সেইসব পুরনো মিশরীয় শব্দের অর্থ খুঁজে পান না।

সার্জারি সম্বন্ধে লেখা প্যাপিরাসখানা খ্রীঃ পূঃ ১৬০০ বছরে লেখা। পনেরো ফুট লম্বা। কালো এবং লাল কালিতে লেখা। লাল কালির এই বোধহয় সর্বপ্রথম ব্যবহার।

এই প্যাপিরাস থেকে জানা যায় সার্জারি তখন খুবই উন্নত ছিল। রোগের বিভিন্ন নাম এবং তার চিকিৎসা মাথা থেকে পা পর্যন্ত আলাদা আলাদা করে বিশদভাবে বর্ণনা এর আগে আর কোথাও পাওয়া যায় নি। চিকিৎসকের কর্তব্য সম্বন্ধে এতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা এইখানাই তখনকার দিনের একমাত্র রচনা যার মধ্যে ভূত প্রেত অথবা মন্ত্র-তন্ত্রের কোনও উল্লেখ নেই।

সে যুগে মিশরেব চিকিৎসকরা সবাই ছিলেন পুরোহিত। কাজেই রোগের কারণ এবং চিকিৎসাবিদ্যায় সর্বক্ষেত্রে মন্ত্র-তন্ত্র এবং ভূত-প্রেত ইত্যাদির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না।

ওষুধ ব্যবস্থায় তাই ভেষজেব সঙ্গে ভেলকির সংমিশ্রণ আছে। মন্ত্র-তন্ত্রের প্রভাব আছে। তবু বিভিন্ন রকমের যত ওষুধ তখন মিশরে তৈরী হত অন্য কোথাও সে যুগে তা সম্ভব ছিল না। সেইসব ওষুধের মধ্যে আফিং, ক্যাস্টর এবং অলিভ অয়েল এবং বহু ধাতব পদার্থ এখনও ব্যবহার হয়।

মিশরেই প্রথম বীয়ার তৈরী হয়। গেঁটেবাতের জন্য কলচিকাম ব্যবহার হয়। আধুনিক যুগেও গাউটের ঐ ওষুধ।

বিভিন্ন বোগে প্রায় ৭০০ রকমের বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করা সত্ত্বেও দেখা যায়, এইসব ওষুধ ঠিক বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে নির্বাচিত হয় নি।

তবু সেই যুগে ময়লা নিষ্কাশনের জন্যে ড্রেন ছিল, স্বাস্থ্যরক্ষাব জন্য স্নানের ব্যবস্থা ছিল। সুবাসিত তেল এবং মেয়েদের জন্য প্রসাধন-সামগ্রী এবং গন্ধদ্রব্যের প্রচলন ছিল। সন্তানধারণ এবং প্রসবের পর মাতা এবং শিশুর পরিচর্যার ব্যবস্থা ছিল।

প্রাচীন ভারতে বৈদিকযুগের আগে চিকিৎসাবিদ্যা কী ছিল তা জানা নেই। মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পার সভ্যতা আবিষ্কারের পব খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বছরেরও বহু পূর্ব থেকে ভারত যে সুসভ্য ছিল তাতে আজ আর কারু কোন সন্দেহ নেই।

আর্যজাতির ভারতে প্রবেশের পর বৈদিক যুগ শুরু ; খ্রীঃ পূঃ ১৬০০ বছরে। ঋগ্‌বেদই প্রথম বেদ। প্রাচীনতম ভারতীয় গ্রন্থ।

ঋগ্‌বেদ এবং অথর্ববেদে মানুষের রোগে এবং চিকিৎসায় যেমন দেবতার প্রভাব আছে তেমনি আবার চিকিৎসকের কর্তব্য সম্বন্ধেও নির্দেশ আছে। একদিকে যেমন মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে চিকিৎসা করা হত তেমনি আবার বনজ ওষুধেরও প্রচলন ছিল। দেবতাকে তুষ্ট না করে শুধু ওষুধে যে কোনও ফল হয় না, এ বিশ্বাস আজও এদেশে প্রবল।

অথর্ববেদের পরিশিষ্ট আয়ুর্বেদ। ঐ বেদে সেই সময়কার নানাবিধ রোগের উল্লেখ আছে, যেমন ফোড়া, টিউমার, পিত্তশূল, বাত, হৃদ্‌রোগ, কুষ্ঠ এবং যৌন ব্যাধি ইত্যাদি।

বৈদিক যুগেও ভারতে সার্জারির অদ্ভুত উন্নতি দেখা যায়। কৃত্রিম পা, চক্ষু এবং দাঁতের উল্লেখ ঋগ্‌বেদে পর্যন্ত দেখা যায়।

তবু বৈদিক যুগ আসলে ছিল মন্ত্র-তন্ত্রের যুগ। শুধু দেবতাকে তুষ্ট করে আরোগ্য-লাভের যুগ।

প্রাচীন মিশরে সন্তান-জন্ম

কিন্তু পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য যুগে অদ্ভুত এক পরিবর্তন দেখা দিল। ঋষিরা একদিকে যেমন আরোগ্যের জন্য যাগযজ্ঞ ইত্যাদি দিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেন, তেমনি আবার রোগ নিরাময়ের জন্য মানুষের আচার, ব্যবহার, খাদ্য এবং ওষুধের গুণ খুঁটিয়ে বিচার করে বিধান দেওয়ার রীতি প্রবর্তন করলেন।

এই ঋষিদের হাতে আয়ুর্বেদ অর্থাৎ চিকিৎসাবিদ্যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হল ; এবং চিকিৎসা-বিদ্যার শিক্ষাকেন্দ্র হল তক্ষশীলা এবং কাশী।

কথিত আছে, তক্ষশীলায় চিকিৎসাবিদ্যা শেখাতেন ঋষি আত্রেয় আর কাশীতে সার্জারি শেখাতেন ধন্বন্তরির শিষ্য পণ্ডিত সুশ্রুত।

চিকিৎসাবিদ্যায় প্রাচীন ভারতের তিনখানা অপূর্ব গ্রন্থ—সুশ্রুত সংহিতা (খ্রীঃ পূঃ ৫০০), চরক সংহিতা (১২০-১৬২ খ্রীঃ) এবং ভাগবত (৬২৫ খ্রীঃ)।

প্রাচীনকালে ইহুদীরা যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং দেহের যত্ন নিয়ে

রোগ প্রতিরোধ সম্বন্ধে খুব সতর্ক ছিল, তেমনি হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য ছিল সার্জারি। সেকালে ভারতীয় সার্জারির সমতুল্য মান পৃথিবীর অন্য কোথাও ছিল না।

অপারেশনের আগে রুগীর ঘর, রুগী এবং সার্জন তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে জীবাণু-শূন্য অবস্থায় না থাকলে আজকাল আর অপারেশন হয় না। সভ্য জগতে মাত্র পঞ্চাশ বৎসর আগে থেকে এই রীতি চালু হয়েছে।

অথচ প্রাচীন ভারতে ঠিক এই ধরনেরই নিয়ম ছিল। রুগীর ঘর আগেই পরিষ্কার করা হত। তারপর গন্ধক বা উগ্রগন্ধী কোন মশলা পুড়িয়ে ঘর সুবাসিত করা হত। রুগীকে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরানো হত। সার্জন নিজের নখ সরু করে কেটে হাত ভাল করে ধুয়ে নিতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে অপারেশন করতেন।

অপারেশনের আগে রুগীকে মাদক দ্রব্য খাইয়ে বেহুঁশ করে রাখা হত। হেন অপারেশন নেই, যা সে যুগের ভারতীয় সার্জনরা করেন নি। আধুনিক সার্জারির প্রায় সব পদ্ধতিই তাঁরা জানতেন। শুধু শিরা ধমনী সুতো দিয়ে বেঁধে রক্ত বন্ধ করা তাঁরা জানতেন না। তখন রক্ত বন্ধ করা হত চাপ দিয়ে, কিংবা তপ্ত অস্ত্র লাগিয়ে, পুড়িয়ে। কাজেই চোখের ছানি কাটা (ক্যাটারাক্ট), পেট কাটা, মাথার খুলি ফুটো, সিজারইয়ান সেকশন সবই সে যুগে হয়েছে।

প্রাচীন মিশরে শিশু ও ধাত্রী

তখনকার ভারতে সবচেয়ে আশ্চর্য অপারেশন ছিল, প্ল্যাস্টিক সার্জারি। সে যুগে অপরাধীর প্রচলিত শাস্তি ছিল, নাক কিংবা কান কেটে দেওয়া।

কাজেই প্ল্যাস্টিক সার্জারির সাহায্যে নতুন মাংস গজিয়ে সেই মাংস নাকে লাগিয়ে নতুন নাক তৈরী করা হত। আজকালও ঠিক এই পদ্ধতিতেই এই অপাবেশন হয়। তখন নাকের ফুটো ঠিক রাখার জন্য পদ্ম কিংবা জলজ উদ্ভিদের ফাঁপা ডাঁটা লাগানো হত; আজকাল তার বদলে দেওয়া হয় রবারের সরু নল।

ভারত থেকেই এই অপারেশন আরবরা শেখে। তারপর বহু বৎসর পরে ইওরোপে যায়।

সুশ্রুতে ১২১ রকমের বিভিন্ন যন্ত্রের উল্লেখ আছে। ছুরি, কাঁচি, করাত, ছুঁচ, ফরসেপস্, হুক ইত্যাদি সব সে যুগে ছিল। ধারালো অস্ত্রের হাতল থাকত। পশমের কাপড় দিয়ে জড়িয়ে এইসব অস্ত্র বাক্সে ভরে রাখা হত। ধারালো এমন অস্ত্রও ছিল, যা দিয়ে চুল পর্যন্ত চেরা যায়।

ছাত্ররা এই অস্ত্রের ব্যবহার শিখত পাতা কেটে, নরম উদ্ভিদের ডাঁটা কেটে। এই কাজে দক্ষ হলে মৃত জন্তুর শিরা কেটে হাত পাকাত।

চামড়ার থলিতে জল ভরে তার ওপর ছুরি চালিয়ে উদরীর অপারেশনও ঐ যুগে ছাত্রদের শেখানো হত।

সে যুগে বাঁশ দিয়ে বেঁধে ভাঙা হাড় জোড়া লাগাবার যে পদ্ধতি ছিল তাই পরে ব্রিটিশ সেনা বিভাগে ব্যবহার করা হয়।

সার্জারিতে এত অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকা সত্ত্বেও অ্যানাটমিতে ভারতীয় ঋষিদের সঠিক জ্ঞান ছিল না। তাই এখানে কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কল্পিত সব হাড়, মাংসপেশী শিরা ধমনী ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

প্রাচীন মিশরে শিশুর পরিচর্যা

সুশ্রুত ১১২০টি রোগের উল্লেখ করেছেন। পর্যবেক্ষণ, স্পর্শন, এবং শ্রবণের উপযুক্ত ব্যবহার করে রোগ নির্ণয়ের আধুনিক রীতি সে যুগেও ভারতে ছিল।

সেকালেও যে ম্যালেরিয়া ছিল এবং তার কারণ মশা, সে কথাও বলা হয়েছে।

ভাগবত পুরাণে আছে, যখন দেখা যাবে ছাত থেকে ইঁদুর মাটিতে পড়ে কিছুক্ষণ লাফায় এবং পরে মরে যায়, তক্ষুণি সে স্থান পরিত্যাগ করবে।

বলা বাহুল্য এ রোগ প্লেগ। কাজেই পলায়ন করে আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কোনো উপায় যে নেই সে কথাও ঋষিরা জানতেন।

চিকিৎসায় পরিমিত খাদ্য, স্নান, রক্তমোক্ষণ, কোষ্ঠ পরিষ্কার ইত্যাদির প্রচলন ছিল। সুশ্রুত ৭৬০টি বনজ ওষুধের বর্ণনা করেছেন। বিষের প্রতিষেধক এবং সর্প-দংশনের চিকিৎসাও আছে।

তখনকার ভারতে বসন্তরোগের গুটি থেকে বীজ নিয়ে টিকা দেওয়ার রীতি ছিল। তাই ইওরোপের মতো সাংঘাতিক মহামারী ভারতে কখনও হয় নি।

আজকাল চাকা ঘুরে গেছে। ইওরোপে এখন এ রোগ আর হয় না, কিন্তু ভারতে হয়। এমন কি মহামারী পর্যন্ত হয়।

চরক সংহিতায় পাঁচশ রকমের বিভিন্ন ভেষজের উল্লেখ আছে। বনজ ওষুধ ছাড়াও সে যুগে ধাতব ওষুধ যথেষ্ট ব্যবহার হত। সোনা, রুপা, তামা, টিন, গন্ধক এবং বিশেষ করে পারদের ব্যবহার সে যুগে ভারত ছাড়া আর কেউ জানত না। চর্মরোগ, বসন্ত এবং উপদংশে ভারতীয় চিকিৎসকরাই সর্বপ্রথম পারদ ব্যবহার করেন।

মাদক দ্রব্যের মধ্যে আফিং ভারতে আসে আরব দেশ থেকে। কিন্তু গাঁজা, সিদ্ধি এবং ধুতুরা এদেশেরই জিনিস। আর সুরার মধ্যে ছিল সোমরস। সেই থেকে ১৫।২০ রকম বিভিন্ন বলকারক সুরা তৈরী হয়েছে।

অপারেশনের আগে সুরার সঙ্গে মাদকদ্রব্য মিশিয়ে রোগীকে খাওয়ানো হত। ৯২৭ সালে দুজন ভারতীয় সার্জন এক হিন্দু রাজার মাথার খুলি ফুটো করেন। অপারেশনের আগে তাঁকে যে ওষুধ খাইয়ে বেহুঁশ করা হয় তার নাম ছিল সম্মোহিনী।

সম্মোহন বিদ্যা বা হিপ্‌নটিজম্‌ ভারত থেকেই উদ্ভূত। এদেশ থেকেই এ বিদ্যা ইওরোপে যায়। শেষে মেসমেরিজম, অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়।

মানুষের দেহের ওপর মনের প্রভাব যে কতখানি বেশী ভারতের ঋষিরাই তা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন। যোগ সাধনা তার একটি দৃষ্টান্ত। যোগের আটটি স্তর। যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান এবং সমাধি।

যম মানে আসক্তির পরিত্যাগ অর্থাৎ যোগী নিজে থাকবেন সর্ববিষয়ে নিরাসক্ত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেহমনে সর্বদা নিয়ম মেনে চলবেন। আত্মতৃপ্তির জন্য অধ্যয়ন করবেন।

তারপর আসন এবং প্রাণায়াম। এই দুটি জিনিস আসলে ব্যায়াম। শিরদাঁড়া সোজা করে উরুর ওপর পা দিয়ে জোড়াসনে বসে পায়ের বুড়ো

আঙুল দুহাত দিয়ে ধরে যোগী নিজের নাকের ডগায় দুচোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন। এই করে মননশক্তি বাড়বে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ইচ্ছামত চালনা করা যাবে। সামান্যতম বায়ুতেই জীবনধারণ করা সম্ভব হবে।

এইবার প্রত্যাহার। দেহের সমস্ত অনুভূতি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যখন একটি মাত্র অনুভূতি থাকবে তখনই যোগী পরের স্তরে চলে যাবেন। সেই স্তর ধারণ। কেবলমাত্র একটি বিষয়ে একাগ্র হবার ফলে মন এবং দেহ সমস্ত অনুভূতি থেকে মুক্ত হবে। যোগী ধ্যানে মগ্ন হবেন। তারপর সমাধি।

ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে একাগ্র হয়ে মানুষ যে দেহ এবং মনের সমস্ত অনুভূতি থেকে মুক্ত হতে পারে ভারতীয় যোগসাধনাই তার মস্ত বড় উদাহরণ।

যোগে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। মন উদ্বেগশূন্য হয়। যোগী দীর্ঘায়ু হন।
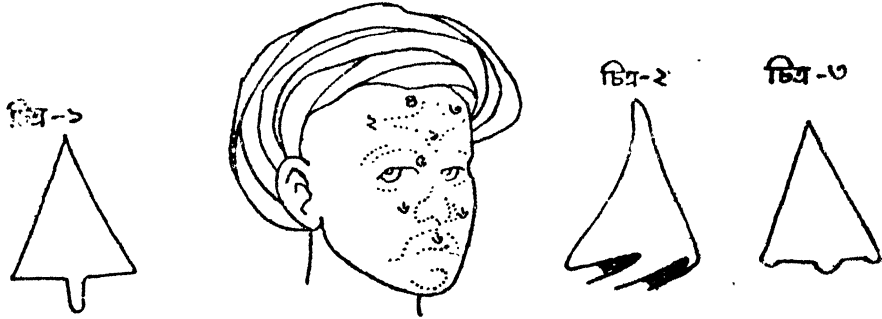
প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারি

আজকাল পৃথিবীর সর্বদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের জন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সভাসমিতি বা সেমিনার হয়। সভায় বিজ্ঞানীরা নিজেদের মত ব্যক্ত করেন। আলোচনা হয়। এইভাবে শিক্ষার প্রসার বাড়ে।

প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাবিদ্যার প্রসারের জন্য চিকিৎসকদের নতুন বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানলাভের জন্যও এইরকম সভাসমিতি বা কনফারেন্সের নিয়ম ছিল। চরক সংহিতায় তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

চরক সংহিতায় প্রথমেই বলা হয়েছে, জ্ঞানলাভের তিনটি পন্থা। শিক্ষা, শেখানো এবং আলোচনা। একজন চিকিৎসক আর একজন চিকিৎসকের সঙ্গে সর্বদা আলোচনা করবেন। আলোচনায় নিজের সন্দেহ দূর হয়। অপরের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করা যায়।

চরক সংহিতায় এমনি এক অপূর্ব আলোচনার বিবরণ আছে।

সূত্রস্থানের ২৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ঋষিদের এক সম্মিলনে কাশীপতি বামালা এক প্রশ্ন তুললেন, মানুষ এবং তার রোগের উৎপত্তি কি ?

পরীক্ষিৎ, মৌদগল্য, শারলোমা, বার্ষোবিদ, হিরণ্যাক্ষ, কুশিক, কৌশিক, ভদ্রকাপ্য, ভরদ্বাজ, কাঙ্কায়ন, ভিক্ষু আত্রেয় ইত্যাদি ঋষিরা প্রত্যেকে নিজের মত ব্যক্ত করলেন। প্রতিটি বক্তা নিজের মতটাই ঠিক এবং অপরেরটা ভুল এই বলে তুমুল বাদানুবাদ শুরু করলেন।

অবশেষে সভাপতি আত্রেয় নিজের মত ব্যক্ত করে সবাইকে আরও বেশী যুক্তিশীল এবং বিজ্ঞানী হবার পরামর্শ দিয়ে বিতর্ক বন্ধ করে দিলেন।

আত্রেয় বললেন, যারা শুধুই তর্ক করে এবং নিজের মতটাই সর্বশেষ বলে মনে করে তারা সারাজীবন কলুর ঘানির মতোই শুধু চক্রাকারে ঘোরে। কখনও কোনো মীমাংসায় আসে না। অতএব এই বাকযুদ্ধ পরিত্যাগ করে আপনারা আসল সত্যের প্রতি মনোনিবেশ করুন। কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে তা কখনও সম্ভব হয় না। যে সব জিনিস অনুকূল অবস্থায় মানুষের দেহটাকে সুস্থ রাখে প্রতিকূল অবস্থায় তারাই আবার রোগ ঘটায়।

এমনি করে চরক সংহিতায় মানুষের রোগ সম্বন্ধে শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে ঋষিদের তর্ক বিতর্ক এবং আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রতিটি আলোচনার শেষে সভাপতির বিচক্ষণ মত এবং উপদেশের পর বিতর্ক বন্ধ হয়।

নতুন কোনো চিকিৎসারীতি প্রবর্তন করবার আগে আজকাল যেমন হাসপাতালে প্রয়োগ করে তার ফলাফল দেখা হয় তখনও ঠিক ঐ পদ্ধতিতেই ঋষিরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। তারপর এক সঙ্গে মিলিত হয়ে কনফারেন্সে সেই অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। আলোচনার পর সভাপতির নির্দেশমত চিকিৎসাবিধি প্রচলিত হত।

এমনি করেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে ভারতীয় চিকিৎসাবিধি তৈরী হয়েছে। তাই সে যুগে দেশ-বিদেশে তার অত প্রসার হয়েছে। সুনাম হয়েছে।

তাই দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার ভারতে এসে এই জ্ঞানসম্ভার দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। নিজের দেশের পণ্ডিতদের চেয়ে এদেশের পাণ্ডিত্য শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছেন।

তাই দেখা যায় সুসভ্য আরব এবং পারস্য দেশে সুশ্রুত এবং চরকের

হাজার বছর আগেকার লেখা আরবী এবং পারসী ভাষায় তর্জমা হচ্ছে। খলিফা হারুন অল রসিদ ভারতীয় চিকিৎসকদের বৃত্তি দিয়ে শিক্ষাদানের জন্য বাগদাদে খাতির করে নিয়ে যাচ্ছেন। বাগদাদের হাসপাতাল পরিচালনার ভার এই ভারতীয় পণ্ডিতদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন। ভারতে পাথর থেকে সোনার যুগ সৃষ্টি হয়েছে।

খ্রীষ্টজন্মের পাঁচশ বছর আগেও সিংহলে হাসপাতাল ছিল। সম্রাট অশোকের সময় সারা ভারতে আঠারোটি হাসপাতাল তৈরী হয়েছে খ্রীঃ পূঃ ২৭৩-২৩২ মধ্যে।

কাজেই সেই সময় ভারত এবং মধ্য প্রাচ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের আদানপ্রদান হয়েছে। এক দেশ অন্যদেশের বিদ্যা লাভ করেছে।

তাই গ্রীস অথবা আরব-পারস্যের চিকিৎসা বিজ্ঞান কতখানি ভারতীয় চিকিৎসাবিধির প্রতি ঋণী, অথবা ভারত কতটুকু জ্ঞান বিদেশ থেকে নিয়েছে তার ইতিহাস জানা নাই।

কিন্তু ইওরোপের আদি, মধ্য এবং আধুনিক যুগের চিকিৎসা যে মিশর, গ্রীস, আরব-পারস্য এবং ভারত থেকে উদ্ভূত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অলৌকিক কথা

দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার নানা দেশ জয় করে একবার যখন দেশে ফিরলেন, সঙ্গে গেল অপূর্ব লাবণ্যময়ী সুন্দরী এক তরুণী। রূপে যৌবনে মনোহরা। এই বহ্নিশিখার টানে আলেকজান্দার রাজকার্য সব ভুলে গেলেন। এমন কি, নতুন নতুন রাজ্য জয়ের সেই তীব্র নেশাও তাঁর ছুটে গেল। এখন দিনরাত তাঁর একটি মাত্র নেশা। এই রঙ্গময়ী মোহিনী যুবতী। বিজয়িনী ফিলিস।

তখন গ্রীসে অ্যারিস্টটল সবচেয়ে বড় পণ্ডিত এবং নামকরা দার্শনিক। বহুমুখী তাঁর জ্ঞান। নিমেষের মধ্যেই ফিলিসের মতলব তিনি ধরে ফেললেন।

ফিলিস আসলে বিষকন্যা। তিলে তিলে সর্পবিষ দিয়ে তার দেহ বিষাক্ত। এই দেহের স্পর্শে আলেকজান্দারের দেহ বিষাক্ত হবে। মৃত্যু হবে। এই মতলব নিয়ে ফিলিস এসেছে।

গুরু অ্যারিস্টটলের কথায় আলেকজান্দারের এই প্রথম সুবুদ্ধি হল। তিনি আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করলেন।

ফিলিস কিন্তু সাংঘাতিক চটে গেল। ভেবে ভেবে বুড়ো ঐ অ্যারিস্টটলকে জব্দ করবার মোক্ষম এক ফন্দি আঁটল। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল, অ্যারিস্টটল নিজেই ফিলিসের প্রেমে পাগল। ফিলিসকে তুষ্ট করতে, তার প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ দেখাতে যে-কোনো হীন কাজেও তিনি প্রস্তুত।

কাজেই ফিলিসের আদেশে পণ্ডিত অ্যারিস্টটল একদিন হাসিমুখে মেঝেতে হামাগুড়ি দিলেন। ফিলিস লাগাম এনে তাঁর মুখে লাগাল। পিঠে ঘোড়ার জিন বসাল। তারপর নিজে ঐ জিনের ওপর বসে অ্যারিস্টটলের গায় চাবুকের পর চাবুক মেরে সারা ঘর হামাগুড়ি দিয়ে দৌড় করাল।

ফিলিসের কথা মতো পর্দার আড়াল থেকে এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য নিজের চোখে দেখে আলেকজান্দার বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। পরে যখন তিনি এর কৈফিয়ত তলব করলেন, অ্যারিস্টটল পরম বিজ্ঞের মতো গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

যে রমণী আমার মতো প্রবীণ এবং পণ্ডিত লোককে পর্যন্ত বশীভূত করে এইরকম হীন কাজ করাতে পারে সে কি কমবয়স্ক অপরিণত যুবকের কাছে আরও বেশী বিপজ্জনক নয়? এ যে কী সাংঘাতিক বিষকন্যা আমাকে দিয়েই তা প্রমাণ হল। আগে তোমাকে আমি শুধু সাবধান করেছিলাম। এইবার তার প্রমাণ পেলে।

যদিও এটা নেহাতই গল্পকথা তবু এ থেকেই অ্যারিস্টটলের পাণ্ডিত্য এবং সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। খ্রীঃ পূঃ সাড়ে তিনশ বৎসর আগেও গ্রীসে কত বড় এক জ্ঞানী ও পণ্ডিত ছিলেন তাঁর কথা লোকে জেনেছে।

বর্তমানকালের চিকিৎসাবিদ্যাও সেই সময়কার গ্রীস থেকে উদ্ভূত। গ্রীক দেশ আবার এ-বিদ্যা নিয়েছে ব্যাবিলনের ইহুদী সভ্যতা থেকে; মিশর এবং ভারতের প্রাচীন সভ্যতা থেকে।

এই তিনটি দেশের বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সার বস্তু নিয়ে চিকিৎসা বিদ্যা যিনি গ্রীক দেশে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করলেন, তাঁর নাম হিপোক্রেটিস (খ্রীঃ পূঃ ৪৬০-৩৭০)।

গ্রীকদেশে সমুদ্রের ধারে কস নামে ছোট্ট একটি দ্বীপে হিপোক্রেটিসের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন চিকিৎসক। গ্রীক দেবতা এসকুলাপিয়াসের বংশধর।

এসকুলাপিয়াস গ্রীসের আরোগ্য-দেবতা অ্যাপোলোর ছেলে। কথিত আছে, চিকিৎসা বিদ্যায় এসকুলাপিয়াস এত বেশী পারদর্শী হয়ে উঠলেন যে, মানুষ দীর্ঘায়ু হল। মৃত্যুহার কমে গেল। নরক প্রেতশূন্য হল। তাই দেখে বিধাতা জিউস ভাবলেন, এসকুলাপিয়াসের জন্যই মানুষ একদিন অমর হবে। কাজেই বজ্রাঘাতে তাঁকে তিনি ধ্বংস করলেন।

সেই থেকে এসকুলাপিয়াস চিকিৎসার দেবতা হয়ে গেলেন। তাঁর মূর্তি লোকে পুজো করতে লাগল। পুরোহিতরা বেছে বেছে পাহাড়ের ওপরে ঝরনার ধারে নানা জায়গায় এসকুলাপিয়াসের মন্দির তৈরি করল। দূর দেশ থেকে রোগীরা আরোগ্যের আশায় দলে দলে ঐ মন্দিরে আসতে শুরু করল।

মন্দিরের সামনে মনোরম উদ্যান। ভিনাস অ্যাপোলো এবং জিউসের প্রস্তরখচিত মূর্তি। পাশেই উষ্ণ প্রস্রবণ। এই মনোজ্ঞ পরিবেশে রোগীর কষ্ট নিমেষে লাঘব হত। আপনা থেকেই রোগী সুস্থ বোধ করত।

মন্দিরে প্রবেশ করবার আগে রোগীকে ঝরনার গরম জলে স্নান করানো

হত। গায়ে নানাবিধ সুগন্ধি তেল মাখানো হত। আর এসকুলাপিয়াসের চিকিৎসার অলৌকিক সব ঘটনা শুনিয়ে রোগীর মনে আশা জাগানো হত।

তারপর শুরু হত পূজা এবং বলি। হয় মোরগ নয়তো ভেড়া বলি দিয়ে রোগীকে পুজো দিতে হত। পুরোহিতরা এসকুলাপিয়াসের মূর্তির সামনে গম্ভীর স্বরে মন্ত্র পাঠ করতেন। বলতেন, গভীর রাত্রে দেবতার আদেশ পাওয়া যাবে।

গভীর রাত্রে রোগীরা যখন ক্লান্ত হয়ে মন্দিরের চত্বরে অথবা কোনো একটি কোঠায় ঘুমিয়ে পড়ত পুরোহিতরা দেবতার পোশাক পরে চুপিচুপি রোগীর ঘরে প্রবেশ করতেন। দৈবাৎ কেউ জেগে থাকলে তার ভাগ্যে এই দেবদর্শন ঘটত। চিকিৎসার বিধান দেবতার মুখ থেকেই সে শুনতে পেত। বেশীর ভাগ রোগীই কিন্তু ঘুমিয়ে থাকত। স্বপ্ন দেখত। পরদিন পুরোহিতরা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দেবতার আদেশ বুঝিয়ে দিতেন। রোগ বুঝে ব্যবস্থা দিতেন, রক্তমোক্ষণ, জোলাপ কিংবা কোনো উদ্‌গারক।

আরোগ্য হলে দেহের যে-অংশের রোগ সেরেছে তার প্রতিকৃতি রোগীরা মোম, ব্রঞ্জ অথবা সোনার তৈরী করে মন্দিরে দিয়ে যেত। আর পাথরে খোদাই করে রোগের বিবরণ এবং অলৌকিক এই আরোগ্যকথা লেখা হত। এই ছোট ছোট স্মারকখণ্ড মন্দিরের গায় ঝুলিয়ে রাখা হত।

তাই দেখে জানা যায় ক্লিও নামে একটি স্ত্রীলোক পাঁচ বৎসর অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সন্তান আর তার প্রসব হয় না। অবশেষে একদিন কিন্তু এই মন্দিরে এসে সে ধরনা দিল। দেবতার দয়ায় পরদিনই তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। পেট থেকে বেরিয়েই মার সঙ্গে স্নান করে পাঁচ বছরের ঐ ছেলে মার হাত ধরে মন্দিরে পূজা দিতে এল।

নিকানর নামে এক খঞ্জ ছিল। লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে চলত। এই মন্দিরে এসে একদিন লাঠি রেখে সে বসে ছিল; হঠাৎ কোথা থেকে একটা বাচ্চা ছেলে এসে লাঠি নিয়ে পালিয়ে গেল। নিকানর উঠে তাকে তাড়া করল। অমনি তার খোঁড়া পা সেরে গেল।

অ্যালসেটাস ছিল অন্ধ। একদিন দেবতার দয়ায় সে দৃষ্টি ফিরে পেল। দেবতা শুধু তার অন্ধ চোখ দুটির সামনে আঙুল রেখে বললেন, চোখ খোলো। অ্যালসেটাস চোখ মেলে তাকিয়ে মন্দিরের গাছপালা সব দেখতে পেল।

দেবতা শুধু রোগ সারাতেন না। সার্জারিও করতেন। স্পার্টার একটি

মেয়ের পেটে একদিন জল হল। পা ফুলল। আরোগ্যের আশায় যখন সে দেবতার কাছে এল, এসকুলাপিয়াস তার গলা কেটে ডুপা ধরে উল্টো করে ধরলেন। পা ও পেট থেকে যখন সব জল বেরিয়ে গেল তখন আবার কাটা গলায় মাথাটা বসিয়ে জুড়ে দিলেন।

এমনি সব অলৌকিক ঘটনা মন্দিরের গায় লেখা থাকত। পুরোহিতরা যখন এসকুলাপিয়াসের মন্দির গড়ে অলৌকিক চিকিৎসার দিকে ঝুঁকল তখন গ্রীসের একদল চিকিৎসক এসকুলাপিয়াসের নাম নিয়ে একটা সঙ্ঘ তৈরী করলেন। এঁদের নাম হল এসকুলাপিয়াড। এঁরা রোগীর চিকিৎসা করতেন এবং ছাত্রদের শেখাতেন। পরে এঁদেরই বলা হত এসকুলাপিয়াসের বংশধর।

হিপাক্রেটিস এমনি এক চিকিৎসক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসা-বিদ্যা তিনি শেখেন প্রথমে তাঁর বাবার কাছে; তারপর গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে। পরে দেশবিদেশ ভ্রমণ করে তাঁর যে বিপুল জ্ঞান সঞ্চয় হয় তাই দিয়ে তিনি থ্রেস, থেসালি ও ম্যাসিডোনিয়ায় ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেন।

ঠিক কোন সালে যে তাঁর মৃত্যু হয় কেউ তা জানে না। বিভিন্ন সব তারিখ থেকে অনুমান হয়, ৮৫ থেকে ১০৯ বৎসরের মধ্যে কোনো একটি দিনে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

তখনকার দিনের চিকিৎসকরা পুরোহিতদের মতো মন্ত্র, তন্ত্র এবং নামমাত্র ওষুধ দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করতেন। কিংবা যুদ্ধের সময় করতেন সার্জারি। বিশেষ একটি রোগের বিশিষ্ট সব লক্ষণ খুঁটিয়ে দেখতেন না। কোন রোগের কী পরিণতি হয় তা নিয়েও মাথা ঘামাতেন না। চিকিৎসাবিদ্যা মন্ত্রতন্ত্র এবং ডাকিনী বিদ্যার সঙ্গেই জড়ানো ছিল। গ্রীক ভাস্করদের মতো দেহের বাইরের গঠনটাই তাঁরা বুঝতেন। দেহের আন্তর যন্ত্রের খবর তাঁরা রাখতেন না।

তখনকার চিকিৎসকদের মধ্যে হিপোক্রেটিসই সর্বপ্রথম এইদিকে নজর দিলেন। রোগীর বিছানার পাশে বসে দিনের পর দিন তিনি রোগের উপসর্গ লক্ষ্য করতেন। চোখ মুখ জিহ্বা শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদির কী পরিবর্তন হয় খুঁটিয়ে দেখতেন। কিসে রোগীর যন্ত্রণা কমে, দেহে একটু আরাম হয় তার ব্যবস্থা দিতেন। রোগীকে ভরসা দিয়ে আশা দিয়ে সর্বদা প্রফুল্ল রাখতেন।

এমনি করে হিপোক্রেটিসের হাতে বর্তমানকালের চিকিৎসাবিদ্যা জন্ম নিল। রোগীর বিছানার পাশে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের সৃষ্টি হল।

অথচ তখন মনুষ্যদেহের বিচিত্র সব কলকজা অর্থাৎ অ্যানাটমি কিংবা ফিজিওলজি (শারীরবিদ্যা) কিছুই তিনি জানতেন না। তবু তিনি চিকিৎসার এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করতে সক্ষম হলেন শুধু মাত্র নিজের বুদ্ধি এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে। নিজের সংস্কারমুক্ত মন দিয়ে রুগীর কষ্ট বিচার করে। রোগীর প্রতি মনুষ্যজনোচিত মমতা এবং সহানুভূতি নিয়ে। মন্ত্রতন্ত্র, ডাকিনী বিদ্যা এবং দেবতার প্রভাব থেকে চিকিৎসা বিদ্যা এই প্রথম মুক্ত হল।

আজকাল হাসপাতালে প্রতিটি রোগীর বিছানার পাশে একটি করে চার্ট ঝোলানো থাকে। তাতে লেখা থাকে রোগীর রোজকার অবস্থা। রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং তার পরিণতি সব তা থেকে জানা যায়।

হিপোক্রেটিস এপিডেমিক নামে এক পুস্তিকায় ঠিক এই পদ্ধতিতে ৪২টি রোগীর ইতিহাস লিখে গেছেন। এই ৪২টি বোগীর মধ্যে ২৫টির মৃত্যু হয়। দিনের পর দিন এই রোগীদের দেহে কী উপসর্গ দেখা দিয়েছে, যন্ত্রণায় কী রকম কাতর হয়েছে, সব হিপোক্রেটিস লিখে গেছেন ; কোথাও কিছু না লুকিয়ে। নিজের চিকিৎসার গুণ তিনি বড়াই করে জাহির করেন নি। অন্য কোনো চিকিৎসকের নিন্দাও তিনি করেন নি। শুধু যা ঘটেছে তাই লিখে গেছেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, আমি ইচ্ছা করেই সব কথা খুলে লিখে গেলাম। কারণ আমার বিশ্বাস, একজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিফলতা থেকেই অপরে শিক্ষালাভ করে। বিফলতার কারণ বুঝতে পারে।

এই সত্যনিষ্ঠাই বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা বিদ্যার ভিত্তি। তাই বলা হয়, হিপোক্রেটিসই আধুনিক চিকিৎসা-বিধির জনক। আজও তাই ডাক্তারী ছাত্ররা শিক্ষা শেষে তাঁর নামে শপথ (হিপোক্রেটিক ওথ) নিয়ে ডাক্তারি শুরু করে। হিপোক্রেটিসের এই শপথ সারা পৃথিবীর ডাক্তাররা শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্য করেন।

হিপোক্রেটিস চিকিৎসকদের আচার ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক এবং পাবিবারিক জীবনে যে সংযমের মান নির্ধারণ করে গেছেন আজ পর্যন্ত তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো মান তৈরী হয় নি।

হিপোক্রেটিস বলে গেছেন, চিকিৎসক রোগীর ঘরে যাবেন নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে। নির্মল চরিত্র নিয়ে। তাঁর একমাত্র কর্তব্য রোগীর কষ্ট লাঘব করা। রোগীর অনেক গোপনীয় খবর তিনি জানবেন কিন্তু কখনও তা প্রকাশ করবেন না। রোগীর পরিবারে অনেক রূপবতী যুবতীর সংস্পর্শে তিনি আসবেন। কিন্তু কারু প্রতি তিনি অসংযত আচরণ অথবা কটাক্ষ পর্যন্ত করবেন না। চিকিৎসকের একমাত্র কর্তব্য রোগীর আরোগ্য লাভে সাহায্য করা। সেইজন্যে যদি কেউ তাঁকে উপযুক্ত পুরস্কার না দেয়, কাজের বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থ না দেয় তবু তিনি তাঁর বিধান দেবেন।

হিপোক্রেটিসের শপথে আছে, চিকিৎসক যাঁর কাছে শিক্ষালাভ করবেন চিরজীবন সেই গুরুকে আপন পিতার মতো ভক্তি করবেন। বিপদের সময় সাহায্য করবেন। গুরুর সন্তান যদি এই বিদ্যা শিখতে চায়, চিকিৎসক নিজের সন্তানের মতো তাঁকে স্নেহের সঙ্গে এই বিদ্যা শেখাবেন; বিনা পারিশ্রমিকে।

যে-ছাত্র এই শপথ করবে কেবলমাত্র তাকেই চিকিৎসক শিক্ষাদান করবেন। অন্য কাউকে নয়।

কিন্তু হিপোক্রেটিস চিকিৎসা বিদ্যার যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, রোগ বর্ণনায় যে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর পরবর্তী চিকিৎসকরা তা মানেন নি। তাই চিকিৎসার সঙ্গে অলৌকিক ঘটনার প্রচার হয়েছে। চিকিৎসকের অলৌকিক শক্তির কথা ফলাও করে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এমন কি, হিপোক্রেটিসের সম্বন্ধেও এমন অনেক অবাস্তব কথা প্রচলিত হয়েছে। গল্প আছে, তিনি নাকি একদিন সকালে একটি মেয়ের শুধু মুখ দেখে বললেন, সে কুমারী। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা আবার যখন তাকে দেখলেন, তার স্ফীত কণ্ঠ এবং গলার স্বর থেকেই বুঝলেন, সে আর কুমারী নেই এখন সে পরিপূর্ণ উপভোক্তা রমণী।

তারপর রাজধানী এথেন্স শহরে একবার প্লেগ দেখা দিল। হিপোক্রেটিস শহরের চারধারে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। অমনি প্লেগ বন্ধ হয়ে গেল।

তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল, সমাধির ওপর একরকম মৌমাছি এসে বাসা বেঁধেছে। এই মৌচাকের মধু খাইয়ে বাচ্চাদের মুখের ঘা সেরে গেল। এমনি সব অলৌকিক কাহিনী তাঁর নামে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

কাজেই হিপোক্রেটিসের সব লেখা চাপা পড়ে গেল। চিকিৎসা বিদ্যা ধর্মযাজকদের মুঠোয় পড়ে আবার অলৌকিক বিদ্যায় পরিণত হল।

তাই সতেরো-শ বছরের মধ্যে হিপোক্রেটিসের রোগ বর্ণনার মতো অমন নিখুঁত চিত্র আর একটিও বেরুল না। চিকিৎসকরা নিজেদের ভুলের কথা না বলে আপন কীর্তির কথা প্রচার শুরু করলেন। চিকিৎসার সঙ্গে আবার অলৌকিক কথা যুক্ত হল।

শেষ ভাস্কর

"সারা ইতালিতে বড় বড় সব রাস্তা এবং নানা স্থানে বড় বড় সব পুল বানিয়ে রোমক সাম্রাজ্যের জন্য ট্রোজানরা যা করেছে, চিকিৎসাবিদ্যার জন্য আমি নিজে ঠিক ততখানি করেছি। চিকিৎসার সত্যিকার উপায়টি একা আমিই শুধু দেখিয়েছি। এই বিদ্যার পথিকৃৎ অবশ্য হিপোক্রেটিস। কিন্তু তাঁর জ্ঞান অনেক বিষয়ে সীমাবদ্ধ এবং প্রাচীনদের মতো অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট। এই পথের ছকটি তিনি শুধু খড়ি দিয়ে এঁকে গেছেন। কিন্তু সেই পথ চলার যোগ্য করেছি আমি।"

খ্রীষ্টের পরে দ্বিতীয় শতকে এই দম্ভভরা উক্তি করে আরও পনেরো শ বৎসর পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠা চিকিৎসকদের কাছে বজায় রাখতে যাঁর লেখা সক্ষম হয়েছে তাঁর নাম ক্লারিসিমাস গ্যালেন (১৩০-২০০)।

গ্যালেন

প্লেটো প্রমুখ প্রাচীনকালের পণ্ডিতদের লেখা পড়লে মনে হয়, তাঁরা যেন সব মুনি ঋষি! সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী উর্ধ্বে। কিন্তু গ্যালেন যেন ঠিক আমাদের প্রতিবেশী। রক্তে মাংসে গড়া ভালো-মন্দ-ভরা এই মাটিরই এক মানুষ।

হিপোক্রেটিসের পর এই গ্যালেনই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক চিকিৎসক। এশিয়া

মাইনরে পারগামাম শহরে এক স্থাপত্য-শিল্পীর ঘরে তাঁর জন্ম। এই পারগামামে তখন বিরাট এক ডাক্তারী স্কুল এবং লাইব্রেরি। এই শিক্ষা-কেন্দ্রের সুনাম এত বেশী তখন বেড়ে গেল যে আলেকজেন্দ্রিয়ার নামী বিদ্যালয় পর্যন্ত সেইজন্য ঈর্ষাকাতর হল। তখন পুঁথি লেখার জন্য মিশর থেকে একরকম গাছের ছাল চালান হত তার নাম ছিল প্যাপিরাস। পারগামাম যাতে লেখার জন্য এই কাগজ না পায় তার জন্য দ্বিতীয় টলেমি এক আইন করে মিশর থেকে এই চালান বন্ধ করে দিলেন। পারগামাম কিন্তু মোটেই তাতে জব্দ হল না। ভেড়া ও ছাগলের চামড়া থেকে পার্চমেণ্ট তৈরী করে প্রাচীন সব পুঁথি এই পার্চমেণ্টে লিখে ফেলল।

গ্যালেন এই পারগামামে লেখাপড়া শিখে চিকিৎসাবিদ্যায় এত বেশী পারদর্শী হলেন যে, নিজের দেশে অথবা ক্ষয়িষ্ণু বিগতশ্রী ঐ আলেকজেন্দ্রিয়ায় ডাক্তারী করতে আর তাঁর ইচ্ছে হল না। তখনকার দিনে রোম সবচেয়ে লোভনীয় এবং ঐশ্বর্যভরা নগরী। এই রোমের অভিজাত মহলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার অদম্য উৎসাহ এবং উচ্চাশা নিয়ে গ্যালেন একদিন রোমে এলেন, ১৬২ সালে।

রোমে এসেই কিন্তু গ্যালেনের ভাগ্য হঠাৎ খুলে গেল। রোমান কনসাল বিথাসের স্ত্রীর অসুখ সারিয়ে গ্যালেন চারশ স্বর্ণমুদ্রা পেলেন। আর পেলেন কনসালের বন্ধুত্ব। দেখতে দেখতে তাঁর সুনাম অভিজাত মহলে ছড়িয়ে পড়ল।

একদিন এমনি এক অভিজাত ঘরে গ্যালেনের ডাক পড়ল। রোগিণী যুবতী। অভিজাত জাস্টাসের স্ত্রী। রাত্রে তার ঘুম হয় না। সারারাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করেন। কী তাঁর রোগ, কোনো চিকিৎসকই তা ধরতে পারেন না। অবশেষে গ্যালেনের ডাক পড়ল।

গ্যালেন দেখলেন, নাড়ীর গতি স্বাভাবিক। কিন্তু রোগিণী তাঁর কষ্টের কথা কিছুই বলতে চান না। গ্যালেনের প্রশ্নের উত্তরে সামান্য একটু হাঁ কিংবা না বলে গায়ের চাদর টেনে মাথা মুখ সব ঢেকে পাশ ফিরে শুলেন।

গ্যালেন ভাবলেন, হয় এটা পিত্তাধিক্যের লক্ষণ, নয়ত এমন কিছু গোপনীয় বিষয় আছে যা রোগিণী প্রকাশ করতে চান না। কাজেই গ্যালেন উঠে এলেন। বললেন, পরদিন এসে আবার দেখে রোগের কারণ তিনি বলবেন।

কিন্তু পরদিন রোগিণীর ঘরে যাবার কোনো সুযোগই আর তিনি পেলেন

না। প্রথমবার যখন গেলেন পরিচারিকা বলল, রোগিণী এখন কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। দ্বিতীয়বার যখন গেলেন তখনও ঐ একই কথা শুনলেন। গ্যালেন তবু তৃতীয়বার গেলেন। কিন্তু ঐ পরিচারিকাটি এবারও তাঁকে ভাগিয়ে দিল। বলল, রোগিণী স্নান করে যথারীতি আহারাদি করেছেন, কাজেই এখন আর তাঁকে বিরক্ত করা চলবে না।

গ্যালেন বুঝলেন, রোগিণীর দেহে সত্যি কোনো রোগ নেই। যা আছে তা নিশ্চয় মনে। পরদিন এই মনের রোগ তিনি ধরে ফেললেন।

সেদিন তাঁকে রোগিণীর ঘরে পরিচারিকা নিয়ে গেল। গ্যালেন সবে নাড়ী দেখছেন। এমনি সময় একজন ঘরে ঢুকে বলল, থিয়েটারে আজ পাইলাডেস নাচল ; এইমাত্র দেখে এলাম।

প্লেগ ছড়ানোর সন্দেহে ইহুদী-দহন

গ্যালেন দেখলেন হঠাৎ রোগিণীর নাড়ী চঞ্চল হল, মুখে রক্তিম আভা দেখা দিল।

গ্যালেন জানতেন, এই পাইলাডেস থিয়েটার দলের তরুণ এক কন্দর্পকান্তি নর্তক। তবু সেদিন তিনি উঠে এলেন। রোগের কারণ কিছুই আর বললেন না।

পরদিন তিনি এক ফন্দি আঁটলেন। ঠিক হল, যখন তিনি রোগিণীর নাড়ী দেখবেন, তখন একজন এসে বলবে, থিয়েটারে আজ দলের দ্বিতীয় নর্তক মরফাস নাচল।

গ্যালেন দেখলেন, মরফাসের নাম শুনে রোগিণীর নাড়ীর গতি একটুও বাড়ল না। মুখের ওপর সেই লাল আভাও আর দেখা গেল না।

কিন্তু যেই আবার তার পরদিন পাইলাডেসের কথা বলা হল অমনি রোগিণীর নাড়ী চঞ্চল হল। গ্যালেনের মনে আর কোনো সংশয়ই রইল না। তিনি নিশ্চিত বুঝলেন, অনিদ্রার কারণ ঐ যুবক নর্তকের প্রতি এই রমণীর ভালোবাসা।

এই ঘটনাটি উল্লেখ করে গ্যালেন লিখেছেন, এই রোগ নির্ণয় কেন

এতদিন চিকিৎসকরা করেন নি? চিকিৎসা বিজ্ঞানের সামান্যমাত্র জ্ঞান যাঁদের আছে তাঁরাই শুধু নিজেদের সাধারণ জ্ঞান এবং পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা থেকে এই তথ্য অনায়াসে আবিষ্কার করতে সক্ষম। আমার বিশ্বাস মানসিক বিপর্যয়ে দেহে কী পরিবর্তন হয় সে সম্বন্ধে এই চিকিৎসকদের কোনো ধারণাই নেই। ভয়, ঝগড়া ইত্যাদিতে যে নাড়ীর গতির পরিবর্তন হয় তাও বোধ হয় এঁরা জানেন না।

কাজেই গ্যালেন খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে রোমে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন। খুব বড় চিকিৎসক বলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। জাদুকরের মতো তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন বলে তাঁর খ্যাতি রোমে ছড়িয়ে পড়ল।

গ্যালেন সদম্ভে ঘোষণা করলেন, যদি কেউ যশ চায়, সে যেন আমার মতো পরিশ্রম করে যা কিছু আমি শিখেছি তাই শেখে।

রোমের অভিজাত সমাজের নেতারা গ্যালেনকে অ্যানাটমি এবং ফিজিঅলজি সম্বন্ধে কয়েকটা বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করলেন। গ্যালেন খুশী হয়ে রাজী হলেন। সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকেরা এই বক্তৃতা শুনতে এল।

গ্যালেন নিজে মাত্র দুটি নর-কঙ্কাল আলেকজান্দ্রিয়াতে দেখেছেন। রোমে একটি কঙ্কালও পাওয়া গেল না। তাই গ্যালেন বললেন, যদি আপনারা মানুষের হাড় সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তাহলে আফ্রিকায় যান। আলেকজান্দ্রিয়াতে গিয়ে শিখে আসুন।

ফিজিঅলজি সম্বন্ধে বক্তৃতা গ্যালেন ছাগল ও শুয়োরের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বোঝাতেন। শ্রোতারা শুনে খুশি হত যখন তিনি বলতেন, তাঁদের যে পরিমাণ সাধারণ জ্ঞান আছে রোমের চিকিৎসকদেরও তা নেই।

চার বৎসর রোমে কাটাবার পর ১৬৬ সালে যখন নিশ্চিত জানা গেল যে, গ্যালেন এবার সম্রাটের দরবারে প্রবেশাধিকার পাবেন, ঠিক তখনই গ্যালেন গোপনে রাজধানী পরিত্যাগ করলেন। গ্যালেন অবশ্য বলেছেন তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করতে চায় শুনে তিনি গোপনে শহর ছেড়ে পালিয়েছেন; কিন্তু আসল কারণ অন্য। রোমে তখন প্লেগ ঢুকেছে। তখনকার প্লেগ সত্যি ভীষণ মহামারী। এই প্লেগ সেবার সারা ইউরোপে ছড়িয়েছে। পনেরো বছর ধরে লাখে লাখে মানুষ এবং পশু ধ্বংস করেছে। সারাটা দেশ বিরাট এক কবরখানায় পরিণত হয়েছে।

তাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে গ্যালেন রোম ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

সেই থেকে এই প্লেগ মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে; আবার বন্ধ হয়েছে। রোমের পতনের পর সবচেয়ে মারাত্মকভাবে আবার প্লেগ দেখা দেয় ৫৪২ সালে। তার আগে একদিন ভূমিকম্প হয়ে অ্যান্টিঅক শহরের বেশীর ভাগই মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়। ২৫০০ হাজার লোক চাপা পড়ে মারা যায়। তারপর আসে ধূমকেতু। এক বছর ধ'রে সূর্য ঢাকা থাকে। দুর্ভিক্ষ হয়ে ইটালির বহুলোক না খেয়ে মারা যায়। তারপর শুরু হয় প্লেগ। আফ্রিকার নীল নদের ধার দিয়ে এসে এসিয়া মাইনরে ঢোকে। সেখান থেকে রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে। রোজ ৫০০০ থেকে ১০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়।

ছ শতকের পর প্রায় আট শ বছরের মধ্যে প্লেগের এমন নৃশংস প্রকোপ আর দেখা যায় নি। আবার এ রোগ দেখা দিল ১৩৩৫ সালে। আফ্রিকায়

প্লেগের কবর

এবং এসিয়ায়। দু বছর পরে কনস্টান্টিনোপলে ঢুকে গ্রীস, ইটালি এবং শেষে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। এর নাম হল তখন কালো মৃত্যু (ব্ল্যাক ডেথ)।

তিন শ বছর ধরে ইউরোপে এই রোগ যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে তার আর তুলনা নেই। কেন এ রোগ হয়, কী তার প্রতিকার কিছুই জানা নেই, তাই উদ্ভট সব কারণে যার প্রতি একবার সন্দেহ হত তাকেই নির্যাতন করে অবশেষে পুড়িয়ে মারা হত।

গুজব উঠল, ইহুদীরা এ রোগ ছড়ায়। অমনি দলে দলে ইহুদীদের পুড়িয়ে

মারা হল। তবু কিন্তু মহামারী কমল না। চৌদ্দ শতকে ইউরোপে এই রোগে দু কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। ধনী গরিব চিকিৎসক সবাইকে একসঙ্গে কবর দেওয়া হয়।

চিকিৎসকরা তারপর এই প্লেগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এক চামড়ার পোশাক পরতে শুরু করলেন; হাতে চামড়ার দস্তানা এবং লম্বা এক লাঠি। এই লাঠি দিয়ে রুগীর কব্জিতে ঠেকিয়ে তাঁরা নাড়ী দেখতেন। মুখে পরতেন মুখোশ; তার চোখের ফাঁকে কাঁচ আর পাখির লম্বা ঠোঁটের মত এক নাক। এই ঠোঁটের ভেতর গন্ধদ্রব্য ভরা থাকত। নিজের ঘরে তাঁরা আগুনে

প্লেগের পূর্বে ভূমিকম্প

নানারকম সুগন্ধি কাঠ ও মশলা জ্বালাতেন; কাপড়ে এবং ঘরে সুবাসিত গন্ধজল ছড়াতেন। অডিকোলন সেই প্লেগ লোশনের বর্তমান এক অবশিষ্ট।

চিকিৎসকরা সুস্থ লোককে তখন যা পরামর্শ দিতেন সে হল দ্রুত, দূর এবং দেরি। অর্থাৎ অতি দ্রুত পলায়ন কর, অনেক দূর দেশে যাও এবং অনেক দেরি করে ফিরো।

দ্বিতীয় শতকে গ্যালেন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। প্লেগের এই ওষুধ তিনি জানতেন। তাই রোমান সম্রাটের দরবারে ঢোকবার সুযোগ পেয়েও তিনি গোপনে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। নিজের দেশ পারগামামের দিকে যাত্রা করলেন।

পথে সাইপ্রাসের তামার খনি থেকে তিনি খনিজ ওষুধ সংগ্রহ করলেন,

প্যালেস্টাইন থেকে নিলেন একরকম প্রলেপ এবং ফিনিসিয়া থেকে সংগ্রহ করলেন নানাবিধ ভেষজ। অবশেষে তিনি দেশে পৌছলেন। পুরো একটা বছর এইখানে তিনি কাটিয়ে দিলেন।

অবশেষে সম্রাট মার্কাস অরিলিআস একদিন গ্যালেনকে ডেকে পাঠালেন। সম্রাট তখন যুদ্ধক্ষেত্রে। গ্যালেন যখন সম্রাটের ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হলেন, তখন প্লেগে সৈন্যসংখ্যা ক্ষীণতর হয়েছে অথচ রোমে তখন প্লেগ নেই। কাজেই সসৈন্যে সম্রাট রোমে ফিরে গেলেন। পরে আবার যখন যুদ্ধযাত্রায় গ্যালেনকে সঙ্গে নিতে চাইলেন, গ্যালেন বললেন, স্বপ্নে চিকিৎসা-দেবতা এস্কুলাপিয়াস তাঁকে রোম ছাড়তে বারণ করেছেন। সম্রাটের সন্তানদের দেখাশুনা করতে বলেছেন।
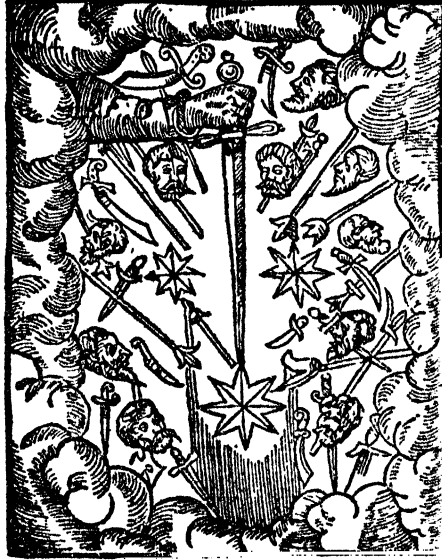
প্লেগের পূর্বে ধূমকেতু

পরে সত্যি সত্যি সম্রাটের পুত্র কমেডিয়াসের একদিন অসুখ হয়। গ্যালেন চিকিৎসা করে তাঁকে রোগমুক্ত করলেন। রাজমহিষী খুশী হলেন; গ্যালেনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিলেন। গ্যালেন রাজ-চিকিৎসক নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে তাঁর প্রধান কাজ হল, রাজার জন্য সর্ব-বিষ-হর এক মধু তৈরী করা। কাজেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর কোন বাধা হল না।

১৭৫ সালে শত্রু দমন করে একদিন সম্রাট মার্কাস অরিলিআস রাজধানীতে ফিরলেন। খুব ধুমধাম হল; ভোজ হল। অতিরিক্ত ভোজনের ফলে সম্রাটের পেটে সাংঘাতিক এক ব্যথা শুরু হল। চিকিৎসকরা সব নানাবিধ ওষুধ দিলেন কিন্তু কোন ফল হল না। অবশেষে গ্যালেনের ডাক পড়ল।

গ্যালেন এসে দেখলেন, সম্রাট বিছানায় শুয়ে; আর তিনজন চিকিৎসক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। দুজন তাঁর নাড়ী দেখছেন। গ্যালেন চুপ করে গিয়ে দাঁড়ালেন।

গ্যালেনকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মার্কাস বললেন, আপনি নাড়ী দেখবেন না ?

গ্যালেন বললেন, তিনজন চিকিৎসক এই যুদ্ধে এতদিন আপনার সঙ্গে ছিলেন, তাঁরাই আপনার নাড়ীর গতি ভাল করে জানেন। সেই তিনজনই যখন নাড়ী দেখছেন এবং বলছেন এটা জ্বরের পূর্বলক্ষণ তখন আমি দেখে আর কী করব ?

মার্কাস বললেন, তবু আপনি একবার দেখুন।

গ্যালেন রাজার নাড়ীতে হাত দিলেন। রাজার বয়স এবং শরীরের গঠন বিচার করে তাঁর মনে হল, এ নাড়ী জ্বরের নয়।

কাজেই তিনি বললেন, জ্বরের কোন লক্ষণ নাড়ীতে নেই। পেটে খাদ্যবস্তু বেশী রয়েছে। সেই থেকেই এই কষ্ট হচ্ছে।

শুনে সম্রাট খুশী হলেন। বললেন, আপনি ঠিক ধরেছেন। আমি ঠাণ্ডা খাদ্য অনেক বেশী খেয়ে ফেলেছি। কিন্তু এখন কী করা যায় ?

গ্যালেন বললেন, আপনি যদি সম্রাট না হয়ে সাধারণ কোন রুগী হতেন তাহলে আমি বলতাম, সেবাইন মদের ওপর কিছু লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে খেয়ে নিতে। কিন্তু সম্রাটের বেলায় চিকিৎসকরা অত কড়া ওষুধের ব্যবস্থা করেন না। কাজেই আপনার বেলায় কিছু উগ্রগন্ধী মলম গরম করে পশমে লাগিয়ে পেটের ওপর রাখলেই যথেষ্ট হবে।

সম্রাট বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন, পেটে ব্যথা হলে আমি তাই সর্বদা করে থাকি।

এই বলে তক্ষুনি একজনকে মলম গরম করতে হুকুম দিয়ে গ্যালেনকে ছুটি দিলেন।

কিন্তু যে মুহূর্তে গ্যালেন বেরিয়ে এলেন ঠিক তক্ষুনি সম্রাট এক গ্লাস সেবাইন মদ আনতে হুকুম দিলেন। তার ওপর লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে খেয়ে বললেন, এতদিনে আমি একজন সাহসী চিকিৎসক পেলাম। আমি অনেক চিকিৎসক দেখেছি কিন্তু এমন গুণী লোক কখনও দেখি নি।

রোগের ইতিহাস গ্যালেন ঠিক এইরকম করে লিখে গেছেন। তখনকার দিনে তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু হিপোক্রেটিস যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, রোগবর্ণনায় যে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন গ্যালেনের লেখায় তা নেই।

আজকাল ঐতিহাসিকদের মতে, হিপোক্রেটিসের নামে যে-সব লেখা প্রচলিত আছে তার একটিও নাকি হিপোক্রেটিসের নিজের লেখা নয়। সব তাঁর শিষ্যদের লেখা, নয়তো সমসাময়িক চিকিৎসকদের লেখা।

কিন্তু গ্যালেনের লেখায় কারু কোন সংশয় নেই। চিকিৎসাবিদ্যার সব কিছু তাঁর জানা এবং তিনি অভ্রান্ত এমনি এক আত্মম্ভরিতায় তাঁর লেখা ভরা। পড়লেই মনে হয়, তিনি যেন সর্বজ্ঞ।

কিন্তু তিনিই ছিলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে শারীরতত্ত্বের (এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল ফিজিওলজি) প্রথম প্রবর্তক। স্নায়ুবিদ্যার (নিউরলজি) প্রথম পরীক্ষক।

প্রাচীনকালের লেখকদের মধ্যে গ্যালেন যত বেশী গ্রন্থ রচনা করে গেছেন

প্লেগের ডাক্তার

এমন আর কেউ পারেন নি। তাঁর লেখা যেন তখনকার সময়ের জ্ঞানবিদ্যার এক বিশ্বকোষ।

অ্যানাটমির ৯খানা, শারীরতত্ত্বে (ফিজিওলজির) ১৭খানা, প্যাথোলজির ৬খানা, চিকিৎসা বিষয়ে অর্থাৎ থেরাপিউটিকস্‌-এর ১৪খানা, নাড়ীর গতি সম্বন্ধে ১৬টি প্রবন্ধ এবং ভেষজ সম্বন্ধে ৩০খানা বই তিনি লিখে গেছেন।

হিপোক্রেটিসের লেখায় সংক্রামক রোগের বিবরণ পাওয়া যায়। যক্ষ্মারোগ যে ছোঁয়াচে এবং প্লুরিসি ও নিউমোনিয়া যে আলাদা রোগ গ্যালেন তা লিখে গেছেন। যক্ষ্মারোগে যে প্রচুর পরিমাণে দুধ খাওয়া ভাল এবং বায়ু পরিবর্তন মঙ্গলকর তাও তাঁর লেখায় আছে।

অ্যানাটমিতে গ্যালেন যে সব মাংসপেশী এবং হাড়ের নাম প্রথম প্রবর্তন করেন এখনও তা বজায় আছে। কিন্তু এই অ্যানাটমির জ্ঞান তিনি মনুষ্য-

দেহের শবব্যবচ্ছেদ করে অর্জন করেন নি। তাঁর সব জ্ঞান মৃত বাঁদর এবং শুওর থেকে।

তখনকার দিনে রোমানরা আমোদের জন্য, খেলার জন্য খাঁচা থেকে হিংস্র সিংহ ছেড়ে মানুষের সঙ্গে লড়াই করাত। হাজার হাজার দর্শকের সামনে ঐ সিংহ মানুষের দেহ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলত। কিন্তু বিজ্ঞানের জন্য শবদেহ ব্যবচ্ছেদের কথা শুনলেই রোমানরা ভয়ে ঘৃণায় আঁতকে উঠত।

কাজেই গ্যালেন তাঁর অ্যানাটমি লিখেছেন পশুদেহ ব্যবচ্ছেদ করে এবং মৃত দুটি একটি ডাকাতের শব ব্যবচ্ছেদ করে।

তবু এই অ্যানাটমি পনেরো শ বছর ধরে একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে চিকিৎসকরা মনে করেছেন। গ্যালেনের পুঁথি খুলে ছাত্রদের শিখিয়েছেন।

অতএব গ্যালেনই ছিলেন প্রাচীন ইওরোপে চিকিৎসা আকাশের শেষ ভাস্কর। তারপর শুরু হল অন্ধকার। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হল—এ অন্ধকার আর কাটল না।

অমূল্য সম্পদ

ভারতবর্ষে যখন মুসলমান রাজত্ব, ইটালিতে তখন রেনেসাঁসের যুগ। এই যুগে আমেরিকা আবিষ্কার হল; গোলাবারুদ এবং ছাপাখানা তৈরী হল। মার্টিন লুথার সর্বশক্তিমান পোপের হুকুমনামা সর্বসমক্ষে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন, ১০ই ডিসেম্বর ১৫২০ সালে। তবু দেবতার রোষে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল না। ভূমিকম্প কি বজ্রাঘাতেও তিনি ধ্বংস হলেন না। ধর্মবিশ্বাসে কিন্তু ফাটল ধরল। রোমান ক্যাথলিক থেকে প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল।

তারপর কোপারনিকাস সৌরজগতের প্রকৃতি আবিষ্কার করলেন ১৫৪৩ সালে। প্রমাণ করে দেখালেন, এই পৃথিবীও অন্য সব গ্রহের মতো সূর্যের চারদিকে ঘোরে। কিন্তু এই আবিষ্কারের বিরুদ্ধে রোমান ক্যাথলিক এবং নতুন প্রগতিশীল প্রোটেস্টাণ্ট উভয় দলই এক জোটে দাঁড়াল। মার্টিন লুথার ঘোষণা করলেন, মূর্খরা সমস্ত জ্যোতির্বিদ্যাটাই উলটে দিতে চায়। কিন্তু পবিত্র বাইবেলে আছে, জোশুয়া সূর্যকেই স্থির থাকতে আদেশ দিয়েছিলেন; পৃথিবী নয়।

অথচ এই বিদ্রোহী প্রগতিশীল মার্টিন লুথার নিজে বিশ্বাস করতেন, মানুষের রোগযন্ত্রণা মহামারী সব দেহে শয়তান ঢুকে ঘটায়। শুধু তাই নয়। শয়তান আরও একটি কুকর্ম করে। নিজের বাচ্চাকে মানবশিশুর রূপ দিয়ে এই পৃথিবীর ছোট ছোট শিশু বাপ-মায়ের অগোচরে চুরি করে তার বদলে নিজের ঐ বাচ্চা রেখে যায়। কাজেই অনেক মানবশিশুকেই তিনি শয়তানের বাচ্চা বলে মনে করতেন; এবং তাদের জলে ডুবিয়ে হত্যা করা মঙ্গল বিবেচনা করতেন।

তাই ইয়োরোপে শয়তান অথবা ডাকিনী সন্দেহে অনেক স্ত্রী-পুরুষকেই তখন আগুনে পুড়িয়ে মারা হত। পুরুষ শয়তানকে বলা হত ইনকিউবাস

এবং স্ত্রী শয়তানকে সাকুবাস। রক্তে-মাংসে-গড়া এমনি এক মোহিনী নারীর করুণ নির্মম কাহিনী বালজাক লিখে গেছেন, তাঁর বিখ্যাত সাকুবাস গল্পে।

মার্টিন লুথার নিজে কানের ভিতরকার ছোট্ট এক পেঁচানো হাড়ের রোগে ভুগতেন (ডিজিজ অফ ল্যাবেরিনথ)। তাই সর্বদা তাঁর কানে বোঁ বোঁ শব্দ হত। এই শব্দ যখন বেশী হত, তিনি ভাবতেন, নিশ্চয়ই এটা শয়তানের পদধ্বনি। তাই থেকে থেকে তিনি গর্জে উঠতেন, শয়তান, এ কি তুই? (ইজ ছাট দাউ ডেভিল?)

আমাদের দেশে ভূতে ধরলে যেমন ওঝা ডাকা হত, তেমনি ইয়োরোপে

একটি স্ত্রীলোকের তিনটি শয়তান খালাস

গির্জায় খবর দেওয়া হত। বড় বড় মোহান্তরা এসে রোগীর দেহ থেকে শয়তান তাড়াতেন। রোগীর ওপর নির্যাতনের চোটে চিৎকারের সঙ্গে রুগীর মুখ দিয়ে শয়তান বেরিয়ে আসত।

আজকাল আমরা যেমন ভাবি কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের জীবাণু রুগীর মুখ দিয়ে দেহে ঢোকে, তেমনি তখনকার লোকে ভাবত শয়তানও দেহে ঐ মুখ দিয়েই ঢোকে। তাই শয়তান তাড়াবার সময় সবাই নিজের নিজের মুখ ঠোঁট চেপে বন্ধ করে রাখত। মনে ভয় হত, মুখ খোলা পেলেই রুগীর দেহ থেকে শয়তান বেরিয়ে ওঝার মুখেই বুঝি ঢুকে পড়বে।

সেই যুগে নতুন এবং পুরাতনের সংঘর্ষে একটি মাত্র লোক একা আলাদা হয়ে রইলেন। তাঁর নাম লিওনার্দো-দা ভিন্সি (১৪৫২-১৫১৯)। পিতৃ-পরিচয় তাঁর কিছু নেই। বাঁ-হাতে তিনি লিখতেন, বাঁ-হাতেই ছবি আঁকতেন।

যৌবনে তাঁর দেহে ছিল অসামান্য সৌন্দর্য ও শক্তি। তাঁর সুন্দর ব্যবহার, ঘোড়ায় চড়া ও সঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতা দেখে সবাই তখন অবাক হত। বাজারে গিয়ে খাঁচায় বদ্ধ পাখি কিনে যখন লিওনার্দো হাসতে হাসতে খাঁচা
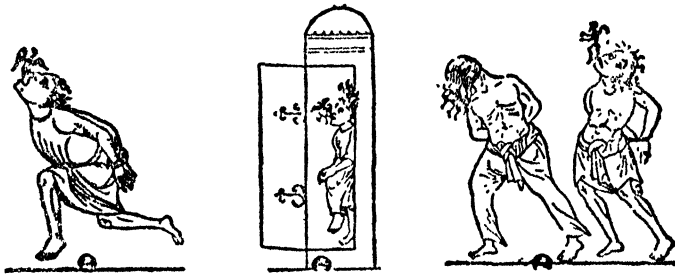
ভূতে-পাওয়া রোগী

খুলে ঐ পাখি আকাশে উড়িয়ে দিতেন, তখন লোকে তাঁর ঐ প্রাণবন্ত হাসি আর লাল পোশাকের ওপর ছড়িয়ে-পড়া জলজলে সোনালী রঙের চুল দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত। কাজেই লরেঞ্জো দি ম্যাগনিফিসিয়েণ্টএর আমলে লিওনার্দো দা ভিন্সি ফ্লোরেন্সের এক গর্বের জিনিস ছিলেন।

সারা পৃথিবীর লোক আজ লিওনার্দোর নাম জানে মস্ত বড় এক শিল্পী বলে। মোনালিসা দেল গিওকোণ্ডার ঠোঁটে যে অপূর্ব হাসি তুলি দিয়ে তিনি ফুটিয়েছেন, তাতেই তিনি বিখ্যাত। ঐ হাসি এখনও সকলের মন ধাঁধায়। সারা পৃথিবীর লোক তার অর্থ খোঁজে।

অথচ শিল্পীর ঐ তুলি ছাড়া অন্য অনেক সম্পদ তাঁর ছিল। অঙ্ক এবং পদার্থবিদ্যায় তিনি অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন। মাণ্টুয়ার ডাচেস ইসাবেলা নিজের এক প্রতিকৃতি আঁকবার অর্ডার দিয়ে দেখলেন, সেই ছবি আর আসে না। তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে তিনি খবর পেলেন, লিওনার্দো তখন জ্যামিতি নিয়ে ব্যস্ত। তুলি নিয়ে বসবার তাঁর সময়ও নেই, ধৈর্যও নেই।

পদার্থবিদ্যা এবং অঙ্কশাস্ত্রে অমন অসাধারণ জ্ঞান ছিল বলেই লিওনার্দো একদিন উড়োজাহাজ তৈরী করতে পেরেছিলেন। পাখিরা আকাশে ডানা

মেলে যেভাবে ওড়ে, তাই লক্ষ্য করে তিনিই সর্বপ্রথম উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেন।

এ ছাড়াও তাঁর আর একটি বিদ্যা জানা ছিল। সে বিদ্যা এনজিনিয়ারিং। খাদ কেটে ড্রেন তৈরী করা এবং জলের গতি নির্ণয়ে তাঁর যেমন মৌলিক গবেষণা আছে, ফসিলের উৎপত্তি নিয়েও তেমনি মৌলিক গবেষণা তিনি করে গেছেন।

কাজেই তখনকার দিনে তিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ শিল্পী, চীফ এঞ্জিনীয়ার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জীবতত্ত্ববিদ ছিলেন।

যে হাত তুলি দিয়ে মোনালিসার ঠোঁটে ঐ মন-ধাঁধানো হাসি এঁকেছে, লাস্ট সাপারের মতো অপূর্ব চিত্র এঁকেছে, সেই হাত দিয়ে সর্বপ্রথম জীবদেহে শিরা-উপশিরার রক্ত-চলাচলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব হল কি করে সত্যি তা দুর্জ্ঞেয়।

সেই একই হাত আবার শবদেহও ব্যবচ্ছেদ করেছে। অ্যানাটমি শিক্ষার জন্য এই লিওনার্দোই একা অনেক শবব্যবচ্ছেদ করেছেন। সর্বপ্রথম দেহের বিভিন্ন অংশের নির্ভুল চিত্র এঁকে গেছেন।

তখনকার দিনে অ্যানাটমি মানেই গ্যালেন যা হাজার বছর আগে লিখে গেছেন তাই। তিনি শুরুতে অন্য সকলের মতো গ্যালেনের নির্দেশ মেনে হৃদ্‌যন্ত্রের ছবি এঁকেছেন। এই ছবিতে হৃদ্‌যন্ত্রের দুটি কোঠার মাঝখানে যে পর্দা, তা ফুটো ফুটো। গ্যালেন ভাবতেন, ঐ ফুটো দিয়েই ডানদিক থেকে বাঁদিকের কোঠায় রক্ত যায়। কাজেই লিওনার্দোর নোটবইএর গোড়ার দিকে এই ভুল আছে। কিন্তু কয়েক পাতা পরেই দেখা যায়, তিনি প্রাচীন মত না মেনে নিজে যা দেখেছেন, তাই শুধু এঁকেছেন।

এই নোটবইএ ছবির পাশে দেহের বিভিন্ন জিনিস, যেমন মাংসপেশী, শিরা-ধমনী ইত্যাদি বোঝাবার জন্য তিনি যা নোট লিখেছেন, সব তা উলটো করে লেখা। আয়না সামনে রেখে সে-সব লেখা পড়তে হয়। অথচ এই লেখাও ছবির মতই সুন্দর।

এই নোটে তিনি লিখে গেছেন, প্রাচীনকালের পণ্ডিতদের লেখা তুলে কী করে বোঝাতে হয়, তা আমি জানি না। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রকাশ করা অনেক বেশী বড় কাজ বলে মনে করি। আবিষ্কারক বলে আমায় সবাই বিদ্রূপ করে, নিন্দে করে। কিন্তু যারা শুধুই অপরের পুঁথি থেকে

আবৃত্তি করে, আর নিজের চোখ দিয়ে কিছুই দেখে না, তারাই ঘৃণার যোগ্য। প্রকৃতির অনুশীলন না করে যারা শুধুই পুরনো পুঁথি ঘাঁটে, তারা প্রকৃতি-মাতার আপন সন্তান নয়, বিমাতার সন্তান।

এমনি করে লিওনার্দো-দা-ভিন্সি মধ্যযুগ অতিক্রম করে হঠাৎ এসে নতুন যুগে দাঁড়ালেন।

মানবদেহের কঙ্কাল লিওনার্দোই সর্বপ্রথম সঠিকভাবে এঁকে গেছেন। তাঁর আগে কঙ্কালের যে-সব ছবি আছে, সব তা কাল্পনিক। মেরুদণ্ডের যে প্রতিকৃতি তিনি এঁকেছেন, ঘাড়ে-পিঠে-কোমরের যে বাঁক তিনি পেন্সিল দিয়ে রেখা টেনে তুলেছেন, সত্যি তা অনবদ্য। তুলিতে আঁকা তাঁর বিখ্যাত হাসির মতোই তা বিস্ময়কর।

মাতৃগর্ভে সন্তান যে অবস্থায় থাকে, তার রূপ কাগজে ফুটিয়ে তোলা একমাত্র লিওনার্দোর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

অসুস্থ ভিক্ষুর দেহ থেকে শয়তানের মুক্তি

আজকাল অ্যানাটমি শিখতে হলে দেহের কোন অংশ আড়াআড়িভাবে কেটে বিভিন্ন পেশী শিরা ধমনী ইত্যাদির পারস্পরিক অবস্থান এবং সম্বন্ধ জানতে হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ক্রসসেকশান। লিওনার্দোই সর্বপ্রথম এই ক্রসসেকশানের প্রবর্তন করেন। মগজের ভিতরকার গহ্বরও তিনি এই পদ্ধতিতে এঁকে বুঝিয়েছেন। গলানো মোম ঢুকিয়ে মগজের ছাঁচ তৈরী করেছেন।

মানুষের দেহযন্ত্র কি উপায়ে চলে, মাংসপেশী সব কিভাবে কাজ করে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কি করে রক্ত-চলাচল হয় ইত্যাদি বিষয়ে লিওনার্দো যে কাজ করে গেছেন, সত্যি তার তুলনা নেই।

অ্যানাটমি শিখতে হলে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন, তাও লিওনার্দো লিখে গেছেন।

তিনি লিখেছেন, এই দেহযন্ত্রের যাঁরা সন্ধানী তাঁরা শুধুই অপরের মৃত্যু থেকে এই জ্ঞান সঞ্চয় করেন বলে মনে কোন ক্ষোভ যেন না রাখেন।

এই কাজ যদি আপনার ভাল লাগে, তবু হয়ত গা ঘিনঘিন করবে, রাত্রে এই শবের পাশে থাকতে ভয় করবে। তাও যদি না হয়, এ কাজে যে পরিমাণ কুশলী হওয়া প্রয়োজন, যে পরিমাণ জ্যামিতির জ্ঞান ও অঙ্কনবিদ্যা জানা থাকা আবশ্যক, আপনার হয়তো তা না থাকতে পারে। এসবও যদি থাকে, তবু হয়তো আপনার ধৈর্যের অভাব ঘটতে পারে।

আমার মধ্যে এইসব গুণ আছে কি নেই তা যে একশ কুড়িখানা পুস্তক আমি লিখেছি তাই থেকেই প্রমাণ হবে। কারণ লোভ অথবা অবহেলার জন্য আমি কখনও বাধাপ্রাপ্ত হই নি। বাধা পেয়েছি শুধু সময়ের অভাবে।

তখনকার দিনে শবব্যবচ্ছেদ করে অ্যানাটমির জ্ঞান লাভ করা অত সহজ বস্তু ছিল না। রোমানরা নিজেরা অন্য সব বিষয়ে নৃশংস হলেও শিক্ষার জন্য, জ্ঞানলাভের জন্য, মানবদেহের শবব্যবচ্ছেদ সইতে পারত না। খ্রীষ্টানরাও এই শবব্যবচ্ছেদ বেআইনী করে রেখেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে চার্চ ঘোষণা করেছিল শবব্যবচ্ছেদ তো দূরের কথা, চিকিৎসার জন্য রক্তমোক্ষণ করাও চলবে না।

ফলে সার্জনরা অপারেশন করা ছেড়ে দিলেন। এই কাজ হাতুড়ে নাপিতদের হাতে চলে গেল।

মধ্যযুগের শেষের দিকে অবশ্য এ আইন কিছুটা বদলানো হয়। শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে দুটি একটি ফাঁসির শব ব্যবচ্ছেদ করার অনুমোদন করা হয়।

কিন্তু এই শবব্যবচ্ছেদ অনেকটা লোক-দেখানো ব্যাপার ছিল। সত্যিকার অ্যানাটমি কিছুই তাতে শেখা যেত না। হাজার বছর আগে গ্যালেন যা লিখে গেছেন, তাই ভুলসুদ্ধ মুখস্থ করা হত।

লিওনার্দো অ্যানাটমি শিখলেন নিজের হাতে শবব্যবচ্ছেদ করে, প্রচলিত নিয়ম না মেনে।

ফাঁসির সময় খুনী আসামীর মুখ ভয়ে আতঙ্কে কী পরিবর্তন হয়, মুখের মাংসপেশীর কী অদ্ভুত কুঞ্চন হয়, তাই দেখতে লিওনার্দো বধ্যভূমিতে যেতেন। রোগে ভুগে যন্ত্রণায় রুগীর মুখে কী পরিবর্তন হয়, হাসপাতালে গিয়ে তাই

দেখতেন। নিজের চোখে দেখে সেই রূপ তিনি পেন্সিল দিয়ে কাগজে আঁকতেন।

এ জিনিস ঐ যুগে কেউ বরদাস্ত করত না। কাজেই একদিন মহাশক্তিমান পোপের তিনি বিরাগভাজন হলেন। বিধর্মী এবং হৃদয়হীন মৃতের শবব্যবচ্ছেদক বলে তিনি সমাজে পতিত হলেন। পোপ তাঁকে হাসপাতাল

ফ্রান্সের রানীর শয়তান নিষ্ক্রমণ

থেকে বার করে দিলেন। শবব্যবচ্ছেদ করে অ্যানাটমির জ্ঞানলাভ লিওনার্দোর বন্ধ হয়ে গেল।

তবু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই অ্যানাটমিতে তাঁর যে পরিমাণ জ্ঞান ছিল, সমসাময়িক কোন চিকিৎসকেরই তা ছিল না।

কাজেই লিওনার্দো-দা-ভিন্সিই বর্তমান কালের অ্যানাটমির সত্যিকারের জনক। কিন্তু তাঁর বংশধরেরা দু-শ বছরের মধ্যেও তাঁর নাম জানত না।

শবব্যবচ্ছেদ করে তিনি যে শত শত চিত্র এঁকে রেখে গেছেন, পরবর্তী যুগে কেউ তার সন্ধান পায় নি। এই গুপ্তধনের সন্ধান প্রথম পেলেন ইংলণ্ডের উইলিয়াম হাণ্টার; নামী সার্জন জন হাণ্টারের অগ্রজ। ১৭৮৪ সালে। সেই থেকে প্রায় সাড়ে সাত-শর ওপর লিওনার্দোর আঁকা এই অ্যানাটমির চিত্র আবিষ্কার হয়েছে। মূল ছবির অবিকৃত প্রতিকৃতি ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এইসব চিত্র এখনও ইংলণ্ডে উইণ্ডসরের রয়াল লাইব্রেরি, মিলানের আঁব্রোজিয়ান লাইব্রেরি এবং প্যারিসে ইনষ্টিটিউট দঁা ফ্রাঁসে সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

লিওনার্দো-দা-ভিন্সি যেমন নিজের পিতার পরিত্যক্ত সন্তান ছিলেন, তেমনি তাঁর দেশ এবং সেই সময়কার যুগ তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু মনুষ্যজন্ম লাভ করে ভাবীকালের জন্য যে অমূল্য সম্পদ তিনি রেখে গেছেন, এক গ্রীস দেশ ছাড়া ইয়োরোপে আর কেউ তা পারে নি।

শব ব্যবচ্ছেদ

রেনেসাঁসের আগে মধ্য যুগে ইওরোপের এক বধ্যভূমি। রাজদণ্ডে দণ্ডিত এক আসামীর আজ ফাঁসি হবে।

এই খবর ঢেঁড়া পিটিয়ে শিঙা বাজিয়ে আগে থেকেই শহরময় রাষ্ট্র করা হয়েছে। তাই দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ আজ এই ফাঁসি দেখতে বধ্যভূমিতে এসে ভিড় করেছে।

আজকের এই ফাঁসি যেন বিশেষ একটি উৎসব। গির্জে থেকে মোহান্তরা এসে ভোর হবার আগেই আসামীর গায়ে পবিত্র জল ছিটিয়েছে। শাস্ত্র থেকে শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করে আসামীর মন স্বর্গরাজ্যের প্রতি প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুতাপে এবং প্রার্থনায় যে আত্মার মুক্তি হয়, এবং সেই আত্মাই শুধু অবিনশ্বর, এই কথা নানাভাবে বোঝানো হচ্ছে।

আসামীর দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার জন্যেও আজ বিশেষ বন্দোবস্ত। দুধ ফল মদ যা খুশি তাই আসামী আজ প্রাণভরে খেতে পাচ্ছে।

যে অপরাধীকে একটু পরেই রাজার আদেশে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হবে, তার প্রতি রাষ্ট্রের আজ এত দরদ কেন? অন্য সব ফাঁসির বেলায় তো এ আয়োজন হয় না?

তারও একটি বিশেষ কারণ আছে। অন্য সব আসামীকে ফাঁসির পর মাটিতে কবর দেওয়া হয়। কিন্তু এর বেলায় তা হবে না। ফাঁসির পর এর মৃতদেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবে। চিকিৎসকরা সেই শব ব্যবচ্ছেদ করে ছাত্রদের অ্যানাটমি শেখাবেন। তাতে যা পাপ হবে, তারই স্খালনের জন্য আগে থেকে আজ এই বিপুল আয়োজন। চার্চের মতে, এই করে যত বেশি পাপ ক্ষয় হবে, শব-ব্যবচ্ছেদে তত পাপ কখনও হবে না।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথারীতি সুসম্পন্ন হবার পর আসামীকে ফাঁসিমঞ্চে তোলা হল। ঘাতকের কাজ শেষ হলে ঐ মৃতদেহ তার নতুন মালিকের অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে চলে গেল।

এইবার শুরু হবে নতুন আর-একটি অনুষ্ঠান। আগে থেকেই বড় বড় রাজকর্মচারী, স্থানীয় অবস্থাপন্ন এবং প্রভাবশালী লোকেদের খবর দেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের উপযোগী পোশাক পরে তাঁরা সব বিদ্যালয়ের শব-ব্যবচ্ছেদ ঘরে সমবেত হয়েছেন। এই সব নামী এবং মানী ব্যক্তিদের সামনে মহামান্য পোপের হুকুমনামা পাঠ করে শোনানো হল।

মধ্যযুগের শবব্যবচ্ছেদ

পোপ হুকুম দিয়েছেন, এই অপরাধীর শব শিক্ষকদের হাতে দেওয়া হবে। তাঁরা শিক্ষার জন্য, জ্ঞান লাভের জন্য এই শব আজ ব্যবচ্ছেদ করবেন।

পোপের এই ঘোষণা শোনবার পর বিদ্যালয়ের শীলমোহর সর্বসমক্ষে শবদেহে লাগানো হল। তারপর বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট একটি বক্তা উঠে ল্যাটিন

ভাষায় গুরুগম্ভীর স্বরে শাস্ত্র থেকে আবৃত্তি করলেন। এই আবৃত্তির পর চিকিৎসকরা দাঁড়িয়ে উঠে সমবেত সঙ্গীত আরম্ভ করলেন।

এই সব অনুষ্ঠান সুচারুভাবে ঠিক ঠিক পালন করার পর শব-ব্যবচ্ছেদ শুরু হল।

মুণ্ডিনাসের অ্যানাটমির প্রচ্ছদ

কিন্তু বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক নিজে এই শবব্যবচ্ছেদ করবেন না। এই ঘৃণিত শব নিজের হাতে স্পর্শ করে নিজের মানসম্ভ্রম তিনি খোয়াবেন না।

এই জঘন্য কাজ করবে তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য। নগণ্য এক নাপিত।

উঁচু এক মঞ্চে চেয়ারে বসে শিক্ষক তখনকার দিনের প্রামাণ্য গ্যালেনের লেখা অ্যানাটমি খুলে শুধু পাঠ করবেন। আর থেকে থেকে লম্বা লাঠি দিয়ে তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্যের শবব্যবচ্ছেদ দেখাবেন। বিভিন্ন আন্তর যন্ত্র ঐ লাঠি দিয়ে দেখিয়ে গ্যালেনের মত সমর্থন করবেন।

এমনি করে এই উৎসব চলবে। মৃতদেহ পচে ওঠবার আগেই শব-ব্যবচ্ছেদপর্ব শেষ হবে। তারপর হবে গান, বাজনা এবং ভোজ। দুই দিন ধরে এই মহোৎসব চলবে।

সেই যুগে এমনি করেই শবব্যবচ্ছেদ হত। এই অভিনব উপায়ে ছাত্ররা অ্যানাটমি শিখত।

এই অদ্ভুত উপায়ে অ্যানাটমি শেখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রেনেসাঁসের যুগে নিজের হাতে শবব্যবচ্ছেদ শুরু করে যিনি অ্যানাটমি শিক্ষার এই বর্তমান পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন, তাঁর নাম অ্যাণ্ড্রিআস ভেসালিআস (১৫১৪-১৫৬৪)

১৫১৪ সালের শেষ দিনে মধ্যরাত্রে এই ভেসালিআস জন্মগ্রহণ করেন বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস শহরে। তাঁর বাবা ছিলেন রাজা পঞ্চম চার্লস-এর অ্যাপোথিকেরি।

ছেলেবেলা থেকেই ভেসালিআস জীববিদ্যা প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি ভালবাসতেন। সুযোগ পেলেই কীট-পতঙ্গ ব্যাঙ যা পেতেন, তাই ব্যবচ্ছেদ করে প্রাণিবিদ্যার জ্ঞান আহরণ করতেন।

তখন প্যারিসে চিকিৎসাবিদ্যার খুব নাম। আর সিলভিআস মস্ত বড় পণ্ডিত এবং শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। সিলভিআসের কাছে ডাক্তারি শিখতে একদিন ভেসালিআস প্যারিসে এলেন। ১৫৩৩ সালে। মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে।

ভেসালিআস দেখলেন, ক্লাসে নামেই শুধু শবব্যবচ্ছেদ হয়; আসলে কিছুই শেখানো হয় না। পণ্ডিত সিলভিআস নিজে দূর থেকে চেয়ারে বসে গ্যালেনের বই খুলে বক্তৃতা দেন, আর তাঁর ভৃত্য নাপিত অপটু হাতে মৃত কুকুরের শবব্যবচ্ছেদ করে। ছাত্ররা কেউ হয়তো দেখে, কেউ দেখে না। ভৃত্য নাপিতও দায়সারা ভাবে তার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে।

পর পর কয়েকদিন এই দৃশ্য দেখে ভেসালিআস নিজেকে একদিন আর সামলাতে পারলেন না। এগিয়ে এসে ঐ নাপিতের হাত থেকে ছুরি কেড়ে

নিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে নিজেই শবব্যবচ্ছেদ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন।

অ্যানাটমি শিখতে হলে সর্বপ্রথম যা শেখা দরকার, সে হল কঙ্কালের বিভিন্ন হাড়। অথচ তখন প্যারিসে শিক্ষার জন্য একটি কঙ্কালও ছিল না।

তাই হাড়ের সন্ধানে ভেসালিআস কবরখানায় ঘুরে বেড়াতেন।

ভেসালিআসের অ্যানাটমির প্রচ্ছদ

তখনকার দিনে মৃতদেহ মাটির নিচে যেভাবে কবর দেওয়া হত, তাতে শেয়াল-কুকুর এসে অতি সহজেই তা খুঁড়ে বার করত।

এই কবরখানায় এসে ভেসালিআস মানুষের বিভিন্ন হাড়ের পরিচয় পেলেন। এই বিষয়ে তাঁর এত বেশি জ্ঞান হল যে, চোখ বুজে শুধু হাত দিয়ে ধরেই তিনি বলতে পারতেন, এটা কোন হাড় এবং মানুষের দেহে কোথায় থাকে।

শুধু তাই নয়। নিজে তিনি কবর খুঁড়ে সদ্যমৃত দেহ কাঁধে করে

লুকিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে আসতেন। রাত জেগে সেই শব ব্যবচ্ছেদ করতেন।

এমনি করে মনুষ্যদেহের কাঠামো এবং তার বিভিন্ন আন্তর যন্ত্রের সম্বন্ধে যখন তাঁর পরিচয় ঘটল, প্যারিসের ঐ গতানুগতিক শিক্ষায় আর তাঁর মন ভরল না।

তিনি ভেনিসে এলেন। ১৫৩৭ সালে। ভেনিসের সঙ্গে তখন রোমের খুব মন-কষাকষি। পোপের বিধান ভেনিস মানত না। ভেনিসের প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে গির্জের কোন লোক সরকারী চাকরি পর্যন্ত পেত না।

এই ভেনিসের অন্তর্গত পাডুয়ায় খুব বড় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেসালিআস অ্যানাটমির শিক্ষকের কাজ পেয়ে গেলেন।

আগে এই অ্যানাটমি শিক্ষা ছিল সবচেয়ে নীরস এবং কঠিন। ভেসালিআস এসে এই নীরস জিনিস প্রাণবন্ত করে তুললেন। তিনি নিজে হাতে শবব্যবচ্ছেদ করতেন; ছাত্রদের শেখাতেন। দেখতে দেখতে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর বক্তৃতা শুনতে এবং শবব্যবচ্ছেদ দেখতে দূর দেশ থেকে ছাত্ররা এসে ভিড় জমাল।

ভেসালিআস প্রথমে গ্যালেনের নির্দেশ মেনেই অ্যানাটমি পড়াতেন। পরে দেখলেন, মনুষ্যদেহের সঙ্গে গ্যালেনের অ্যানাটমি সব জায়গায় মেলে না। কাজেই তিনি গ্যালেনের মত বর্জন করে নিজে শবব্যবচ্ছেদ করে যা দেখতেন, তাই ছাত্রদের শেখাতে লাগলেন।

গ্যালেনের পরে ইউরোপে শুধু একখানি মাত্র অ্যানাটমির বই লেখা হয়। তার নাম মুনডিনাসের অ্যানাটমি। এই গ্রন্থখানি যদিও ১৩১৬ সালে লেখা, কিন্তু পাডুয়ায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৪৮৭ সালে।

মধ্যযুগে শিক্ষার জন্য শবব্যবচ্ছেদ যখন গির্জার আইনে বারণ, তখনই এই বইখানা লেখা। যদিও এই পুস্তকে গ্যালেনের অ্যানাটমি ছাড়া নতুন কিছুই নেই, তবু ঐ যুগে এই বই শিক্ষক এবং ছাত্রদের মন এই দিকে টেনেছে। অ্যানাটমি শিখতে হলে যে শবব্যবচ্ছেদ নিতান্ত প্রয়োজন, সেই বুদ্ধি জাগিয়ে তুলেছে।

ভেসালিআস ঠিক করলেন, তিনি নিজে একখানা বই লিখবেন। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখলেন, ছবি না থাকলে কেউ তা বুঝতে পারবে না। কাজেই তাঁকে আর্টিস্টের শরণাপন্ন হতে হল।

তিনি নিজে শবব্যবচ্ছেদ করে আর্টিস্টদের দেখাতেন আর তারা সব ছবি আঁকত। কিন্তু তাতেও অনেক বাধা; অনেক বিপত্তি। মৃতদেহের অংশ, আন্তরযন্ত্র ইত্যাদি আঁকার চেয়ে কোন এক সুন্দরী ভেনাসের নগ্ন চিত্র আঁকার দিকেই আর্টিস্টদের ঝোঁক তখন বেশি। কাজেই ভেসালিআস অনেক কষ্টে আর্টিস্টের কাছ থেকে কাজ আদায় করলেন, অনেক অর্থ ব্যয় করে।

তখন ব্যাসেলে নামকরা এক ছাপাখানা ছিল। গ্রীক সাহিত্যের অধ্যাপক জোআনেস ওপোরিনাস তার মালিক। এই ওপোরিনাসের কাছে একদিন ভেসালিআস এক-গাড়ি-ভরতি কাঠের ব্লক পাঠালেন ১৫৪২ সালে। এই কাঠের ব্লক থেকেই বর্তমান কালের অ্যানাটমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

পাঁচটি বৎসর ধরে পরিশ্রম করে ভেসালিআস তাঁর বইয়ের জন্য এই ব্লক তৈরি করেছেন। সেই ব্লক ছাপাখানায় পাঠিয়ে রাত্রে তাঁর ঘুম এল না। ভয় হল, যদি এগুলি প্রেসে গিয়ে না পৌছয়? যদি গাড়ি পথে ডাকাতের হাতে পড়ে? কিংবা যদি প্রেসে আগুন লাগে?

ভেসালিআস আর স্থির থাকতে পারলেন না। পাদুয়া ছেড়ে নিজেই একদিন ব্যাসেলে এসে হাজির হলেন। যখন দেখলেন, তাঁর ব্লক ঠিকমত এসে পৌছেছে, পথে কোন বিপত্তিই ঘটে নি, তখনই কেবল তিনি শান্ত হলেন।

১৫৪৩ সালে সাত খণ্ডে ভাগ করা ভেসালিআসের বিরাট কীর্তি ছাপা হয়ে প্রকাশিত হল। এই বইএর নাম, মনুষ্যদেহের গঠন (দা হিউম্যানি করপোরিস ফ্যাবরিকা)।

ঐ একই বৎসরে আরও একটি যুগান্তকারী পুস্তক প্রকাশিত হল। পোল দেশীয় চিকিৎসক এবং জ্যোতির্বিদ কোপারনিকাসের বিখ্যাত গ্রন্থ বিশ্ব-রহস্য (দা রিভোলিউসানিবাস) মুদ্রিত হল। নিজের মৃত্যুশয্যায় শুয়ে কোপারনিকাস এই বই হাতে পেলেন। ১৫৪৩ সালে।

এই গ্রন্থ থেকেই মানুষ জেনেছে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে; তাই ঋতুর পরিবর্তন হয়।

রেনেসাঁসের আগে ইউরোপের চিকিৎসা-বিদ্যা আসলে ছিল আরব দেশের চিকিৎসা-বিদ্যা। ছাত্রদের এই বিদ্যাই শেখানো হত।

কিন্তু রোমানদের মতো আরব দেশেও শব ব্যবচ্ছেদ ধর্মে বারণ ছিল।

গ্যালেনের পর তাই অ্যানাটমি চর্চা আরব দেশে কিংবা ইউরোপে আর হয়নি। কাজেই ইউরোপে রেনেসাঁসের আগের অ্যানাটমি মানেই গ্যালেনের ঐ প্রাচীন অ্যানাটমির আরবী সংস্করণ।

ভেসালিআসের এই নতুন অ্যানাটমি গ্যালেনের পুরনো অ্যানাটমিকে হঠাৎ এক দিন নস্যাৎ করে দিল। ভুলের পর ভুল বার করে পুরনো মত বাতিল করে দিল।

প্রাচীন চিকিৎসকরা সব ক্ষেপে উঠলেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত হলেন, ভেসালিআসের শিক্ষক ; প্যারিসের বিজ্ঞ পণ্ডিত সিলভিআস।

গ্যালেন বলে গেছেন, মানুষের উরুর হাড় বাঁকা। সিলভিআস তাই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ভেসালিআস বললেন, এ হাড সোজা। প্রমাণের জন্য যখন মানুষের কঙ্কাল এনে সিলভিআসকে দেখানো হল, সিলভিআস রেগে উঠে বললেন, গ্যালেনের সময় এ হাড় ঐ রকম বাঁকাই ছিল। মানুষ আঁটাসাঁটা ব্রিচেস পরে এখন এ হাড সোজা করে ফেলেছে।

এমনি করে গ্যালেনের সব ভুল সিলভিআস সমর্থন করতেন গায়ের জোরে। বলতেন, গ্যালেনের সময় ঐ রকমই ছিল। এখন যদি না থাকে, তাহলে তা মানুষের কুকর্ম এবং বিলাসের ফল। আর ভেসালিআস নিজে একটি মূর্খ এবং পাগল।

প্রাচীনপন্থীদের এই তিরস্কার এবং নিন্দায় ভেসালিআসেব ধৈর্যচ্যুতি হল। ভেতরে ভেতরে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে খবর পেয়ে একদিন তাঁর মনে হল, এই কঠিন পরিশ্রম সব বৃথা। এ যেন বেনা বনে মুক্তো ছড়ানো। কার জন্য তিনি মিথ্যে এত খেটে মরবেন ?

তাঁর বইএর দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য যেসব পাণ্ডুলিপি তিনি তৈরি করেছিলেন, সযত্নে আর্টিস্ট দিয়ে ছবি আঁকিয়েছিলেন, সব তা রেগে-মেগে একদিন তিনি পুড়িয়ে ফেললেন। তারপর পাদুয়া ছেড়ে স্পেনের রাজ-চিকিৎসকের চাকরি নিলেন, ১৫৪৪ সালে।

তখনকার দিনের রাজ-চিকিৎসকের চাকরি মানেই খোশামোদের কাজ। বিশ বছর ধরে ভেসালিআস এই কাজ করলেন। রাজসভায় কি পোশাক কখন পরতে হয়, কার সামনে কতটুকু হাঁটু নুইয়ে অভিবাদন করতে হয়, কি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে হয়, এই নিয়ে তাঁর সময় কেটে গেল। বিবাহ করে তিনি সংসারী হলেন ; ধনী হলেন।

দেখতে দেখতে কুড়িটি বৎসর অতিক্রান্ত হল। ভেসালিআস না করলেন কোনো শবব্যবচ্ছেদ, না দেখলেন কোনো কঙ্কাল।

একদিন তাঁর হাতে একখানা নতুন বই এল। অবসর সময়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ভেসালিআস দেখলেন, এ বই নতুন একখানা অ্যানাটমি। তাঁরই ভূতপূর্ব পাডুয়া বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্র ফ্যালোপিআসের লেখা।

পড়তে পড়তে ভেসালিআসের রক্তে যেন ঈর্ষার বিষ ছড়িয়ে পড়ল। আধুনিক অ্যানাটমি তাঁরই সৃষ্টি, অথচ ফ্যালোপিআসের এই অ্যানাটমিতে কত নতুন জিনিসের আবিষ্কার! ভেসালিআস নিজের চোখে জীবনে কখনও তা দেখেন নি!

ভেসালিআসের মনে হল অ্যানাটমির যে সম্মান, যে গৌরব তাঁর একদিন একচেটিয়া ছিল, সব তা ধূলিতে মিশে গেছে। এমন কি কোথায় তিনি ভুল লিখেছেন, তাও এই ছাত্র ধরে ফেলেছে।

ভেসালিআস মনে মনে সঙ্কল্প করলেন, রাজ-চিকিৎসকের এই খোশামোদের চাকরি তিনি ছেড়ে দেবেন। আবার অ্যানাটমির গবেষণায় মন দেবেন।

সেই সময় একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর অজানা রোগে মৃত্যু হল। কি জন্য তাঁর মৃত্যু হল, তা দেখবার জন্য ভেসালিআস তাঁর মৃতদেহ (পোস্ট মর্টেম) ব্যবচ্ছেদ করবেন স্থির করলেন। তাঁর সুপটু হাতে যেই তিনি মৃতের বক্ষপিঞ্জর উন্মুক্ত করলেন, দেখা গেল, মৃতের হৃদযন্ত্রের কাজ তখনও বন্ধ হয় নি। তখনও হৃদযন্ত্রের স্পন্দন দেখা যাচ্ছে।

মুখে মুখে এই কথা ছড়িয়ে পড়ল। শত্রুরা রটিয়ে দিল পোস্ট মর্টেমের জন্যই রুগীর মৃত্যু হয়েছে। এই জন্য দায়ী ভেসালিআস। কাজেই তাঁর মৃত্যুদণ্ড হল। কিন্তু রাজা এই প্রাণদণ্ড মকুব করে তাঁকে দেশ ছেড়ে তীর্থ যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন।

কারু কারু মতে ভেসালিআস দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান স্ত্রীর ভয়ে। স্ত্রীর জিহ্বায় তখন যে বিষ দিনরাত ঝরে পড়ত, ভেসালিআস তা আর সহ্য করতে না পেরে অবশেষে একদিন তীর্থগামী হলেন।

যে কারণেই হোক ভেসালিআস স্পেন ছেড়ে প্যালেস্টাইনে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে খবর পেলেন, ফ্যালোপিআস অতি অল্প বয়সে মারা গেছেন, কাজেই পাডুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় আবার ভেসালিআসকে অ্যানাটমির অধ্যাপক নিযুক্ত করতে চান।

ভেসালিআসের মনে আবার নতুন আশা জাগল। আবার সেই অ্যানাটমি নিয়ে গবেষণা করবেন, যৌবনের সেই হারানো দিনগুলি আবার ফিরে আসবে ভেবে তাঁর মন আনন্দে নেচে উঠল। তিনি জাহাজে চড়ে পাতুয়া রওনা হলেন।

কিন্তু মাঝ সমুদ্রে হঠাৎ এক ঝড় উঠল। পরদিন এক ভ্রাম্যমান স্বর্ণকার সমুদ্রের ধারে ছোট্ট একটি দ্বীপে অজানা এক মৃতদেহ দেখতে পেল। এই দেহ যাঁর, তাঁরই নাম ভেসালিআস।

ঐতিহাসিকদের মতে, উকুনের কামড়ে সংক্রামিত সাংঘাতিক টাইফাস রোগে ভেসালিআসের মৃত্যু হয়।

বর্তমান কালের অ্যানাটমি, এই ভেসালিআসেরই সৃষ্টি। তাঁরই প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করে মেডিক্যাল ছাত্ররা এখনও অ্যানাটমি শেখে। শব-ব্যবচ্ছেদ করে।

সভ্যতার মানদণ্ড

প্রাচীন যুগে মানবসমাজে স্ত্রীলোকের সন্তানধারণ এবং প্রসব সাধারণ একটা প্রাকৃতিক ঘটনা বলেই গণ্য হত। তাই স্ত্রীলোকের ব্যাপারে পুরুষরা সাধারণত কোনো মাথা ঘামাত না। আত্মরক্ষা এবং দলরক্ষার জন্যই তারা সর্বদা ব্যস্ত থাকত। কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে একবার যদি এই ব্যাপারে বাধ্য হয়ে মাথা ঘামাতে হত, তাহলে সাংঘাতিক একটা গড়বড় না করে পুরুষরা ছাড়ত না। ফলে প্রসূতির কষ্ট লাঘব তো দূরের কথা, উলটে তার প্রাণ নিয়েই টানাটানি পড়ে যেত।

তাই দেখতে পাই তখনকার প্রসূতি একা, কিংবা এক সখী, কি কোনো এক বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে প্রসবকালে দল ছেড়ে জঙ্গলে চলে যাচ্ছে। নদীর ধারে নিরিবিলি কোনো এক জায়গা খুঁজে নিচ্ছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে স্নান করে আবার দলে ফিরে আসছে।

তখনকার ঐ আদিম সমাজে প্রসূতিদেব আজকালকার সভ্যসমাজের মতো এত রকমারি বিভ্রাট ঘটত না। স্ত্রীজাতিকে তখন শারীরিক কঠিন পরিশ্রম করতে হত; প্রসবের আগে পর্যন্ত। এই পরিশ্রমে পেটের সন্তান নড়েচড়ে বাইরে বেরুবার সহজ এবং সাধারণ পথটিতে ঢুকে পড়ত। মাতার কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের ফলে তখন সন্তানের দেহ আয়তনে অনেক ছোট হত। ওজনেও অনেক কম থাকত। সভ্যতার নানাবিধ বিধি-নিষেধ না থাকায় মাতৃদেহে প্রচুর পরিমাণে সূর্যের আলো লাগত। সভ্য খাদ্য না খাওয়ায় রিকেটস্ হয়ে পেলভিসের (বস্তির হাড়) হাড় বেঁকে যেত না। কাজেই প্রসবের সময় মাথা নিম্নগামী করে সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে অনায়াসে ভূমিষ্ঠ হত; সাধারণত কোনো বিঘ্ন ঘটত না।

তখন লোকে বিশ্বাস করত, মাতৃগর্ভ থেকে শিশু বাইরের পৃথিবীতে আসে নিজের ইচ্ছায়। কাজেই প্রসবে বিলম্ব হলে সবাই ভাবত, শিশুর

ভূমিষ্ঠ হবার কোনো ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে শুধু মাকে ভোগানো আর খামোখা কষ্ট দেওয়া। তাই সাহায্যকারিণীরা গর্ভস্থ শিশুকে নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করত। বলত, তাড়াতাড়ি বেরুলে খেতে পাবি। দুধ পাবি। দেরি হলে উপোস করে মরবি।

ক্ষুধায় কাতর হয়ে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে তাড়াতাড়ি বেরুবে এই আশায় মাতাকে 'প্রসবের আগে থেকে উপোস করিয়ে রাখা হত। তাতেও যখন সময়মত প্রসব হত না, প্রসবকাল বিলম্বিত হত, তখন নিঃসংশয়ে বোঝা যেত, গর্ভে মানুষ নেই। যে আছে সে রাক্ষস অথবা শয়তান। কাজেই এই রাক্ষস কি শয়তানকে গর্ভেই বিনষ্ট করা হত। এজন্য পরে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া পর্যন্ত প্রচলিত হল। এত অনুনয় বিনয় প্রলোভন এবং ভয় দেখানো সত্ত্বেও যে দুষ্ট সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে বার হয় না সে যেমন রাক্ষস অথবা শয়তান, তেমনি যে মাতার গর্ভে এই সন্তান থাকে সেও নিশ্চয় রাক্ষুসী কিংবা শয়তানী। অতএব উভয়ই শাস্তির যোগ্য। মৃত্যুর যোগ্য।

প্রসবকাল অনাবশ্যক বিলম্বিত হলে পুরুষদের অবশেষে ডাকা হত। তারা এসে যে সাহায্য দিত, তা তখন সরাসরি সোজা। ভেতরে কোনো ঘোরপ্যাঁচ থাকত না।

সন্তান এখনও ভূমিষ্ঠ হয় নি? দেখা যাক, কি করে এবার গর্ভে থাকে। প্রসূতিকে দু পা ধরে শূন্যে তুলে মাথা নিচু করে খুব কষে ঝাঁকানো হল।

তবুও প্রসব হল না? তাহলে প্রসূতিকে মাটিতে ফেলো। কম্বলে জড়িয়ে বেশ করে গড়িয়ে দাও। পেটে চাপ পড়লে আপনি ব্যাটা বেরিয়ে আসবে।

তাতেও হল না? এবার তাহলে পেটের ওপর চাপ দাও। পা দিয়ে মাড়াও। না হলে দুই বগলে দড়ি দিয়ে প্রসূতিকে গাছের গুঁড়িতে ঝুলিয়ে দাও। পেটের ওপর কাপড় বেঁধে দুদিক থেকে টানো। কিংবা খাটের সঙ্গে বেঁধে খাটের দু-পা শূন্যে তুলে মাটিতে রাখা ভাঙা ডালপালার ওপর আছড়ে ফেলো।

কোথাও আবার ভয় দেখিয়ে প্রসব করানো সহজ হবে ভেবে প্রসূতিকে একলা নির্জন মাঠের মাঝে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হত। সেই সময় এক অশ্বারোহী বীর ঘোড়া ছুটিয়ে প্রসূতির দিকে তেড়ে আসত। প্রসূতি

ভাবত, তার দেহের ওপর দিয়েই বুঝি ঐ ছুটন্ত ঘোড়া মাড়িয়ে চলে যাবে। এমনি করে ছুটে এসে সর্বশেষ মুহূর্তে প্রসূতির গায়ে না পড়ে পাশ কাটিয়ে অশ্বারোহী চলে যেত। আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এইরকম ভয় দেখানোর প্রথা খুব চালু ছিল।

তখনকার দিনে পুরুষদের সাহায্য এইরকমই হত। এমনকি ষোলো শতকের ইউরোপে পর্যন্ত ঐ ধরনের সাহায্য অনেক জায়গায় দেখা যেত।
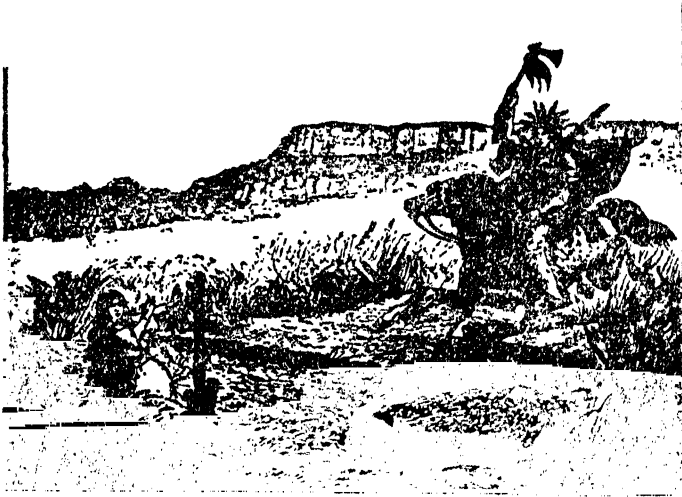
রেডইণ্ডিয়ানদের প্রসূতিকে সাহায্য

প্রসবকালে প্রসূতিকে সাহায্য করার রীতি মানব সমাজে অতি সুপ্রাচীন। যুদ্ধকালে আহত সৈনিকদের যেমন পুরনো যোদ্ধারা ক্ষতের চিকিৎসায় সাহায্য করত, তেমনি যে প্রতিবেশী রমণীর নিজের অনেক সন্তান-সন্ততি হয়েছে সে এই প্রসূতিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত। ক্রমে কোনো কোনো স্ত্রীলোক শুধু এই কাজেই বেশ দক্ষ এবং অভিজ্ঞ হয়ে উঠল। প্রসবকালে এদেরই তখন ডাক পড়তে শুরু হল। এরাই পরে ধাত্রী অথবা পেশাদার দাই হয়ে গেল।

দাইএর ওপর নির্ভর করে প্রথমে কিছু সুবিধে হলেও, এই দাইরাই পরে ধাত্রীবিদ্যার উন্নতির প্রধান বাধা হয়ে উঠল।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা পুরোহিত,

চিকিৎসক, নাপিত অথবা সার্জনদের হাতে চলে গেল। উন্নতি শুরু হল ধীরে ধীরে। কিন্তু প্রসবের বেলায় কিছুই তা হল না। দাইরা নিজেদের অধিকার ছাড়ল না। প্রসবকালে স্ত্রীলোক ছাড়া পুরুষের কোনো সাহায্য দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব করে তুলল। সমাজের অতি নিম্নশ্রেণী থেকে এই দাইরা আসত। এই বিদ্যা তাদেরই একচেটিয়া হয়ে রইল। কাজেই এর উন্নতিও শীঘ্র আর হল না।

প্রসবকালে দাইদের সকল রকম প্রচেষ্টা যখন বিফল হত তখনই শুধু সঙ্কটকালে পুরোহিত, ওঝা এবং শেষে চিকিৎসককে ডাকার নিয়ম হল। প্রাচীন সভ্যতার শীর্ষস্থানে যে সব দেশ, কেবল তারাই দেখি চিকিৎসকেব হাতে প্রসূতিকে ছেড়ে দিত। তাঁর নির্দেশ মেনে চলত।

প্রাচীন ইহুদী সভ্যতায় তাই প্রসূতির প্রতি যত্নের ব্যবস্থা ছিল। ধাত্রীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার বিধান ছিল। খ্রীষ্ট-জন্মের তিন হাজার বছর আগে মিশরে এবং দেড় হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে ধাত্রীর আহ্বানে চিকিৎসক প্রসূতির ঘরে যেতেন ; এবং ব্যবস্থা দিতেন।

প্রাচীনকালের প্রসূতির সবচেয়ে ভয় ছিল, প্রসবকালে পেটের মধ্যে সন্তান যদি স্বাভাবিকভাবে মাথা নিম্নমুখী করে না থাকে, যদি পেটে আড়াআড়িভাবে থাকে, তাহলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে বিঘ্ন হত। প্রসূতির মৃত্যু হত।

এ অবস্থা হলে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসক প্রসূতির পেটে হাত রেখে শিশুর পা ধরে ঘুরিয়ে মাথা নিম্নমুখী করে দিতেন ; খ্রীষ্ট-জন্মের দেড় হাজার বছর আগে। দু হাজার বছর পরে খ্রীষ্টীয় ষোলো শতকে ইয়োরোপ আবার নতুন করে এ প্রথা প্রবর্তন করতে শিখল। ফরাসী দেশে। শ্রেষ্ঠ সার্জন আঁবরোজ পারীর হাতে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে নিয়ম ছিল, প্রসূতিকে চারজন বৃদ্ধা প্রসব করাবে। এদের প্রত্যেকের হাতের নখ খুব ছোট করে আগে কাটতে হবে। না হলে প্রসব করানো চলবে না।

শাস্ত্রের নির্দেশ ছিল, প্রসবের জানা সব উপায় যখন ব্যর্থ হবে তখনি শুধু চিকিৎসক অগত্যা অস্ত্রোপচার করবেন। কিন্তু এমনিভাবে ছুরি চালাবেন যাতে শিশুর দেহে কোনো ক্ষত না হয়। কারণ তাহলে শিশু এবং মাতা দুজনেরই মৃত্যু হবে।

এই অস্ত্রোপচারের নাম এখন সিজারিয়ান অপারেশন অথবা সেক্শন। অনেকের ধারণা জুলিয়াস সিজার এই অপারেশনের সাহায্যে ভূমিষ্ঠ হন। তাই তাঁরই নামে এই অপারেশন।

কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। জুলিয়াস সিজারের যখন জন্ম হয়, তখনকার যুগে জীবন্ত কোনো গর্ভবতীর ওপর এ অপারেশন হয়েছে বলে জানা নেই। তখন নিয়ম ছিল, মৃত্যুকালে গর্ভে সন্তান থাকলে কবর দেবার আগে মাতার পেট কেটে সন্তান বার করে নিতে হবে। রোমক আইন সংশোধন করে

প্রাচীনকালে প্রসূতিকে সাহায্যের রকমফের

রাজা নুমা পমপিলিআস এই নতুন আইন প্রবর্তন করেন। খ্রীষ্ট-জন্মের ৭১৫ বছর আগে। রাজার আইন মানেই তখন সিজারের আইন। রাজার আইনে এই অপারেশন, কাজেই এটা সিজারের অপারেশন। অথবা সিজারিয়ান সেক্শন।

জুলিয়াস সিজার তাঁর মা জুলিয়াকে যেসব চিঠিপত্র লিখে গেছেন তা থেকেই প্রমাণ হয় সিজারের জন্মের বহুকাল পর পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। অথচ ঐ সময়ে এ অপারেশন হলে সিজার এবং তাঁর মা দুজনেরই নির্ঘাত মৃত্যু হত। তখন না ছিল অজ্ঞান করাব পদ্ধতি, না ছিল অপারেশনে জীবাণুশূন্য করার রীতি।

আজকালকার ধাত্রীবিদ্যা প্রাচীন গ্রীক দেশের ধাত্রীবিদ্যা থেকে উদ্ভূত। গ্রীক দেশ তখন খুব সুসভ্য। পুরাতন মিশর এবং ভারতের ধাত্রীবিদ্যা তাদের সব জানা। কাজেই তাদের ধাত্রীরা প্রসূতির যত্ন নিতে জানত। প্রসবে বিঘ্ন ঘটলে চিকিৎসককে খবর দিত। তবুও সেই সময় প্রসূতির লাঞ্ছনা নিতান্ত কম ছিল না। ধাত্রীরা প্রসূতিকে বিছানা থেকে তুলে আবার ধপ করে বিছানায় ফেলে দিত। ভাবত, এই করেই বুঝি তাড়াতাড়ি প্রসব করানো সম্ভব হবে।

তখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ধাত্রীরা নবজাত শিশুটি কোলে নিয়ে বাইরে এসে আজকালকার মতোই সন্তানের পিতাকে দেখাত। কিন্তু এই ছেলে দেখানোর উদ্দেশ্য তখন ছিল অন্য। সন্তানের চেহারা দেখে পিতা ঠিক করতেন এ শিশু গ্রহণযোগ্য কিনা। ধাত্রীর কোল থেকে শিশুকে পিতা যদি নিজের কোলে নিতেন তাহলেই বোঝা যেত পিতা সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করলেন। শিশুকে গ্রহণ করলেন।

গ্রহণ না করলে পিতা শিশুকে ছুঁতেন না, মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেন। তখন ধাত্রীরা ঐ শিশুকে হয় পাহাড়ের ওপর, নয় কোনো মন্দিরের সিঁড়িতে ফেলে দিয়ে আসত। কাজেই না খেয়ে শিশু মারা যেত। দৈবাৎ কোনো পথচারীর দয়া হলে তাকে তুলে নিয়ে আসত এবং নিজের বলে মানুষ করত।

তখনকার ধাত্রীদের কাজ তাই শুধু প্রসব করিয়েই শেষ হত না। ধাত্রীরা স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করত। বিবাহের পূর্বে পরীক্ষা করে কনের পক্ষে বিবাহ উচিত কি না তার পরামর্শ দিত। গর্ভবতীর ইচ্ছা থাকলে গর্ভ নষ্ট পর্যন্ত করাত। এ কাজ তখন বে-আইনী ছিল না।

গ্রীকদের কাছ থেকে ধাত্রীবিদ্যা রোমানরা শিখল। কিন্তু রোমক সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকদের এই জ্ঞান বিজ্ঞান ক্রমশ চাপা পড়ে গেল।

খ্রীষ্টধর্ম সারা ইওরোপে পুরোহিত এবং মোহান্তদের হাতের মুঠোয় চলে গেল। মোহান্তরা গ্রীকদের লেখা চিকিৎসাবিদ্যার পাণ্ডুলিপি মঠে নিয়ে ফেলে রাখল। কেউ খুলে দেখল না। পড়ল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হল, তবু কেউ জানল না।

মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি এবং যুক্তির চেয়ে অলৌকিক শক্তির প্রসার বাড়ল। মানুষের পাপে আর বিধাতার অভিশাপে রোগ হয় এই বিশ্বাস মোহান্তরা

লোকের মনে ঢুকিয়ে দিল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং অলৌকিক বিদ্যায় রোগ সারে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল। ইউরোপে মাতৃজাতির নিদারুণ দুর্দিন শুরু হল।

ইউরোপের মধ্যযুগ মাতৃজাতির লাঞ্ছনার চরম যুগ। তখন না ছিল আদিম জাতির সন্তান প্রসবের সেই সহজ সরল রীতি, না ছিল পূর্ববর্তী সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান। অজ্ঞতা, কুসংস্কাব এবং বর্বরতা ধর্মের নামে মাতৃজাতির কাঁধে চাপল। ধর্মের নামে অমানুষিক অত্যাচার শুরু হল। নিজেব রক্ত দিয়ে অপরিসীম যন্ত্রণা সহ্য করে, সুতীব্র ব্যথায় কাতর হয়ে অবশেষে নিজের প্রাণ বলি দিয়ে সমগ্র মাতৃজাতি তার সেই প্রথম পাপ, ঐ প্রথম পুরুষ আদমকে প্রলুব্ধ করার ঋণ শোধ করল।

আদিম মাতৃজাতি সন্তান ধারণ এবং প্রসবে কোনো বিঘ্ন হতে পারে ভাবলে অনায়াসে নিজের ইচ্ছায় আগেই গর্ভ নষ্ট করতে পারত। গ্রীক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ পর্যন্ত এ প্রথা চালু ছিল। খ্রীষ্টীয় সভ্যতায় ধর্মযাজক এবং মোহান্তবা অনন্ত নরক ভোগের শাস্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে এ প্রথা বন্ধ করে দিল। গর্ভ নষ্ট করায় যে সাহায্য করবে তার পর্যন্ত প্রাণদণ্ডের বিধান হল। অথচ প্রসবের বিঘ্ন ঘটলে অন্য কোনো ব্যবস্থা করা হল না। প্রসবের সময় ধাত্রী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ চিকিৎসকেব উপস্থিতি সাংঘাতিক পাপ বলে বর্জিত হল। প্রসূতিকে একান্তভাবে ঐ মূর্খ অশিক্ষিত কুসংস্কারগ্রস্ত দাইদের হাতে ফেলে রাখার নিয়ম হল। কাজেই তখন অতি সাধারণ প্রসবেও জ্বব কিংবা অন্য কোনো উপসর্গ হয়ে প্রসূতির যন্ত্রণা বাড়ত। অবশেষে মৃত্যু হত।

খ্রীষ্ট-জন্মের পর পনের শ বছরের মধ্যে তাই ধাত্রীবিদ্যার একখানি মাত্র উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৫১৩ সালে। জার্মানির ওআরম্স্‌এর ইউকেরিআস্ রস্‌লিন এই বইখানি লেখেন। জার্মান ভাষায়। অসাবধানী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং ধাত্রীদের জন্যে।

বইখানির নাম 'গার্ডেন অফ রোজেস্ ফর প্রেগন্যাণ্ট উইমেন অ্যাণ্ড ফর মিডওয়াইভস'। লেখা হয় ডাচেল অফ ব্রানস্‌উইক, ক্যাথারিনের নির্দেশে।

বইখানা যদিও প্রসবকালে ধাত্রীদের অবশ্য করণীয় সব বিষয় নিয়ে লেখা, তবু মজা এই যে লেখক জীবনে কখনও নিজে সন্তান প্রসব দেখেন নি। কোনো পুরুষের সাধ্য ছিল না তখন এই ঘটনা দেখা। হামবুর্গের এক ডাক্তার

স্ত্রীলোকের পোশাক পরে একদিন সন্তান প্রসব দেখতে এক আঁতুড়ঘরে ঢোকেন। শেষে ধরা পড়ায় তাঁর শাস্তি হয় প্রাণদণ্ড। হাজার হাজার লোকের সামনে তাঁকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়। তখন ১৫২২ সাল।

তবু এই বইএ অনেক কাজ হল। ইউরোপের সব ভাষায় এই বই অনূদিত হল। ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজীতে। প্রসূতি এবং সন্তান উভয়েরই যে সমান যত্নের প্রয়োজন এই জ্ঞানের প্রথম আলোড়ন শুরু হল। খ্রীষ্টের পর ষোলো শতকে।

খ্রীষ্ট-জন্মের পনের শ বৎসরেব মধ্যে ধাত্রীবিদ্যার প্রথম পুস্তক
ডাচেস অব ব্রান্‌স্‌উইক্‌কে উপহার

সেই সময় প্যারিসে আঁবরোজ পারী মস্ত বড় সার্জন। সাধারণ নাপিত থেকে নিজের বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়ের গুণে সবচেয়ে বড় সার্জন বলে নাম করেছেন। যুদ্ধে গিয়ে বন্দুকের গুলি-জনিত ক্ষতের নতুন চিকিৎসা আবিষ্কার করেছেন। তখনকার চিকিৎসা ছিল ক্ষতে তেল ফুটিয়ে ঢালা। যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের ক্ষতে ঐ উত্তপ্ত তেল ঢালতে গিয়ে একদিন পারী দেখলেন, তাঁর কাছে সঞ্চিত সব তেল নিঃশেষ হয়েছে। অথচ সেদিন আহতদের সংখ্যা অনেক বেশী। কি করবেন ভেবে না পেয়ে পারী শুধু তুলো আর কাপড়

দিয়ে ঐ ক্ষত বেঁধে দিলেন। রাত্রে তাঁর ঘুম হল না। ভাবলেন, অতগুলি আহত সৈনিক তাঁরই ভুলে বুঝি মারা যাবে।

পরদিন গিয়ে দেখেন যাদের ক্ষতে তপ্ত তেল ঢালা হয়েছিল তারাই শুধু যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, আর যাদের ক্ষতে তিনি শুধু তুলো এবং কাপড় চাপা দিয়ে এসেছিলেন তারা বেশ ভাল আছে। হাসছে।

পারী বুঝলেন, ক্ষতে তপ্ত তেল ঢাললে অপকারই বেশী হয়। সেই থেকে ক্ষতের নতুন চিকিৎসা শুরু হল।

প্রসূতির সন্তান যদি পেটে আড়াআড়ি থাকে তাহলে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে মাথা নিম্নগামী করে স্বাভাবিকভাবে প্রসবের রীতি আবার এই আঁবরোজ পারী নতুন করে প্রবর্তন করলেন। তাঁর আগে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরা এইসব ক্ষেত্রে সিজারিআন অপারেশন করবার বুদ্ধি দিতেন। তাতে মাতা এবং শিশু দুজনেরই মৃত্যু হত। পারী এই 'ভারসান' চালু করে মাতা এবং শিশু উভয়েরই প্রাণ রক্ষা করলেন; খ্রীষ্টের পর ষোলো শতকে।

এই ষোলো শতকে মাতৃজাতির কল্যাণের কথা ইওরোপ ভাবতে শিখল। ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার স্কুল খোলা হল ফরাসী দেশে। ধাত্রীরা এখন আর অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর দাই মাত্র রইল না। দস্তুরমত লেখাপড়া শিখে গ্রাজুয়েট হতে লাগল।

এর পরে পুরুষরাও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ পেল, ঐ ফরাসী দেশে। রাজা চতুর্দশ লুই-এর বক্ষিতা লা ভালিয়ঁার প্রসবকালে সর্বপ্রথম পুরুষ ধাত্রী ডাকা হল। রাজা নিজে পর্দার আড়াল থেকে এই পুরুষ ধাত্রীর হাতের কাজ দেখে খুব খুশী এবং মুগ্ধ হলেন। সেই থেকে প্রসবের সময় পুরুষ ধাত্রী ডাকা অভিজাত মহলে এক ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেল; সতেরো শতকে।

ঐ সময়ে ইংলণ্ডে রানী এলিজাবেথের রাজত্ব। ফরাসী দেশ থেকে পালিয়ে এক ডাক্তার ইংলণ্ডে এসে বসবাস শুরু করলেন। তাঁর দুই ছেলে ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ হয়ে উঠলেন। এঁদের দুজনের নামই পিটার চেম্বারলিন। বড় পিটার এবং ছোট পিটার। ধাত্রীবিদ্যায় এই চেম্বারলিনদের এত বেশী নাম হয়ে গেল যে, রাজ-অন্তঃপুরে পর্যন্ত এঁদের ডাক পড়ল। রানী হেনরিয়েটা মেরিয়া এই পুরুষ ধাত্রীর সাহায্য নিলেন ১৬২৮ সালে।

আদিম মাতৃজাতির প্রসবকালে সবচেয়ে বেশী যে ভয় ছিল তা ঐ গর্ভস্থিত সন্তানের আড়াআড়িভাবে থাকা। আঁবরোজ পারী সে ভয় দূর করেছেন,

সন্তানকে পা ধরে ঘুরিয়ে, পোডালিক ভারসান করে। আদিম কালে সাধারণতঃ সন্তানের আয়তন ছোট থাকত, মাথাও তাই ছোট হত। তাই মাথা নিম্নমুখী থাকলে মাতার প্রসবে কোনো বিঘ্ন হত না।

কিন্তু সভ্যতার কল্যাণে এবং ধর্মের অনুশাসনে মাতৃজাতির নতুন এক বিপত্তি শুরু হল। শারীরিক পরিশ্রম কমে গিয়ে এবং সভ্য খাদ্য প্রচুর খেয়ে সন্তানের আয়তন বৃদ্ধি হল, মাথা বড হতে লাগল। কাজেই গর্ভে সন্তান নিম্নমুখী থাকা সত্ত্বেও প্রসব-দ্বারে এসে শিশুর ঐ বড মাথা সহজে আর বেরুত না। প্রসবে দারুণ বিঘ্ন দেখা দিত। এমন কি অস্ত্র দিয়ে ঐ শিশু খণ্ড খণ্ড করে কেটে শেষে বার করতে হত।
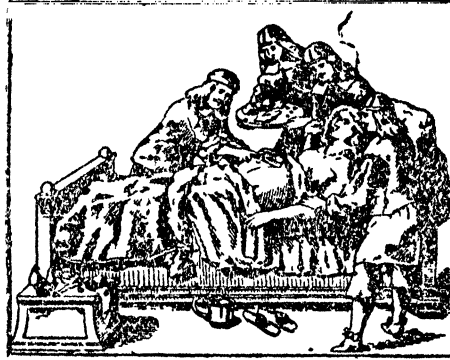
সতেরো শতাব্দীতে সিজারিয়ান অপারেশন

এই দেখে পিটার চেম্বারলিন এক বুদ্ধি বার করলেন। ভাবলেন, প্রসব-দ্বারে শিশুর মাথা যখন আটকে থাকে তখন তাকে সাঁড়াশি দিয়ে টেনে বার করলে কেমন হয়? এই ভেবে তিনি এক নতুন যন্ত্র তৈরী করলেন। তারই নাম ফরসেপস্।

কিন্তু এই যন্ত্রের কথা তিনি গোপন রাখলেন। প্রায় দুশো বছর ধরে এই যন্ত্রের ব্যবহার হল গোপনে; বিঘ্নিত প্রসবে। রটে গেল, চেম্বারলিনের পরিবারে এমন কিছু গুপ্ত অস্ত্র আছে যা দিয়ে যে-কোনো প্রসব অনায়াসে তাঁরা করিয়ে দিতে পারেন তা সে যতই কঠিন অথবা বিঘ্নিত হোক।

আশ্চর্য এই যে, নতুন এই যন্ত্র আবিষ্কারের কথা কেউ কিন্তু জানল না।

এই ফরসেপস্ চেম্বারলিনরা তিন পুরুষ ধরে পারিবারিক গুপ্তধনের মতো লুকিয়ে রাখলেন। প্রায় দুশো বছর ধরে গোপনে রেখে দরকারের সময় ব্যবহার করা শুধু তখনকার দিনেই সম্ভব ছিল। কারণ প্রসবে পুরুষ ধাত্রী ডাকার রেওয়াজ হলেও প্রসূতিরা পুরুষ দেখে লজ্জা পেতেন। তাই পুরুষ ধাত্রীরা চাদরের এক প্রান্ত নিজের গলায় এবং অন্য প্রান্ত প্রসূতির গলায়

পুরুষ ধাত্রীর সতের শতকে প্রসূতিকে সাহায্য

বেঁধে চাদরের নিচে হাত দিয়ে প্রসব করাতেন। কাজেই নিজের ব্যাগ থেকে ডাক্তার কি যন্ত্র বার করে কাজ করেন কেউ তা জানত না কিংবা দেখতেও কিছু পেত না।

এমনি করে এই গুপ্তধন অর্থাৎ ঐ ফরসেপস্ ছোট পিটারের ছেলের হাতে এল। তাঁর নামও পিটার। তিনি আবার এই ধন তাঁর ছেলের হাতে

তুলে দিলেন। এঁর নাম হিউ চেম্বারলিন (১৬৩০—১৭০৬)। এই হিউ চেম্বারলিন রানী অ্যানীর জন্মের সময় রাজমাতাকে প্রসব করান ১৬৯২ সালে।

হিউ চেম্বারলিন সগর্বে ঘোষণা করতেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং পূর্ব-পুরুষদের চেষ্টায় সমগ্র ইওরোপে শুধু তাঁদের বংশেই সন্তান প্রসবের এক সহজ উপায় আবিষ্কার হয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে এই আবিষ্কাব এখন তাঁর সম্পত্তি।

কিন্তু এই সময়ে ইংলণ্ডে প্রসবকালে পুরুষ ধাত্রী ডাকা নিয়ে আবার মতান্তর শুরু হল। হিউ নিজেও খুব জনপ্রিয় ছিলেন না। তার ওপর রাজনীতিতে যোগ দিয়ে আরও তিনি অপ্রিয় হয়ে উঠলেন। কাজেই একদিন ইংলণ্ড ছেড়ে হিউ অবশেষে প্যারিসে চলে গেলেন।

প্যারিসে তখন রাজা চতুর্দশ লুইএর রাজত্ব। এইখানে এসে হিউ নিজের ঐ গুপ্তধন বিক্রি করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, দশ হাজাব টাকায় এই আবিষ্কার তিনি বিক্রি করতে প্রস্তুত।

প্যারিসে তখন ফ্রাঁকো মরিশো সবচেয়ে বড় ধাত্রীবিদ্যা-বিশাবদ। তাঁর আগে প্রসূতিকে প্রসব-চেয়ারে বসিয়ে প্রসব করানো হত। এই রীতি ইওরোপে অতি সুপ্রাচীন। বিয়ের সময এই চেয়ার কনের বাড়ি থেকে যৌতুক দেওয়া হত। মরিশোঁ এই প্রথা বাতিল করে বিছানায় শুইয়ে প্রসব করার রীতি প্রবর্তন করলেন।

এই মরিশোঁর কাছে এসে হিউ চেম্বারলিন বডাই করে বললেন, যে-কোনো প্রসব, তা সে যতই কঠিন অথবা অসম্ভব হোক অনায়াসে তিনি কবাতে পারেন, মাত্র কয়েক মিনিটের চেষ্টায়, তাঁর ঐ গুপ্ত আবিষ্কারের সাহায্যে।

মরিশোঁ তক্ষুনি তাঁকে এক গর্ভবতী বামনেব কাছে নিয়ে গেলেন। রিকেট হয়ে প্রসূতির পেলভিসের হাড বাঁকা। হিউ চেম্বারলিন সগর্বে এগিয়ে গেলেন। খুশিতে আত্মবিশ্বাসে তাঁর চোখ মুখ জলজ্বলে হয়ে উঠল।

তিন ঘণ্টা পর যখন তিনি প্রসব-ঘর থেকে বেরুলেন বোঝা গেল তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্রসব করানো যায় নি। শুধু তাই নয়, এতক্ষণ এই চেষ্টার ফলে প্রসূতির দেহে যে আঘাত লেগেছে তাই থেকে তার মৃত্যু হয়েছে।

হিউ চেম্বারলিন অপদস্থ হয়ে আবার ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। ইংলণ্ডে তখন হাতুড়ে চিকিৎসার স্বর্ণময় যুগ। কিন্তু তবু হিউ কোনো সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। আবার তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। তার ফলে একদিন আবার তাঁকে ইংলণ্ড ছেড়ে পালাতে হল। ১৬৯৯ সালে।

এবার তিনি হল্যাণ্ডে এলেন। এইখানে এসে তাঁর গুপ্তধন বিক্রি হয়ে গেল। আমস্টারডামের মেডিকো ফারমাসিউটিক্যাল কলেজ এই আবিষ্কার কিনে নিল।

এই কলেজ থেকে লাইসেন্স না নিলে তখন হল্যাণ্ডে কেউ চিকিৎসা করতে পারত না। কাজেই লাইসেন্সের সঙ্গে মোটা টাকা ফী নিয়ে কলেজ হল্যাণ্ডের ডাক্তারদের কাছে এই গুপ্ত বিদ্যা বিক্রি করতে শুরু করল।

প্রসূতির কল্যাণকর এমনি এক আবিষ্কার নিয়ে এমন জঘন্য ব্যাবসা দেখে কয়েকজন উদার প্রকৃতির লোক এটা বন্ধ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। চাঁদা তুলে টাকা দিয়ে এই গুপ্ত বিদ্যা কলেজ থেকে কিনে নিয়ে তাঁরা খবরের কাগজে প্রকাশ করে দিলেন। তখন দেখা গেল, এই গুপ্ত বিদ্যার সবটাই ফাঁকি। প্রচুর টাকা নিয়ে হিউ চেম্বারলিন নিজে কিংবা ঐ কলেজ সাংঘাতিক প্রতারণা করেছেন।

ফরসেপস্ আসলে একটি সাঁড়াশি। শিশুর মাথা যাতে ধরা যায় তত বড় তার মুখ। কিন্তু দেখা গেল সমগ্র সাঁড়াশি না দিয়ে কলেজ মাত্র তার অর্ধেক অর্থাৎ একখানা ডাণ্ডা খুলে বিক্রি করেছে। এই দিয়ে শিশুর, প্রসূতির কিংবা তার পিতার মাথায় ডাণ্ডা মারা যেতে পারে কিন্তু প্রসবকালে শিশুর মাথা ধরে টান দিয়ে প্রসব কখনও করানো যায় না।

পরে হিউ চেম্বারলিনের ছেলে হিউ জুনিঅর যখন ডাক্তার হলেন তখন এই দু-শ বছরের গুপ্ত আবিষ্কার একদিন হঠাৎ প্রকাশ করে দিলেন ইংলণ্ডে। সেই থেকে এই ফরসেপস্ সর্বসাধারণের ব্যবহারে লেগে গেল।

কিন্তু দু-শ বছর ধরে এই আবিষ্কার গোপন রাখার জন্য এর কৃতিত্ব চিকিৎসক সমাজ চেম্বারলিনদের দিলেন না। বেলজিয়ামের এক ডাক্তার, জীন প্যালকিন, এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব পেলেন। তিনিই সর্বপ্রথম এই ফরসেপস্ প্যারিস অ্যাকাডেমিকে দান করেন; ১৭২১ সালে।

এত দীর্ঘকাল পরে ইওরোপে মাতৃজাতির দুঃখ এবং কষ্ট নিবারণের সত্যকার চেষ্টা শুরু হল। ষোলো. শতকে ফরাসী দেশে আঁবরোজ পারী

ভারসান অর্থাৎ পেটে সন্তান আড়াআড়িভাবে থাকলে তা ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু করেন। সতেরো এবং আঠারো শতকে ফরসেপস্ ব্যবহার শুরু হল। তারপর উনিশ শতকে অজ্ঞান করার পদ্ধতি এবং জীবাণু-শূন্য করার রীতি আবিষ্কার হওয়ায় সিজারিয়ান অপারেশন করা সম্ভব হল।

বর্তমান বিংশ শতাব্দীর যুগ মাতৃজাতির সবচেয়ে মঙ্গলময় এবং গৌরবময় যুগ। এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের সাহায্যে মাতৃজাতি এখন সন্তান ধারণ এবং প্রসবের সব বাধা অনায়াসে কাটাতে পারেন। সভ্যতার মানদণ্ড এই।

পৃথিবীতে কোন দেশ সবচেয়ে বেশী সভ্য ?

মাতৃজাতির প্রতি যে দেশ যত বেশী যত্ন নেয়, যত বেশী সম্মান করে সেই দেশ তত বেশী সভ্য।

এই সম্মান এই যত্ন কি দেখে বোঝা যায় ?

সন্তান ধারণ, প্রসবকালে, এবং প্রসবের পর যে দেশ মাতা এবং শিশুর প্রতি যতখানি যত্ন নেয় তাই দেখে।

এই মানদণ্ডে আমাদের দেশ কি ?

প্রসবকালে মাতা এবং সন্তানের মৃত্যু এখনও ভারতবর্ষে অন্য সব সভ্য দেশের চেয়ে অনেক অনেক বেশী।

মোহাবেশ

সতেরো শতকের ইওরোপ একদিকে যেমন বিজ্ঞানের যুগ, অপর দিকে তেমনি আবার ডাকিনী সন্দেহে স্ত্রী-পুরুষ-শিশুনির্বিশেষে নৃশংস হত্যালীলার তাণ্ডব যুগ।

তখনও ভেনিসের পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র। তার খ্যাতি আন্তর্জাতিক। মহামান্য পোপের অমোঘ শাসনের বাইরে বণিকদের এই প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্ররা আসত শিক্ষালাভের জন্য।

এইখানেই গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিষ্কার করে নতুন যুগের সৃষ্টি করেন ১৬০৯ সালে। পরে আবিষ্কার করেন সর্বপ্রথম তাপ এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

উইলিআম হার্ভেও তাই একদিন ইংলণ্ড থেকে এই পাদুয়াতে এলেন ফ্যাব্রিসিআসের কাছে অ্যানাটমি শিখতে ১৫৯৩ সালে। এই ফ্যাব্রিসিআস ভেসালিআসের শিষ্য ফ্যালোপিআসের ছাত্র। তখন ইংলণ্ডে রানী এলিজাবেথের রাজত্ব আর হার্ভের বয়েস মাত্র ষোলো বৎসর।

১৬০২ সালে হার্ভে পাদুয়া থেকে ডিগ্রি নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে এসে কেমব্রিজের এম. ডি. উপাধি পেলেন। সেই সময় শেক্সপীঅরের নতুন নাটক হ্যামলেট সবেমাত্র মঞ্চস্থ হয়েছে। এই নাটক সে সময় যে সাড়া জাগিয়েছিল হার্ভের লেখায় কিন্তু তার কোনো উল্লেখ নেই। তিনি তখন নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। শারীরতত্ত্ব অর্থাৎ ফিজিওলজির গবেষণায় তাঁর তগন মন। কাজেই হ্যামলেট নাটক হয়ত কখনও তিনি দেখেন নি। তিনি কলেজ অফ ফিজিসিআনের ফেলো নির্বাচিত হলেন ১৬০৭ সালে, তারপর হলেন সেণ্ট বার্থলোমিউ হাসপাতালের চিকিৎসক; এবং ১৬১৫ সালে হলেন লুমলিআন লেকচারার। তার ঠিক এক বৎসর পরেই শেক্সপীঅরের মৃত্যু হয় ১৬১৬ সালে। সেই সময় লুমলিআন লেকচারের একটি নোট থেকে জানা যায় হার্ভেই সর্বপ্রথম বুঝেছিলেন মানুষের দেহে রক্ত চক্রাকারে ঘোরে বুকের ভেতর হৃদ্‌যন্ত্রের ঢিবঢিবির জন্যে।

দীর্ঘ বারোটি বৎসর তিনি এ লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন নি। অবশেষে ১৬২৮ সালে এই লেখা প্রকাশিত হয় জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন-মাইন থেকে ল্যাটিন ভাষায়। এই পুস্তিকাটির সংক্ষিপ্ত নাম দি মটু কর্ডিস।

এই পুস্তিকাতে পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে তিনিই সর্বপ্রথম বর্ণনা করেন, হৃদ্‌যন্ত্র থেকে পরিস্রুত রক্ত ধমনী দিয়ে সারা দেহে প্রবাহিত হয়ে শিরা দিয়ে ফিরে আসে দূষিত হয়ে। এই দূষিত রক্ত আবার ফুসফুসে গিয়ে পরিস্রুত হয়ে হৃদযন্ত্রে আসে। এমনি করেই মানবদেহে রক্ত চক্রাকারে ঘোরে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

এই আবিষ্কার থেকেই বর্তমান যুগের শারীরতত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের দেহ যে বিচিত্র এক কর্মব্যস্ত যন্ত্র, এই ধারণা এসেছে।

কিন্তু এ কথা বড় বড় চিকিৎসকরা কেউ তখন মানেন নি। এই মতের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বেশী আন্দোলন করেছেন তাঁর ছাত্র জেমস্ প্রিমরোজ। বিদ্রূপ করে তাই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল, সারকুলেটর, ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ হাতুড়ে।

এই নিন্দা হার্ভে ঐ যুগে মুখ বুজে সহ্য করেছিলেন বলেই আজ তাঁর আরও বেশী সুনাম এবং সম্মান।

সতেরো শতকে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা দ্বিতীয় চার্লস যদিও নামে এর প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু কার্যত এই সোসাইটির সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ ছিল না কোনো দিন। তিনি না দিতেন কোনো অর্থ সাহায্য, না দিতেন কোনো উৎসাহ।

এই সোসাইটির সভ্য তখন রবার্ট বয়েল, রবার্ট হুক এবং স্যার আইজাক নিউটন। রবার্ট হুক সর্বপ্রথম কম্পাউণ্ড মাইক্রোসকোপ তৈরি করেন ১৬৬৫ সালে আর নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ প্রকাশিত হয় ১৬৮২ সালে।

এই রয়াল সোসাইটি ইওরোপের সর্বদেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পত্রালাপ করে নতুন নতুন আবিষ্কারের তথ্য সংগ্রহ করতেন। এই সব তথ্য এবং আলোচনা ফিলজফিক্যাল ট্রানজাকশনস নাম দিয়ে প্রকাশ করা হত।

১৬৮৩ সালের এমনি এক ট্রানজাকশনে দেখা যায়, ওলন্দাজ লিউ এন হুক জীবাণুর ছবি এঁকে পাঠিয়েছেন হল্যাণ্ড থেকে নিজের হাতে তৈরি মাইক্রোসকোপে জীবাণুর আকৃতি দেখে। জীবাণুর ছবি এর আগে আর কেউ কখনও আঁকে নি।

এই অ্যানটনি ভ্যান লিউ এন হুক নিজে ছিলেন অশিক্ষিত। মাতৃভাষা ওলন্দাজ ছাড়া অন্য কোন সভ্য ভাষা তিনি জানতেন না। বৎসরের পর বৎসর ধরে মদ তৈরির ব্যবসা করে তাঁদের পরিবার প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল। তাঁদের পরিবার অত বেশি প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী ছিল বলেই লিউ এন হুক সুদীর্ঘ উনচল্লিশ বছর ধরে ডেলফট শহরের সিটি হলের দ্বাররক্ষীর কাজে বহাল ছিলেন।

নিজের হাতে ঘষে ঘষে হাজার রকমারি লেনস তৈরি করা তাঁর একটা নেশা ছিল। এই লেনস দিয়ে মাইক্রোসকোপ তৈরি করে তিনি নিজের ঘবে বসে কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি দেখতে দেখতে একদিন বাগানের নোংরা জলে জীবন্ত কীটাণু আবিষ্কার করে ফেললেন। বুঝলেন এই পরিদৃশ্যমান জগতের বাইবেও অন্য এক অতি ক্ষুদ্র জীবজগৎ আছে।

লিউ এন হুক-এর রোখ চেপে গেল। তিনি লেনস ঘষে ঘষে উন্নততর মাইক্রোসকোপ তৈরি কবলেন যাতে ছোট জিনিস আরও বেশি বড় দেখা যায়।

কিন্তু এ-কাজ তিনি করতেন নির্জনে, নিজের ঘরে খিল দিয়ে বসে। কি উপায়ে যে এ-যন্ত্র তিনি তৈরি করতেন কাউকেই তা শেখাতেন না। তাঁর ঐ মাইক্রোসকোপে ভুলেও যদি কেউ একবার হাত দিত তাহলে তাকে তিনি ঘর থেকে বার করে দিতেন তক্ষুনি।

তাঁর এক বন্ধু ছিল, রেগনিআর দা গ্রাফ। তিনি তখন হল্যাণ্ডের নামী শারীরতত্ত্ববিদ। কুকুরের প্যাংক্রিয়াসের নল ফুটো করে তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন প্যাংক্রিয়াসের জারক রস না থাকলে খাদ্যবস্তু হজম হয় না। এ-ছাড়া স্ত্রীলোকের ওভারিতেও তিনি নতুন এক বস্তু আবিষ্কার করেন, আজও তার নাম গ্রাফিআন ফলিকল।

গ্রাফ ছিলেন লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সভ্য। ঐ সোসাইটির সঙ্গে নিয়মিত তিনি পত্রালাপ করতেন। একদিন লিউ এন হুক এই গ্রাফকে ডেকে এনে তাঁর নির্জন ঘরে মাইক্রোসকোপের নিচে এক ফোঁটা নোংরা জলে জীবন্ত সব কীটাণু দেখালেন।

গ্রাফ নিজে শারীরতত্ত্ববিদ। এতদিন নিজে তিনি যা-কিছু আবিষ্কার করেছেন সবই খালি চোখে অথবা ম্যাগনিফাইং গ্লাসে দেখে। কিন্তু মানুষের চোখের আড়ালে অদৃশ্য এবং প্রাণময় অতি ক্ষুদ্র কীটাণু বা জীবাণুরও যে

বিচিত্র এক জগৎ আছে তা আজ নিজের চোখে দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মনে হল, তাঁর নিজের আবিষ্কার নিতান্তই তুচ্ছ মূর্খ অশিক্ষিত লিউ এন হুকের অভাবনীয় এই আবিষ্কারের কাছে। কাজেই তিনি চিঠি লিখলেন রয়াল সোসাইটির কাছে, লিউ এন হুকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

সেই থেকে রয়াল সোসাইটি লিউ এন হুককে পেলেন। উভয়ের মধ্যে পত্রালাপ চলল, দীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর ধরে। লিউ এন হুক মাতৃভাষায় লিখে বন্ধুদের দিয়ে ল্যাটিনে তর্জমা করে সেই চিঠি রয়াল সোসাইটিকে পাঠাতেন।

একবার তিনি লিখলেন, তিন সপ্তাহ ধরে জলে ভেজানো সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়োর একটিমাত্র ফোঁটায় তিনি লক্ষ লক্ষ জীবন্ত কীটাণু দেখেছেন তাঁর নতুন তৈরি একটি মাইক্রোসকোপে।

রয়াল সোসাইটি তখন তাঁর মাইক্রোসকোপ তৈরি করার পদ্ধতিটি জানতে চাইলেন। উত্তরে লিউ এন হুক জানালেন, মাইক্রোসকোপ কিভাবে তিনি তৈরি করেন সেটা জানানো সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি যা দেখেছেন তা সত্য। সবাইকে তা দেখাতেও তিনি প্রস্তুত সব সময়ে। ডেলফট শহরের বহু মানী জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিনি এ-জিনিস দেখিয়েছেন।

তখন রয়াল সোসাইটি নিহেমিয়া গ্রু এবং রবার্ট হুকের প্রতি নতুন শক্তিশালী একটি মাইক্রোসকোপ তৈরির নির্দেশ দিলেন। রবার্ট হুক তাই নতুন একটি জোরালো মাইক্রোসকোপ তৈরি করে গোল মরিচের গুঁড়ো তিন সপ্তাহ জলে ভিজিয়ে তার একফোঁটা রয়াল সোসাইটির সভ্যদের দেখালেন, ১৫ই নভেম্বর ১৬৭৭ সালে। দেখা গেল লিউ এন হুকের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। একফোঁটা ঐ জলে সত্যি লাখো লাখো অতি ক্ষুদ্র জীবন্ত কীটাণু।

লিউ এন হুককে রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত করা হল। সোসাইটির অন্যতম সভ্য ডাক্তার মলিনিউকে পাঠানো হল লিউ এন হুকের কাছে। তিনি অশিক্ষিত দ্বাররক্ষী এই ওলন্দাজ লোকটির নিজে হাতে গড়া এত বিভিন্ন শক্তিশালী সব লেনস এবং মাইক্রোসকোপ দেখে তাজ্জব বনে গেলেন। এত ভালো যন্ত্র ইংলণ্ডের পণ্ডিতরাও কেউ মাথা খাটিয়ে তৈরি করতে পারেন নি তখনও। কাজেই তিনি একটি মাইক্রোসকোপের জন্য

অনেক সাধ্যসাধনা এবং অনুনয়-বিনয় করলেন। অনেক অর্থ দিয়ে একটিমাত্র যন্ত্র কিনতে চাইলেন।

কিন্তু লিউ এন হুক একরোখা লোক। টাকার জন্যে এ-সব তিনি করেন নি। তাই তিনি বললেন, আমার জীবদ্দশায় এর একটিও আমি দিতে পারব না কাউকে। প্রচুর অর্থের বিনিময়েও না। সবচেয়ে ভালো যন্ত্রটি যে আজ আমি দেখাতে পারলাম না আপনাদের, সেই আমার দুঃখ। কারণ সেটি কাউকেই আমি দেখাই না; এমন কি আমার নিজের পরিবারবর্গকেও না। ওটি থাকে আমার গুপ্ত ঘরে এবং সেই যন্ত্র দিয়েই এ-সব জিনিস আরও বেশি পরিষ্কার দেখা যায়। আরও বড় দেখা যায়।

কাজেই রয়াল সোসাইটির প্রতিনিধিকে ফিরে আসতে হল খালি হাতে, কিন্তু অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা নিয়ে। লিউ এন হুক অশিক্ষিত কিন্তু খাঁটি লোক। অর্থের লোভ তাঁর নেই। নিজের যন্ত্রে তিনি যা দেখেন তাই বর্ণনা করে লেখেন রয়াল সোসাইটির কাছে। কেন এমন হয় তা নিয়ে তাঁর কোনো উদ্বেগ নেই। ভগবানের রাজ্যে এমন সব বিচিত্র জীবও যে আছে তা জেনেই তিনি খুশী।

এই লিউ এন হুকই সর্বপ্রথম শুক্রকীট দেখেন নিজের তৈরি মাইক্রোসকোপে।

ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটি এমনি করেই ইওরোপের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেরা বিজ্ঞানচর্চা করেছে। তবু নিজেরা রাজরোষ থেকে রেহাই পায় নি। তাই রাজা দ্বিতীয় চার্লসের আগে এই সমিতি ছিল গুপ্ত। পরে সতেরো শতকে যখন এই সোসাইটি স্থাপিত হল তার পরেও কোনও এক সভ্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে, বিদেশীদের সঙ্গে পত্রালাপ করার জন্যে বিশ্বাসঘাতক কাজের সন্দেহে। মাস কয়েক পরে যখন বোঝা গেল এই সব পত্রে দোষের কিছুই নেই তখনই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

ঐ যুগে যদিও বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে অনেক কিন্তু ডাকিনী-বিদ্যা নির্মূল করবার নামে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং হত্যালীলা হয়েছে সারা ইওরোপে, এমন আর কখনও কোথাও হয় নি এই পৃথিবীতে।

সন্তান এসে নালিশ করেছে মা তার ডাকিনী, অমনি মাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। স্বামী স্ত্রীর নামে, স্ত্রী স্বামীর নামে অথবা ভাই ভাই-এর

নামে যে যখন যা কিছু অভিযোগ এনেছে তখনই তা বিশ্বাস করে তাকে হত্যা করা হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করে।

ডাকিনী সন্দেহে স্ত্রী-পুরুষ-শিশুনির্বিশেষে হাঁটুগেড়ে বসানো হয়েছে সারি সারি পোতা পেরেকের ওপর। সাঁড়াশি দিয়ে টেনে মাংস থেকে ছিঁড়ে আনা হয়েছে হাত-পায়ের নখ। জ্বলন্ত মোমবাতির শিখা ধরা হয়েছে হাতে গায়ে মুখে সর্বাঙ্গে। লাগানো হয়েছে দেহে তপ্ত লোহার শলা। হাত পা টেনে দেহ-সন্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ডান হাতের বুড়ো আঙুল বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে বেঁধে স্ত্রীলোকদের ফেলে দেওয়া হয়েছে জলে; তবু যদি তারা ভেসে ওঠে তাহলেই নাকি বোঝা যাবে তারা নির্দোষ। হাত পায়ের হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না মজ্জা আসে বেরিয়ে।

এমনি করেই বিচারকরা স্বীকৃতি আদায় করেছেন অভিযুক্তদের কাছ থেকে। তারপর দোষী যখন নিজের দোষ স্বীকার করত বাধ্য হয়ে, তখন তার শাস্তি হত মৃত্যু—আগুনে পুড়িয়ে। বিচারক এবং অনুসন্ধানীদের লিখিত বিবরণী থেকে জানা যায় ভগবানের নামে এই কাজ কি আনন্দে তখন তাঁরা সম্পন্ন করতেন সুচারুভাবে। ডাকিনী-নিধন এই নিষ্ঠুর যজ্ঞ থেকেই আমরা মুখোস-খোলা মানব-প্রকৃতি বুঝতে পারি নিতান্ত নির্মমভাবে।

রানী এলিজাবেথের সময় থেকে শুরু করে তাঁর পরবর্তী রাজাদের আমলেও এই ডাকিনী-নিধন হয়েছে সতেরো শতকের ইংলণ্ডে। ফরাসী দেশ ও ইতালিতেও যথেষ্ট হয়েছে এই ডাকিনী-নিধন। কিন্তু জার্মানিতে যা হয়েছে তার আর তুলনা নেই পৃথিবীতে।

এমনি করেই পার হয়েছে শেকস্‌পীঅর মিলটন সারভেনটিস ও মলিআঁরের যুগ। সতেরো শতক এমনি করেই পার হয়েছে ইওরোপে গ্যালিলিও, নিউটন, স্পিনোজা, রেমব্রাণ্ট ও রুবেন্‌সের কীর্তি রেখে। সেই সঙ্গে রেখে গেছে ডাকিনী-নিধনের এই কলঙ্ক।

তারপর শুরু হল আঠারো শতক।

এই শতক ইওরোপে এল ভিন্ন একটি রূপ নিয়ে। আগের যুগের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার বদলে এখন এল চিকিৎসা বিদ্যায় থিওরির যুগ।

জার্মানি হঠাৎ একটি থিওরি আবিষ্কার করত, আর ফরাসী দেশ করত তার লালন-পালন।

এমনি এক থিওরি বেরুল, ডকট্রিন অফ ইনফারক্টাস। হামবুর্গের

জোআন ক্যাম্ফ একদিন দেখলেন, কোষ্ঠবদ্ধ হলে দেহে অস্বস্তি হয়। অমনি তাঁর ধারণা হল, সব রোগেরই উৎপত্তি এই কোষ্ঠকাঠিন্যে।

থিওরি যেমন সহজ তার চিকিৎসাও তেমনি সরল। রোগ থেকে বাঁচতে চাও তো কোষ্ঠ পরিষ্কার কর। এনিমা নাও। ঘরে ঘরে এনিমা সিরিঞ্জ চালু হল, বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে। সেই সময়কার এক ব্যঙ্গ কার্টুনে দেখা যায়, একটি বাচ্ছা ছেলে বেশী খেয়ে ফেলেছে বলে ভলটেয়ার নিজেই তাকে এনিমা দিচ্ছেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখে।

জন ব্রাউনের থিওরি ছিল ভিন্ন। তাঁর মতে রোগ হয় শরীর উত্তেজিত হয়ে অথবা নিস্তেজ হয়ে। অতএব এর চিকিৎসাও খুব সোজা। দেহ উত্তেজিত হলে আফিং খাইয়ে নিস্তেজ কর, আর স্তিমিত হলে খাওয়াও তাকে মদ। এই থিওরি প্রমাণ করবার জন্য ব্রাউন পর পর পাঁচ-গ্লাস মদ দর্শকদের সামনে খেয়ে দেখাতেন ঢক-ঢক করে। অবশ্য অতি অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয় অপরিমিত এই মদ আর আফিং খেয়ে।

অথচ এই থিওরি পঁচিশটি বৎসর ইওরোপের কাঁধে চেপে রইল। ঘরে ঘরে লোকে এই মদ আর আফিং খেতে লাগল আরোগ্যলাভের আশায়। ঐতিহাসিক বাআস্ বলেছেন, ফরাসী বিপ্লব বা নেপোলিঅনের যুদ্ধ একত্র করে যত লোকক্ষয় হয়েছে ইওরোপে, এই থিওরীর জন্য হয়েছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী।

আঠারো শতকে জার্মানির অবস্থা এই রকমই ছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান তখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার কঠিন ভিত্তিতে স্থাপিত হয়নি সেখানে। একটার পর একটা এই রকম আজগুবি থিওরি নিয়ে জার্মান বিজ্ঞজন তখন মত্ত। নেপোলিঅনের আক্রমনের পর থেকে সমগ্র জার্মান জাতি তখনও বীর্জহীন এবং ম্রিয়মান। দেহে মনে ক্ষত-বিক্ষত এবং শক্তিহীন। এই সব থিওরী জার্মানির নিদারুণ সেই দুঃসময়েই উদ্ভূত।

সেই সময়কার সব থিওরির মধ্যে সব চেয়ে বেশী যা জনপ্রিয় এবং আজও যা টিকে আছে তার নাম হোমিওপ্যাথি। হোমিওপ্যাথির নাম জানে না এমন লোক একটিও বোধহয় এ দেশে নেই।

হোমিওপ্যাথির প্রবর্তক স্যামুএল ক্রিস্‌চিআন ফ্রেডরিক হ্যানিম্যান ১৭৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন, জার্মানির মিসেন গ্রামে। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি চিকিৎসা-বিদ্যার ডিগ্রি নেন আরলেনগেনে ১৭৭৯ সালে। আঠারো

শতকের শেষের দিকে কিছু রুগীর ওপর এবং কিছু নিজের দেহে পরীক্ষা করে তিনি এই চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। হোমিওপ্যাথির বৈশিষ্ট্য তিনটি।

প্রথম বৈশিষ্ট্য অবিশ্যি নতুন নয়। ষোলো শতকে পারসেলিআস যে 'ডকটিন অফ সিগনেচারস' প্রবর্তন করেন হ্যানিম্যানের 'সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরনেটার' ঐ মতেরই পুনরুজ্জীবন। এই মতে রোগ অথবা রোগের উপসর্গ শুধু সেই সব ভেষজ দিয়েই সারে সুস্থ দেহে যা খেলে রোগের ঐ লক্ষণ দেখা দেয়।

যেমন সুস্থ দেহে ক্যাস্টর অয়েল খেলে দাস্ত হয়, আবার আমাশা রোগের দাস্ত ক্যাস্টর অয়েলে সারে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ভেষজের মাত্রা হ্রাস। ভেষজের মাত্রা যত কম হবে রোগ সারার পক্ষে তার শক্তি তত বেশী বেড়ে যাবে। ভেষজের পরিমাণ কম থেকে কম করে যত বেশী লঘু করা হবে তার শক্তিও সেই পরিমাণে বাড়বে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, দেহের পুরনো ব্যধি অর্থাৎ ক্রনিক রোগ সৃষ্টি হয় দেহের কোনো চুলকানি (Psora) সাপপ্রেসড বা দমিত হয়ে।

এই তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত নতুন চিকিৎসাবিধি হ্যানিম্যান তাঁর বিখ্যাত অরগানন্ ডার র‍্যাশিওনেলেন হাইলকুন্দে পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ১৮১০ সালে। চিকিৎসার এই পদ্ধতি অনেক দেশে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে এবং এখনও চলছে আমাদের ঘরে ঘরে।

হোমিওপ্যাথির এত বেশী জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ বোধ হয় সে যুগে ভেষজের এত কম ব্যবহার। প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসায় ভেষজের এত কম মাত্রা হ্যানিম্যানই সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন। জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, বলতে গেলে কোটিপতি হয়ে হ্যানিম্যান প্যারিসে দেহরক্ষা করেন, ১৮৪৩ সালে।

ফ্রানজ জোসেফ গলের (১৭৫৭—১৮২৮) থিওরি, ফ্রেনোলজি। মানুষের বুদ্ধি, যৌনশক্তি, নীতিবোধ সবই এতে বোঝা যায় মাথার খুলির ওপর স্ফীতি দেখে। যার যে প্রবৃত্তি প্রবল তার মাথার সেই স্থানে উঁচু ঢিপি হয়।

এই থিওরির জন্য গলকে ভিয়েনা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। প্যারিসে এসে তিনিও বহু অর্থ উপার্জন করে একদিন দেহত্যাগ করেন।

সতেরো শতকের জার্মান পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ফুলদার ধর্মযাজক আথানাসিআস কারচার। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে রোগীর পুঁজ ইত্যাদি দেখে তিনিই সর্বপ্রথম জীবাণু বা কীটাণুর রোগ সংক্রমণ সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। চুম্বক শক্তি মানুষের দেহে প্রয়োগ করে যে কোনো কোনো রোগ সারানো যায় তাও তিনি দেখেছেন ১৬৪৩ সালে। সম্মোহনের প্রভাবে জীবদেহ যে আচ্ছন্ন করে রাখা সম্ভব তাও তিনি লিখে গেছেন ১৬৮০ সালে।

আঠারো শতকের জার্মানিতে কারচারের এই চুম্বক-তত্ত্ব আবার যিনি নতুন করে ঝালিয়ে তুললেন তাঁর নাম ফ্রানজ অ্যানটন মেসমার (১৭৩৪—১৮১৫)।

সুইজারল্যাণ্ডের ইজন্যাঙে মেসমার জন্মগ্রহণ করেন ১৭৩৪ সালে। ভিয়েনায় তিনি আসেন ডাক্তারি পড়তে ভ্যান সোআইটেনের কাছে। চিকিৎসক হিসাবে ভ্যান সোআইটেনের তখন খুব সুনাম।

ভ্যান সোআইটেন আগে ছিলেন হল্যাণ্ডে। পাদুয়ার পর ইওরোপে হল্যাণ্ডেই ছিল চিকিৎসার পীঠস্থান। আর ভ্যান সোআইটেন ছিলেন সেখানকার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। অষ্ট্রিয়ার রানী মেরিয়া টেরেজা যখন তাঁকে ভিয়েনায় নিয়ে এলেন তখন থেকেই ভিয়েনায় নতুন চিকিৎসা-বিজ্ঞান গড়ে উঠল।

রানী টেরেজার কোনো সন্তানাদি ছিল না। তাঁর স্বামীকে এই ভ্যান সোআইটেন একদিন কানে কানে কি বুদ্ধি যে দিলেন, দেখা গেল, রানীর পর পর ষোলোটি সন্তান হল। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় ভ্যান সোআইটেন কি রকম বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন।

কিন্তু তাঁর পরবর্তী চিকিৎসক অ্যাণ্টন-দা-হায়েন যদিও জ্বর দেখার থার্মমিটারের প্রবর্তক তবু তিনিই ছিলেন চিকিৎসায় দৈব, ম্যাজিক এবং ডাকিনী বিদ্যায় বিশ্বাসী।

মেসমার ডাক্তারি শিক্ষা করেন প্রথমে ভ্যান সোআইটেনের কাছে, পরে এই অ্যাণ্টন-দা-হাঅনের কাছে।

অ্যাণ্টন-দা-হাঅনের দৈব এবং ম্যাজিকে অদ্ভুত এই বিশ্বাসের জন্যই মেসমার চিকিৎসায় অলৌকিক শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তাঁর স্নাতকের বিষয় নির্বাচন করলেন, আরোগ্যের ওপর গ্রহের প্রভাব (দা প্লানেটরাম ইন্‌ফ্লাকসা) ১৭৬৬ সালে।

তারপর চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি দেখে মেসমারের মনে এক অদ্ভুত বিশ্বাস হল। তিনি ভাবলেন, মানুষের পক্ষেও এই চুম্বকের মতো আকর্ষণী শক্তি অর্জন করা সম্ভব, নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে। এই শক্তির দ্বারা চালিত করে মানুষ যে-কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করতে পারে, বশীভূত করতে পারে।

এই থেকে তাঁর থিওরি বেরুল, সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা পৃথিবীর জীবদের ওপর সর্বদা প্রভাব বিস্তার করে। চুম্বক প্রস্তরের (লোড স্টোন) মতো এই

অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম

আকর্ষণ অতি সূক্ষ্ম তরল অদৃশ্য একটি বস্তু, যার নাম জৈবিক চুম্বক (অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম)।

মেসমার চিকিৎসা-বিদ্যার এক জ্যোতিষী হয়ে পড়লেন। অশেষ ক্ষমতাশালী বিরাট এক মহাপুরুষ বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন। সগর্বে বলতে লাগলেন, ইচ্ছে করলে পৃথিবীর যে কোন বস্তুকে তিনি চুম্বকের শক্তি প্রদান করতে সক্ষম। এই শক্তি প্রয়োগ করে একটি গাছকেও তিনি চুম্বকীকৃত (ম্যাগনেটাইজড্) করতে পারেন। তখন গাছের পাতায় পাতায় এই চুম্বক শক্তি ছড়িয়ে পড়বে, প্রতিটি পাতা রোগ বিনষ্ট করবার শক্তি অর্জন করবে। এই গাছের কাছে যে যাবে তারই দেহ রোগ-মুক্ত হবে।

নতুন এই মতবাদের নাম হল মেসমেরিজম। নিজের হাতের চুম্বক-শক্তির

প্রভাবে রুগীকে মোহাবিষ্ট করে রোগ মুক্ত করবার জন্য মেসমার ভিয়েনাতে এক আরোগ্য নিকেতন খুললেন।

ভিয়েনায় হুলস্থুল পড়ে গেল। নতুন এই চিকিৎসায় রোগমুক্ত হতে দলে দলে লোক আরোগ্য নিকেতনে আসতে লাগল।

কিন্তু বেশী দিন এ ব্যাবসা চলল না। একা ঘরে মেসমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তরুণীদের সম্মোহিত করেন, এই নিয়ে অনেক কথা উঠল। শেষে রানী মেরিয়া টেরেজা এক অনুসন্ধানী কমিশন বসালেন। ফলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মেসমারকে ভিয়েনা পরিত্যাগ করতে হল।

ভিয়েনা ছেড়ে মেসমার ফ্রান্সে এলেন। ১৭৭৮ সালে। স্পাআতে কিছুদিন চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিনি প্যারিসে এলেন। এখানে এসেই মেসমার দাঁড়াবার মতো ভাল একটি স্থান পেয়ে গেলেন। এই সম্মোহন-বিদ্যা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। অল্প সময়ের মধ্যেই মেসমার অনেক অর্থ উপার্জন করে ফেললেন।

প্যারিসে তিনি স্বাস্থ্য-দেবতার বিরাট এক মন্দির করে ফেললেন। স্বাস্থ্যলুব্ধ পুরুষ ও নারীরা দলে দলে এই মন্দিরে আসতে লাগল।

এই মন্দিরে প্রবেশ করে রোগীরা নীরব নিঃশব্দ পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে হলে ঢুকত। হাওয়া লেগে সঙ্গীতযন্ত্রের ঝমঝম আওয়াজ দূর থেকে ভেসে আসত। জানালার ফাঁকে ফাঁকে আলো এসে আয়না দিয়ে ঢাকা দেয়ালে প্রতিফলিত হত। বারান্দা থেকে প্রস্ফুটিত পুষ্পের মৃদু সুবাস হাওয়ার সঙ্গে ঘরে ঢুকত। চিমনির কাছে পুষ্পাধার এবং ধূপদান থেকে উগ্র সুবাস রোগিণীদের মনে মাদকতা আনত।

রোগীরা চুম্বকীকৃত এক গামলার চার পাশে বসে এই গামলা হাত বাড়িয়ে ধরে অপেক্ষা করতেন। রোগীদের মধ্যে বেশীর ভাগই রমণী। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য একজন করে কন্দর্পকান্তি যুবক থাকত। এঁরা সব মেসমারের সহকারী। এই যুবকরা একে একে এগিয়ে এসে এক একটি রোগিণী বেছে নিত। চোখে চোখ রেখে অপলক দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে থাকত। কোনো কথা বলত না।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে যন্ত্র-সঙ্গীতের মৃদু ঝংকার শোনা যেত। নারী-কণ্ঠের মিষ্টি স্বর-সঙ্গীতের মূর্ছনার সঙ্গে ভেসে আসত।

এই সব কন্দর্পরা পাশে বসে রোগিণীদের হাঁটু জড়িয়ে ধরত। হাত

দিয়ে দেহের নানা স্থানে ধীরে ধীরে সংবাহন করত। আবেশে রোগিণীদের চোখ বুজে আসত। চুম্বকের জাগ্রত শক্তি নিজের দেহে তাঁরা অনুভব করতেন।

সঙিন মুহূর্তে সম্মোহনের গুরু মেসমার নিজে কক্ষে প্রবেশ করতেন। মেসমারের অঙ্গে লাল জমকালো পোশাক। সগর্বে মাথা উঁচু করে রাজকীয় পদক্ষেপে ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে আসতেন, হারমোনিয়ামের তালে তালে পা ফেলে। তারপর রোগিণীদের সামনে এসে দাঁড়াতেন। একে একে রোগিণীদের চোখে চোখ রাখতেন; পরে হাত বাড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধ কাঠি দিয়ে রোগিণীদের একে একে স্পর্শ করতেন। সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক ঘটনা ঘটে যেত। রোগিণীদের পূর্ণ মোহাবেশ (ক্রাইসিস্) হত।

কোনো মহিলার এই পূর্ণ মোহাবেশ হলে মেসমার নিজে তাঁকে তুলে তাঁর অন্দরের গোপন একটি মোহাবেশ কক্ষে (ক্রাইসিস চেম্বারে) নিয়ে যেতেন।

এই সব অনুষ্ঠানে পুরুষদেরও ভিড় হত। কিন্তু তাঁরা আসতেন মেয়েদের দেখতে। সম্মোহিত হয়ে, মোহাবিষ্ট হয়ে, বিবশা হয়ে মেয়েরা কি করে তাই দেখতে। এই পূর্ণ মোহাবিষ্ট হওয়া নিশ্চয়ই খুব মধুর এবং সুখের। কারণ দেখা যেত একবার এই ক্রাইসিস হলে, আর একবার এই ক্রাইসিসের জন্য রোগিণীরা ব্যস্ত হতেন, বায়না ধরতেন।

তাই মেস্‌মেরিজম প্যারিসে সাংঘাতিক একটা হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল। এই চুম্বক চিকিৎসার ঠেলায় অন্য সব চিকিৎসা বরবাদ হয়ে গেল। এই চিকিৎসা নেওয়ার জন্য ঘরে ঘরে সবাই ছটফট করতে লাগল।

মেসমার ঘোষণা করলেন, এই পদ্ধতিতে চিকিৎসক প্রতিটি রোগীর অসুখ নিমেষে বুঝতে সক্ষম হন। রোগটা কি এবং দেহের গুপ্ত কোন অংশে অবস্থিত তাও সহসা পরিস্ফুট হয় চিকিৎসকের কাছে। অতএব চিকিৎসা-বিদ্যার চরম উন্নতি একমাত্র এই পদ্ধতিতেই সম্ভব।

তখন মনে হত সমগ্র পৃথিবীটাই বুঝি একমাত্র মেসমারের হাতে; মন্ত্রমুগ্ধ হওয়ার জন্য অপেক্ষমান।

ফরাসী গভর্নমেণ্ট মেসমারের এই সুগভীর জ্ঞানের গুপ্ত রহস্যটি প্রকাশ করবার জন্য বার বার অনুরোধ করলেন। বললেন, মেসমারকে সারা জীবন মোটা টাকার পেনসন দিতে গভর্নমেণ্ট প্রস্তুত। তা ছাড়া জাতির সর্বোচ্চ সম্মান ক্রশ অফ দি অর্ডার অফ সেণ্ট মাইকেলও তাঁকে দেওয়া হবে।

কিন্তু মেসমার এ সম্মান প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ এমনিতেই বিপুল অর্থ তাঁর উপার্জন হচ্ছে। তা ছাড়া এই গুপ্ত জ্ঞান প্রকাশ করা যায় না কিছুতেই। কি করে তিনি প্রকাশ করবেন, চিকিৎসার নামে যৌন উত্তেজনায় ধনী মহিলাদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ বার করা যায়।

মেসমারের প্রধান শিষ্য ছিলেন, ডাঃ দ' এলসন। ইনি প্যারিস ফ্যাকালটির একজন নামকরা মেম্বার এবং কমতে দ' আরতএঁর একজন চিকিৎসক। একদিন পুলিসের এক বড়কর্তা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

বললেন, পুলিসের লেফন্যাণ্ট জেনারেল হিসেবে আমি জানতে চাই, যখন এই চুম্বক-শক্তি কোনো স্ত্রীলোককে প্রয়োগ করা হয় এবং সে পূর্ণ-মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে তখন সেই ক্রাইসিসের সময় তার ধর্ম নষ্ট করা কি খুব সহজ নয়?

উত্তরে ডাঃ দ' এলসন বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু এই পূর্ণ-মোহাবিষ্ট করার ভার একমাত্র মেসমারের। তিনি নিজে অথবা তাঁর বিশ্বস্ত এবং সুযোগ্য

মোহাবেশ

কোনো সহকারীই শুধু এই ক্রাইসিস ঘটাতে সক্ষম। নির্ভরযোগ্য দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া এই কঠিন কাজের অধিকার আর কারু নেই।

পুলিসের কর্তাটি ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দাখিল করলেন। অবশেষে ফরাসী গভর্নমেণ্টও একদিন ভিয়েনার মতো আবার একটি অনুসন্ধানী কমিশন বসালেন।

এই কমিশনে আঠারো শতকের নাম-করা বড় বড় বিজ্ঞানীরা সব সভ্য ছিলেন। এই কমিশনের রিপোর্টে সর্বপ্রথম যিনি স্বাক্ষর করেন তিনি

ইলেকট্রিসিটির আবিষ্কারক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। সর্বশেষে স্বাক্ষর করেন অক্সিজেনের আবিষ্কারক, লাভোএসিঁএ।

এই বিজ্ঞানীরা সবাই একমত হয়ে বলেন, এই চুম্বক-চিকিৎসার যা-কিছু ফল সবই কল্পনাপ্রসূত। এঁরা যে গোপন রিপোর্ট প্রস্তুত করেন, নিচে তা থেকে কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল।

...দেখা গেছে, স্ত্রীজাতি বীণার তারের মতো অনেকটা একই সুরে বাঁধা। একটি তারে ঘা পড়লে একসঙ্গে সব তারেই ঝংকার ওঠে। তাই কমিশনের সভ্যরা বার বার লক্ষ্য করেছেন যে একটি রমণীর পূর্ণ-মোহাবিষ্ট অবস্থা হলে, অর্থাৎ ক্রাইসিস হলে সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেরও ক্রাইসিস হয়।

রমণীরা সর্বদাই পুরুষের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, চুম্বকত্বপ্রাপ্ত হয়। এখানে নিঃসন্দেহে বলা যায়, উভয়ের সম্পর্ক শুধু রোগিণী এবং চিকিৎসক। কিন্তু চিকিৎসক নিজে পুরুষ। অসুখ যাই কেন না থাক উভয়ের এই স্ত্রী ও পুরুষ সম্পর্ক তাতে কিছুই ঘোচে না। পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণও কিছুমাত্র কমে না। ব্যাধি এই আকর্ষণ স্তিমিত করতে পাবে, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট কখনও করে না।

যে সব রমণী এই চিকিৎসা নিতে আসেন তাঁদের বেশির ভাগই সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত কেউ নন। এঁরা আসেন নিজেদের সময় কাটাতে, একটু মজা বা একটু আমোদ-প্রমোদ করতে। বাকিরা সামান্য কিছু অসুস্থ হলেও তাঁদের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা অথবা মোহিনী-শক্তি তাতে কিছুমাত্র কমে না। যৌবনের যাবতীয় সূক্ষ্ম অনুভূতি ঠিক তেমনি তীব্র থাকে। তাঁদের দেহ-সৌষ্ঠব চিকিৎসককে বিমুগ্ধ করে। রোগিণীদের স্বাস্থ্য এবং দেহের শক্তি এত বেশি অটুট যে তাঁরা নিজেরাও চিকিৎসকের দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারেন। কাজেই বিপদ দ্বিমুখী; উভয়ের।

চিকিৎসক সাধারণতঃ রোগিণীর হাঁটু দুটি নিজের হাঁটু দিয়ে জড়িয়ে রাখেন। কাজেই হাঁটু থেকে শরীরের নিম্নাংশ উভয়ের সংলগ্ন হয়। অতঃপর চিকিৎসক বাঁ হাত দিয়ে রোগিণীর পেটের ওপর মৃদু চাপ দেন। ডান হাত রোগিণীর পিঠে এবং বাহুমূলে এনে হেলান দিয়ে বসেন।

ফলে দুটি দেহ পরস্পর-সংলগ্ন হয়। মুখের কাছে মুখ আসে। নিশ্বাসের সঙ্গে নিশ্বাস মেশে। দুটি দেহে একই আবেগের সৃষ্টি হয়। পুরুষ এবং রমণীর পরস্পর আকর্ষণের সমুদয় অনুভূতির তীব্র জাগরণ হয়। দেহ আবেগে

উদ্দীপ্ত হয; কম্পিত হয়। কল্পনা প্রখর হয়ে দেহ-যন্ত্রের বিকল ঘটায়। বুদ্ধি মোহাবিষ্ট কবে। চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়।

এ অবস্থায় রোগিণীরা নিজেদের অনুভূতি আব সংযত রাখতে পারেন না। নিজেদের এই অবস্থার কোনো জ্ঞান, কোনো দায়িত্ব তাঁদের আর থাকে না।···

অতএব কমিশনের সভ্যরা সবাই একমত যে মেসমেরিজমের যাবতীয় ফল পুরুষ এবং বমণীর পরস্পর স্পর্শজনিত কল্পনার স্বাভাবিক পরিণতি থেকে লব্ধ। স্পর্শ ও কল্পনার এই ফল মঁসিও মেসমাবেব হাতে যা, তাঁর সুযোগ্য শিষ্য এবং সহকারী মঁসিও দ' এলসনের হাতেও তাই।

কাজেই কমিশন নিঃসন্দেহে বলতে পারেন, মঁসিও মেসমারের চুম্বকীকরণের গুপ্ত রহস্য যাই কেন না থাক, মঁসিও দ'এলসনের থেকে প্রকৃতপক্ষে কোনো তফাত তাতে নেই। একজনের পদ্ধতিতে আর একজনের চেয়ে বেশি কিছু বস্তু নেই। কাজেই একজনের পদ্ধতি আর একজনের চেয়ে কোনো অংশে বেশি প্রয়োজনীয় অথবা কম বিপজ্জনক নয়।

এই রিপোর্টের পর ফরাসী গভর্নমেণ্ট মেসমারের স্বাস্থ্যমন্দির বন্ধ করে দিলেন। ভিয়েনার মতো প্যারিসেও মেসমারের ব্যাবসা গোটাতে হল, ১৭৭৮ সালে। মেসমেরিজম সম্বন্ধে তাঁর বই প্রকাশিত হয় ১৭৭৯ সালে।

ফরাসী বিপ্লবের পর মেসমেরিজম ইওরোপ থেকে উঠে গেল। বিজ্ঞানীরা এ পদ্ধতি বর্জন করলেন। কিন্তু হাতুড়েরা তা লুফে নিল। হাতুড়ে চিকিৎসার নতুন আর একটি অস্ত্র বাড়ল।

বিফলে মূল্য ফেরত

আঠারো শতকের ইংলণ্ড স্রেফ হাতুড়ে চিকিৎসার যুগ, চিকিৎসার ধাপ্পাবাজির স্বর্ণময় যুগ। ঐ যুগে জার্মানি অথবা ফ্রান্সের মতো ইংলণ্ডে চিকিৎসায় কোনো থিওরির কিছু দরকার হত না। যার যেমন ইচ্ছা তেমনি এক ওষুধ বাজারে ছাড়তে পারতেন এবং লোক ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারতেন।

লণ্ডনে এক দর্জি ছিলেন, তাঁর নাম উইলিআম রীড। তাঁর হঠাৎ একদিন ডাক্তার হবার শখ হল। শুধুই ডাক্তার নয়, একেবারে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। তাও আবাব চক্ষুরোগের। দর্জির দোকান তুলে দিয়ে তিনি স্ট্রাণ্ডে একখানা ঘর ভাড়া করে হঠাৎ একদিন নিজেকে চক্ষুরোগেব বিশেষজ্ঞ বলে ঘোষণা করলেন। চশমার কাঁচ ও নানা রকম ফ্রেম দিয়ে ঘর সাজিয়ে সাইনবোর্ড লাগালেন। তারপর রীতিমত প্র্যাকটিস শুরু কবে দিলেন। তখন ১৬৯৪ সাল।

লণ্ডনের কাগজে কাগজে রোজ বিজ্ঞাপন বেরতে লাগল, ডাঃ রীড একজন খুব বড অভিজ্ঞ চক্ষু-চিকিৎসক। শুধু কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েই রীড থামলেন না। এক পণ্ডিতকে কিছু টাকা দিয়ে চক্ষুরোগের একখানা বই লিখিয়ে নিলেন তারপর সেই বই নিজের লেখা বলে ছাপিয়ে প্রকাশ করলেন। কাগজে কাগজে এই বই-এর বিজ্ঞাপন বেরল, সুখ্যাতি বেরল।

প্রচারকার্য আরও বেশী জোরালো এবং কার্যকরী করবার জন্য রীড গ্রাব স্ট্রীটের এক কবিকে ধরে কিছু টাকা দিয়ে নিজের সুখ্যাতি করে কয়েকটি ছড়া লিখিয়ে নিলেন। এই ছড়া বিজ্ঞাপনে রোজ কাগজে কাগজে বেরতে লাগল, এবং লোকের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল। তাইতেই রীড বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

ইংলণ্ডের রানী অ্যানী চক্ষুরোগে ভুগতেন, ভালো দেখতে পেতেন না। বিজ্ঞাপনের চোটে রীডের সুখ্যাতির কথা একদিন তাঁর কানে গেল। রানী রীডকে ডেকে পাঠালেন।

সেই যে রীড চক্ষু-চিকিৎসক হয়ে একবার রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন, আর কেউ তাঁকে হঠাতে পারল না। রীড রানীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হয়ে গ্যাট হয়ে বসে গেলেন। রীডকে রানী এত বেশী বিশ্বাস করতেন, এত বেশী রীডের উপর নির্ভরশীল ছিলেন যে, একদিন তাঁকে নাইটহুডের সম্মানে ভূষিত করে দিলেন। দর্জি উইলিআম রীড সেদিন থেকে স্যার উইলিআম রীড হয়ে

হাতুড়ে চিকিৎসকের মাথাধরার চিকিৎসা

গেলেন। রানী অ্যানীর মৃত্যুর পর রাজা প্রথম জর্জ যখন ইংলণ্ডের রাজা হলেন, স্যার উইলিআম তাঁরও চক্ষু চিকিৎসক হয়ে রইলেন।

রীড যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জন করে গেছেন, তেমনি অতিথি-বন্ধুদের জন্য খরচও যথেষ্ট করতেন। তখন পণ্ডিত এবং বিজ্ঞজনের কফি হাউসে আড্ডা ছিল। রীড মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন। জোনাথন সুইফট প্রমুখ বিজ্ঞজনের সঙ্গে রীডের এইখানেই আলাপ হয়। এঁরা রীডের ঘাড় ভেঙে খেতেন আবার রীডের অজ্ঞতা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করতেন। তখনকার

দিনের প্রসিদ্ধ কাগজ স্পেক্টেটরে তাঁর নাম উল্লেখ আছে। সেপ্টেম্বর ১ ও নভেম্বর ২৭, ১৭১২ সালে।

অ্যাডিসন এই রীডের সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন, 'একটা কথা খুব প্রচলিত যে, স্যার উইলিআমের পড়াশুনার কোনো বালাই ছিল না, কিন্তু প্রতিটি সাময়িক পত্রে রোজ নিজের সুখ্যাতি করে তিনি যে সব বিজ্ঞাপন ছাড়তেন, তা দেখে মনে হয়, তিনি লিখতেও বিশেষ জানতেন না।'

তিনি যেমন ছিলেন ধনী তেমনি জাঁকজমক খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁর ব্যবহার ছিল খুব মার্জিত এবং ভদ্র। তাঁর গৃহে ভোজ্য এবং পানীয়ের খুব সুনাম ছিল। অতিথিদের তিনি সোনার পাত্রে তাঁর গৃহের বিখ্যাত কড়া মদ পরিবেশন করতেন।

সেই সময় ইংলণ্ডের চিকিৎসকরা একটা কাঁচের পাত্রে মূত্র রেখে সূর্যের আলোয় চোখের সামনে ধরে তার রঙ দেখেই নারীর কুমারীত্ব কিংবা প্রেমজ্বর নির্ণয় করতেন।

অন্য সব রোগের চেয়ে মূত্রাশয়ে পাথর তখন খুব বেশী হত। আজকাল এ রোগের চিকিৎসা অপারেশন। এ অপারেশন তখন যদিও হত অনেক, তবু ওষুধ খাইয়ে পাথর গলানো যায় এই বিশ্বাসে রোগীদের অ্যালকালি খাওয়ানো হত। বিজ্ঞানীরা এই সমস্যা নিয়ে নানা রকম গবেষণা এবং জল্পনা-কল্পনা করতেন। কিন্তু সবাইকে তাক লাগিয়ে লণ্ডনে একদিন এক বিধবা ভদ্রমহিলার আবির্ভাব হল। নাম তাঁর জোআনা ষ্টিফেন্স।

মিসেস ষ্টিফেনস্ ডাক্তারি পড়েন নি, কেমিস্ট্রিও জানতেন না। কিন্তু পাথর গলিয়ে সোনা কি করে করা যায়, তা খুব ভালো জানতেন। মূত্রাশয়ে পাথর গলাবার তাঁর এক অব্যর্থ ওষুধ ছিল। ঘরে ঘরে রুগীরা এই ওষুধ পয়সা দিয়ে কিনত। সারাজীবন বোতল বোতল এই ওষুধ খেত। অভিজাত সমাজ এই ওষুধের গুণে হঠাৎ যেন মুগ্ধ হয়ে গেল।

ডিউক, বিশপ, আর্ল, ডাচেস্ সবার মুখেই এই ওষুধের সুখ্যাতি। যে ঝানু রাষ্ট্রবিদ. চিকিৎসকদের রয়াল কলেজকেও পাত্তা দিতেন না, তিনি পর্যন্ত জোয়ানা ষ্টিফেন্সের নামে কেমন যেন গলে যেতেন, শ্রদ্ধায় ভক্তিতে বিগলিত হতেন। দেখতে দেখতে মিসেস ষ্টিফেন্স লণ্ডনের এক অবতার হয়ে গেলেন।

১৭৩৮ সালের এপ্রিল মাসে একদিন লণ্ডনের রোগক্লিষ্ট জনগণের কাছে এক আশার বাণী ঘোষিত হল। জেণ্টল্‌ম্যানস্ ম্যাগাজিনে এক বিজ্ঞপ্তি

বেরল, মিসেস ষ্টিফেন্স তাঁর অব্যর্থ ওষুধ মানব জাতির কল্যাণের জন্য দান করতে প্রস্তুত। অবশ্য বিনিময়ে সামান্য কিছু অর্থ তাঁকে দিতে হবে, চাঁদা তুলে। এত বড় এক মহামূল্য সম্পত্তির বিনিময়ে মাত্র পাঁচ হাজার পাউণ্ড।

বিশপ এবং আর্লরা মুক্তহস্তে দান করলেন। কিন্তু পাঁচ হাজার পাউণ্ড চাঁদা তাতে উঠল না। মিসেস ষ্টিফেন্সও তাঁর ওষুধ গুপ্ত রাখলেন; কোনো দর-দস্তুর করলেন না। কিন্তু জনমত ক্রমশই প্রবল হল। দাবি উঠল, গভর্নমেণ্টেরই উচিত এমন অব্যর্থ ওষুধ জাতির জন্য কিনে নেওয়া।

এই দাবির চোটে পার্লামেণ্ট অবশেষে একটা অনুসন্ধানী কমিশন বসালেন। এই কমিশনে তখনকার দিনের বিখ্যাত সার্জন চেসেলডেনও ছিলেন। চেল্‌সী হাসপাতালে অপারেশন করে ইনি তখন মাত্র ৫৪ সেকেণ্ডে মূত্রাশয়ের পাথর বার করতেন। লণ্ডনে এসে জন হাণ্টার এঁরই কাছে সার্জারি শেখেন। এই কমিশনে সেণ্ট জর্জ হাসপাতালের বড় সার্জন স্যার সিজার হঅকিনস্ ছিলেন, যিনি এই অপারেশনের একটি যন্ত্রের আবিষ্কর্তা। আর ছিলেন, গাইস্ হাসপাতালের স্যামূএল শার্প। তাঁর লেখা সার্জারির বই তখন দশম সংস্করণ চলছে, ফরাসী ভাষায় পর্যন্ত অনূদিত হয়েছে।

এই তিনজন নামকরা সার্জন একমত হয়ে রিপোর্ট দিলেন, আমরা এই ওষুধ পরীক্ষা করে দেখেছি, কি করে এ ওষুধ তৈরী হয়, তাও লক্ষ্য করেছি। এই ওষুধ ব্যবহার করে আমরা নিঃসন্দেহ যে, পাথর গলাবার ক্ষমতা এতে আছে।

কাজেই গভর্নমেণ্ট মিসেস ষ্টিফেন্সকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দিয়ে এই ওষুধ জাতীয় সম্পত্তি করে নিলেন, পার্লামেণ্টে বিল পাশ করে। ১৭৩৯ সালের ১৯শে জুন লণ্ডন গেজেটে এই ফরমুলা প্রকাশিত হল।

মিসেস ষ্টিফেন্সের তিন রকম ওষুধ। একটা তরল টনিক, একটা বড়ি আর একটা পাউডার।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ জাতি দেখল, টনিক তৈরী হয় কতকগুলো বাজে গাছগাছড়া সাবানজলে সেদ্ধ করে। বড়ি হয়, বুনো গাজর এবং কতক বুনো গাছগাছড়া পুড়িয়ে তার ছাই সাবান এবং মধুর সঙ্গে মিশিয়ে। পাউডার হয় গ্রীষ্মকালে মে মাসে ডিমের খোসা খোলায় ভেজে বাগানের শামুকের সঙ্গে বেটে।

আস্তাকুঁড়ের এই আবর্জনার জন্য ইংলণ্ড তখন আইন পাশ করল, জোআনা

ষ্টিফেন্সকে বিপুল এক সম্পত্তি পুরস্কার দিল। এই আইনের খসড়ায় শুধু নামকরা সার্জনদেরই যে স্বাক্ষর ছিল তা কিন্তু নয়; হার্ভের পর ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণিতত্ত্ববিদ ষ্টিফেন হেলস্-এরও স্বাক্ষর ছিল। তখনকার কূটনীতি-বিশারদ প্রধান মন্ত্রী স্যার রবার্ট ওআলপোল এই সাবান-মাখা শামুকের গুঁড়ো বোতল বোতল খেতেন। মৃত্যুর পর স্যার সিজার হকিন্স যখন তাঁর দেহ ব্যবচ্ছেদ করেন তখন তাঁর মূত্রাশয় থেকে অনেকগুলি পাথর বেরোয়। শুধু প্রধান মন্ত্রী স্যার রবার্ট কেন, যাঁদেরই রোগ একেবারে সেরে গেছে বলে মিসেস ষ্টিফেন্স সার্টিফিকেট দিয়েছেন সবারই মূত্রাশয়ে পরে পাথর বেরিয়েছে।

এমনি করে সামান্য এক বিধবা ভদ্রমহিলা অত বড় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকেও কেমন অনায়াসে বোকা বানিয়ে দিলেন।

সেই যুগে লণ্ডনে টেলার নামে আর একজন হাতুড়ে চিকিৎসক ছিলেন। ইনিও একজন চক্ষু-বিশেষজ্ঞ। সেণ্ট টমাস হাসপাতালে জন হাণ্টারের শিক্ষক চেসেলডেনের কাছে টেলার কিছুদিন সার্জারি শেখেন। চোখের ছানি অপারেশনের এক যন্ত্রও তিনি আবিষ্কার করেন। কিন্তু লণ্ডনে প্র্যাকটিস জমল না দেখে একদিন তিনি হাতুড়েদের মতো ভ্রাম্যমান চক্ষু-চিকিৎসক হয়ে গেলেন।

যেখানে মেলা বসে সেখানেই হাতুড়ে চিকিৎসকরা ঘাঁটি ফেলে। ড্রাম বাজিয়ে শিঙা ফুঁকে খদ্দের ধরে। টেলার জমকালো কালো পোশাক ও লম্বা পরচুলা পরে এই মেলায় বক্তৃতা দিতেন। কত অন্ধের দৃষ্টি তিনি ফিরিয়ে এনেছেন তার ঢাক পেটাতেন। তাঁর বক্তৃতায় ইংরেজীর চেয়ে ল্যাটিনই থাকত বেশী। লোকে ল্যাটিন শব্দ না বুঝে বাহবা দিত। তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত।

এঁর সম্বন্ধে ডাঃ জনসন বলেছেন, 'টেলারের মতো এত বেশী অজ্ঞ লোক আমি জীবনে কখনও দেখি নি; কিন্তু লোকটা ছিল যাকে বলে প্রাণবন্ত। আর ওআর্ড লোকটা ছিল একেবারে অকাট মুখ্যু এবং সবচেয়ে নির্বোধ। একদিন টেলার আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বলে, ওর সঙ্গে ল্যাটিনে কথা বলতে হবে। আমি তো হেসেই খুন। যাই হোক, ওর বিদ্যের দৌড় দেখবার জন্য আমি হোরেস থেকে খানিকটা আবৃত্তি করে শোনালাম। গণ্ডমূর্খ টা কিছুই বুঝল না, ভাবল ওটা বুঝি আমারই কথা। তারপর ও নিজে যা বলল, তা কিন্তু খাঁটি ল্যাটিন।' (বসওএল, ১৭৭৯)

এখানে ডাঃ জনসন যে অকাট মূর্খ ওআর্ডের কথা বলেছেন, তিনি আর একজন প্রসিদ্ধ হাতুড়ে। জোশুয়া ওআর্ড। কিছুদিন তিনি পলিটিক্স করেন। তাতে সুবিধে হল না দেখে ওষুধের কারবারে মন দেন। অ্যান্টিমনি পিল এবং পাউডার তৈরী করে বিক্রি করতে শুরু করেন। এই ওষুধ দুটিই তাঁর ভাগ্য ফিরিয়ে দেয়। কাটতি ক্রমশ বাড়ছে দেখে ওআর্ড শোথের এক ওষুধ এইবার বাজারে ছাড়লেন। এটাও খুব চলল। তাই দেখে অর্শের মলম, মাথা ধরার পাউডার ইত্যাদি নানা রকম ওষুধ বাজারে ছেড়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করে ফেললেন এবং একদিন ডাক্তার বনে গেলেন।

ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জের একবার বুড়ো আঙুলের হাড় জয়েণ্ট থেকে খুলে যায়। ওআর্ড তাড়াতাড়ি একটা রেঞ্চ নিয়ে এসে চাপ দিয়ে আবার সেই হাড়টা জয়েণ্টে ফিরিয়ে আনেন। রাজা খুশী হয়ে ওয়ার্ডকে হোয়াইট হলের একখানা ঘরে থাকতে দেন এবং প্র্যাকটিস করবার সুযোগ দেন।

এইবার ওআর্ডের পদোন্নতি হল। অভিজাত মহলে তিনি চিকিৎসা শুরু করলেন। হাতুড়ে চিকিৎসা বন্ধ করার জন্য ১৭৪৮ সালে পার্লামেণ্টে আইন পাশ হয়। নিয়ম থাকে, উপযুক্ত শিক্ষালাভ না করে কেউ চিকিৎসা করতে পারবে না। রাজা দ্বিতীয় জর্জ ওআর্ডকে এই আইন থেকে মুক্তি দেন। সেই থেকে ওআর্ডের পসার আরও বাড়ে, নামও হয় প্রচুর।

এই ওআর্ডের সম্বন্ধে কবি পোপ লিখে গেছেন—

> Of late, without least pretence to skill
> Ward's grown a famous physician by a pill.

তখনকার দিনের নামকরা চিকিৎসকরা সবাই অল্পবিস্তর হাতুড়ে চিকিৎসা করতেন। চিকিৎসায় নীতিজ্ঞান তখন ছিল অল্প। স্যার হান্স্ স্লোন ছিলেন রয়াল সোসাইটির নিউটনের পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট। আবার কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্স্-এরও তিনিই তখন প্রেসিডেণ্ট। তবু তিনি নিজে চোখের অসুখের এক গুপ্ত মলম বিক্রি করতেন।

রিচার্ড মিড তখনকার এক নামকরা ডাক্তার। রানী অ্যানীর মৃত্যুকালে ইনিই রানীর চিকিৎসা করেন। বছরে তখন তাঁর সাত হাজার পাউণ্ড রোজগার। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। এমন কি ডাঃ জনসন পর্যন্ত মিডের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে গেছেন, ডাঃ মিড

সম-সাময়িক অন্য অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির চেয়ে মধ্যাহ্ন সূর্যের বিস্তীর্ণ আলোয় জীবন কাটিয়ে গেছেন।

এই রিচার্ড মিডের পাগলা কুকুরের কামড়ের এক গোপন ওষুধ ছিল। সেই ওষুধ বিক্রি করে তিনি অনেক পয়সা কামিয়েছেন।

সেই যুগে একজন ডাক্তার অপর আর একজনকে প্রকাশ্যে নিন্দে করতেন, পরস্পরকে সাংঘাতিক ঈর্ষা করতেন। একজনের চিকিৎসা-বিধি নিয়ে আর একজন দেখা হলেই কথা শোনাতেন, ঝগড়া করতেন।

১৭১৯ সালে জুন মাসের ১০ তারিখে এই রিচার্ড মিডের সঙ্গে জন উড-ওআর্ডের তুমুল এক ঝগড়া বেধে যায়, গ্রেসাম কলেজ প্রাঙ্গণে। বসন্ত রোগের চিকিৎসা-বিধি নিয়ে তর্কবিতর্ক থেকে ঝগড়া, ঝগড়া থেকে লড়াই। শেষে সত্যি সত্যি তলোয়ার বার করে দুজনে ডুয়েল লড়তে শুরু করেন। ডুয়েলে উড-ওয়ার্ডের হারবার উপক্রম দেখে দর্শকরা মাঝে পড়ে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়। তখন শুরু হয় দুপক্ষের তুমুল কথার লড়াই।

রবার্ট জেমসের চিকিৎসা-বিদ্যায় এত বেশী পাণ্ডিত্য ছিল যে তিনি তিনখণ্ড চিকিৎসার অভিধান রচনা করেন। তাঁর মধ্যে ডাঃ জনসনেরও রচনা আছে। সেই রবার্ট জেমস্ সারা জীবন তাঁর পেটেণ্ট করা জেমস্ পাউডার বিক্রি করেছেন ; কি করে এই পাউডারের কাটতি বাড়ানো যায় তার চেষ্টা করে গেছেন। শেষবারের জ্বরের সময় গোল্ডস্মিথ এই পাউডার খান এবং পরে রাজা তৃতীয় জর্জকেও এই পাউডার দেওয়া হয়। এই পাউডারের খ্যাতি দেশ থেকে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে ; আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। জর্জ ওয়াশিংটন পর্যন্ত বলেছেন, এই ওষুধ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধের মধ্যে অন্যতম।

হাতুড়ে চিকিৎসার এই ছোঁয়াচ থেকে গির্জার বড় বড় মোহান্ত বা পুরোহিতরাও তখন বাদ যান নি। জর্জ বার্কলী ছিলেন, ক্লএনের বিশপ। তিনি বস্তুতন্ত্র অথবা অঙ্কশাস্ত্র মানতেন না, কারণ এ-সবে স্বাধীন চিন্তার ঝোঁক বাড়ায়, বিশ্বাসের মর্মস্থলে ঘা দেয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেবদারু গাছের শুকনো কষ জলে মিশিয়ে খেলে সর্ব রোগ দূর হয়।

তাঁর যুক্তি ছিল, দেবদারু মাটি থেকে সোজা আকাশে ওঠে, প্রখর সূর্যের আলো এবং মুক্ত বায়ু থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সারটুকু টেনে নিয়ে নিজের গুঁড়িতে সংগ্রহ করে। সেই গুঁড়ি থেকে যে কষ বেরোয় তা নিশ্চয়ই দেবদারুর ঘনীভূত সারবস্তু। অতএব এই গাছের শুকনো কষ জল দিয়ে খেলে কঠিন

কঠিন রোগ, যেমন বসন্ত, যক্ষ্মা, সিফিলিস, উদরী, পাথর ইত্যাদি দেহ থেকে দূর হয়।

এই মত প্রকাশ করে বিশপ বার্কলী একখানা পুস্তিকা ছাড়লেন, ১৭৪৪ সালে। দেখতে দেখতে এই পুস্তিকার মুদ্রণের পর পুনর্মুদ্রণ হতে লাগল, সংস্করণের পর সংস্করণ বেরতে লাগল। ইওরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হতে লাগল। ডাক্তারদের মৃদু প্রতিবাদ অবজ্ঞায় হেসে উড়িয়ে দিয়ে ড্রাম ভর্তি এই কালো নোংরা রজন-জল ইউরোপের ঘরে ঘরে লোকে খেতে শুরু করল।

ডাঃ জনসন যাই বলুন, হাতুড়েরা সাধারণত অতি ধূর্ত প্রকৃতির। অসুখ হলে মানুষের মন দুর্বল হয়, নিশ্চিত আরোগ্য খোঁজে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মানবজাতির এই চিরন্তন দুর্বলতা হাতুড়েদের সর্বপ্রধান মূলধন। তাই হাতুড়ে চিকিৎসায় নিশ্চিত আরোগ্যের এই গ্যারান্টিটি ঘোষণা করা হয় সকলের আগে। বলা হয় ওষুধের ফল ধ্রুব, বিফলে মূল্য ফেরত।

রোগীর মনে আশা জাগাতে হলে, ভরসা দিতে হলে, বিশ্বাস সুদৃঢ় করতে হলে সব চেয়ে যা কার্যকরী সে এই গ্যারান্টি। নিশ্চিত আরোগ্যের এই ধ্রুব আশ্বাস। হাতুড়েরা জানে, বিজ্ঞান তা পারে না। তাই নির্ভয়ে তারা আশ্বাস দেয়, গ্যারান্টি ছাড়ে। সামান্য এই একটি কথার টোপেই রোগী এসে ফাঁদে পড়ে। ব্যাবসা চালু হয়।

বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে তাল রেখে হাতুড়েরা তাদের প্রচারকার্য পরিবর্তন করে। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, লুইগি গ্যালভ্যানি এবং আলেসান্দ্রো ভোল্টা যখন বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কার করেন, তখন থেকে হাতুড়েরা রুগীদের বৈদ্যুতিক মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে বহু অর্থ উপার্জন করেছে।

এমনি এক ফন্দি বার করেছিলেন, এডিনবরার জেম্‌স্ গ্রেহাম। গ্রেহামের বাবা এডিনবরার কাউগেটে ঘোড়ার জিন তৈরী করতেন। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে ডাক্তার করবার তাঁর খুব শখ ছিল। সেই আশায় গ্রেহামকে তিনি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু গ্রেহাম এত বেশী চঞ্চল ও ছটফটে যে ইউনিভার্সিটির বড় বড় অধ্যাপকরাও বেশীদিন তাঁকে ক্লাসে আটকে রাখতে পারলেন না। ডাক্তারি পাশ করবার অনেক আগেই তিনি কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

নিজের দেশ ছেড়ে গ্রেহাম সোজা আমেরিকায় গিয়ে উঠলেন এবং

অনায়াসে ডাক্তারী প্র্যাকটিস শুরু করলেন। কিন্তু বেশীদিন এক জায়গায় টিকে থাকা গ্রেহামের পোষাল না। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি প্র্যাকটিস করতে লাগলেন।

ঘুরতে ঘুরতে ফিলাডেলফিয়াতে এসে তিনি শুনলেন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কার করেছেন। সেই থেকে কি করে এই শক্তি তাঁর চিকিৎসা ব্যবসায় লাগানো যায় তাই নিয়ে তিনি ভাবতে শুরু করলেন। ভাবতে ভাবতে মাথায় এক ফন্দি এল। গ্রেহামের মনে হল, এই ফন্দি কাজে লাগাবার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হল অভিজাত সমাজ; এবং সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান ইংলণ্ড।

গ্রেহাম আবার ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। এবার এসে অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত পাড়ায় একখানা বাড়ি নিলেন। মস্ত বড বাড়ি। টেমস্ নদীর ধারে, অ্যাডেল্ফির রয়াল টেরেসে, ওয়েস্টমিন্স্টার ব্রীজ ও ব্ল্যাক-ফ্রাআরার-এর মাঝামাঝি। ১৭৮০ সালে।

বাড়িতে ঢুকতেই প্রকাণ্ড একটি হল ঘর, সুন্দর করে প্রাচ্য পদ্ধতিতে সাজানো। ঢুকলেই প্রথমে নজর পড়বে একটা বড় থামের পাশে পুরনো কতকগুলো লাঠি, কাঠের পা, ক্রাচেস, চশমা ও বধিরের নিত্য সঙ্গী কানের ড্রাম। গ্রেহাম বুঝিয়ে দিতেন, এসব জিনিস তাঁর রোগীদের। আগে তাঁদের এ-সব না হলে চলত না। তাঁর চিকিৎসায় আরোগ্য লাভের পর এসব আর তাদের প্রয়োজন হয় না। রোগ জয়ের নিদর্শন হিসেবেই এইসব তিনি সাজিয়ে রেখেছেন।

হল ঘরে মার্বেল পাথরের নগ্ন নারীমূর্তি, দেয়ালে হাতে আঁকা নামকরা শিল্পীদের অপূর্ব সব পেইন্টিং, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঁচের রঙিন গোলক, ঝকঝকে ইস্পাতের বড় বড় প্লেট, অদ্ভুত রহস্যময় স্ফীংক্স্ এবং বিরাট ড্রাগনের মুখ দিয়ে নির্গত অগ্নিশিখা দেখে দর্শকরা অভিভূত হয়ে যেত। ভয়ে বিস্ময়ে প্রতীক্ষায় বিরাট গদি-আঁটা কৌচের একটি কোণে চুপটি করে গিয়ে তারা বসে পড়ত। আরামে গদিতে হেলান দিয়ে চোখ বুজত। ঘূর্ণ্যমান ধূপদান থেকে প্রাচ্যদেশের অগুরু চন্দনের উগ্র সুবাস নাকে এসে দর্শকদের মোহাবিষ্ট করত।

গ্রেহাম এই হলের নাম দিলেন, স্বাস্থ্যের মন্দির। (টেম্প্লাম্ এসকুলাপিও সেক্রাম) প্রবেশমূল্য ছ গিনি।

ডাচেস অফ ডেভনশায়ারের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রেহাম নিজেকে অনায়াসে

প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন। অভিজাত মহলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। গ্রেহামের চিকিৎসা একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেল।

ছ গিনি খরচা করে বিরাট এই হলে ঢুকে দর্শকরা মোহাবিষ্ট হয়ে যখন ধপ করে বসে পড়তেন, সুচতুর গ্রেহাম ঘোষণা করতেন যাঁরা তাঁর বিরাট কন্দর্প-মন্দির (গ্রেট অ্যাপোলো অ্যাপার্টমেণ্ট) দেখেন নি, তাঁদের কিছুই দেখা হয় নি।

স্বর্গসুখশয্যার আবিষ্কারক জেমস গ্রেহাম

এই কন্দর্প মন্দিরে বিদ্যুৎ, বায়ু এবং চুম্বক এই ত্রিশক্তি পৃথক পৃথক অথবা একত্র ধারণ করে দেহের পুষ্টির এক অপূর্ব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ, বায়ু এবং চুম্বক, এই ত্রিশক্তিই পৃথিবীর মূল। যা কিছু আমরা দেখি, স্পর্শ করি, দেহে ধারণ করি এবং যা থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত, সবেরই মূলে এই ত্রিশক্তি।

গ্রেহামের এই কন্দর্পমন্দিরের আসল বস্তু একটি শয্যা। গ্রেহাম বলতেন স্বর্গসুখের শয্যা। চল্লিশটি জমকালো কাঁচের থামের উপর বসানো একটি

খাট। তার ওপর নরম গদি আঁটা রমণীয় এক শয্যা ; চুম্বক এবং বৈত্যুতিক কলকব্জা লাগানো। ঘরে মৃহু আলো, প্রাচ্য ধূপ-ধুনার উগ্র মাদক সুরভি এবং দেয়ালে বাসনা-উদ্দীপক বিচিত্র সব আলেখ্য। সর্বোপরি যন্ত্রসঙ্গীতের আবেগময় মূর্চ্ছনা।

গ্রেহাম বলতেন, এই শয্যায় শয়ন করলে যুবক-যুবতীরা দেহসৌষ্ঠব চিরজীবন রক্ষা করতে সমর্থ হয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নব যৌবন ফিরে পায়। নব দম্পতির সন্তান স্বাস্থ্যবান হয়। নিঃসন্তানের বলিষ্ঠ সন্তান হয়।

এই মেডিকো ম্যাগনেটিকো মিউজিকো ইলেকট্রিক্যাল শয্যার ভাড়া ছিল এক রাত্রির জন্য একশ পাউণ্ড। এই সুখশয্যার বিচিত্র অনুষ্ঠানে স্বর্গের যে স্বাস্থ্যদেবী অধিষ্ঠাত্রী হতেন তিনি এই মর্তভূমেরই মোহিনী এক নর্তকী, চতুরা এম্‌মা লায়ন। ইনিই পরে লেডি হ্যামিলটন নামে বিখ্যাত হন এবং লর্ড নেলসনকে বিমুগ্ধ করেন।

গ্রেহাম জানতেন কি করে মক্কেলদের হাতে রাখতে হয়। তিনি যা কিছু বক্তৃতা দিতেন অথবা যে পুস্তিকা প্রকাশ করতেন সবই যৌনবিষয়ক। যে ভাষা তিনি ব্যবহার করতেন তাতে সহজেই লোকে আকৃষ্ট হত, বশীভূত হত। বিপক্ষকে ঘায়েল করার অস্ত্রটিও তাঁর অতি মোক্ষম ; ঐ যৌন অনুভূতিকেই উসকে দেওয়া।

কিন্তু বেশীদিন এ ব্যাবসা চলল না। মোহিনী নর্তকী এম্‌মা লায়নের কীর্তিকলাপ একদিন প্রকাশ হয়ে গেল। গ্রেহামের কন্দর্পমন্দিরও তাই বন্ধ হয়ে গেল ১৭৮২ সালে।

গ্রেহামের সবচেয়ে দামী ওষুধ ছিল এলিক্সার অফ লাইফ, অগ্রিম মূল্য তার এক হাজার পাউণ্ড। গ্রেহাম সগর্বে ঘোষণা করতেন, এ ওষুধে মানুষের আয়ুষ্কাল দেড়শ বছর তো হবেই, আর মাঝে মাঝে রিপিট করলে অনন্তকাল হওয়াও অসম্ভব নয়। এই অলৌকিক ওষুধের আবিষ্কর্তা গ্রেহাম পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবার আগেই দেহরক্ষা করেন।

শব-চোর

উনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আধুনিক যুগ।

কিন্তু এই যুগের শুরুতে গ্রেট ব্রিটেনে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য শবব্যবচ্ছেদের আইনত কোনো সুযোগ ছিল না। বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্যও শব সংগ্রহ তখন বেআইনী, অর্থাৎ আদালতে দণ্ডনীয় এক অপরাধ।

অথচ শিক্ষাযতনের নিয়ম ছিল অন্য। প্রতিটি ছাত্রের নিজের হাতে শব-ব্যবচ্ছেদ করা চাই। নাহলে অ্যানাটমি শেখা যাবে না, পরীক্ষায় পাশ করা চলবে না। কাজেই সেই যুগে ডাক্তারি শিখতে হলে ইংরেজ ছাত্রকে আইন ভাঙতে হত।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের অ্যানাটমি শেখাতে হলে শবদেহের প্রয়োজন। শিক্ষকদের প্রকাশ্যে তা পাবার কোনো উপায় ছিল না বলেই তাঁরা ভেসালিআসের মতো গোপনে শবদেহ চুরি করে আনতেন এবং জোয়ান ছাত্রদের নিয়ে রাতের অন্ধকারে কবরখানায় গিয়ে হানা দিতেন। অনেক ক্ষেত্রে ছোটখাট যুদ্ধও বেধে যেত। ডাবলিন পাহাড়ের কাছে কিলগবিন সমাধির গায়ে বন্দুকের গুলির চিহ্ন থেকে এখনও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের নামকরা সার্জন রবার্ট লিস্টনের দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল। ছাত্রাবস্থায় এই সব নৈশ অভিযানের তাই তিনি বড় একজন পাণ্ডা ছিলেন।

কিন্তু যাকে রোজ শব-ব্যবচ্ছেদ করতে হয়, শত শত ছাত্রকে রোজ শেখাতে হয়, সে নিজে একা কত চুরি করবে?

কাজেই এই শব চুরির জন্য নতুন এক উপজীবী দেখা দিল লণ্ডন, এডিনবরা, গ্লাসগো, ম্যানচেস্টার এবং ডাবলিনে। এক-এক জায়গায় এদের এক-এক রকম নাম। কোথাও এরা শব-চোর (বডি স্ন্যাচারস), কোথাও শবত্রাণকারী

(রেসারেকশনিস্ট), কোথাও বা বস্তাভর্তিকার (স্যাক দেম্ আপ্ মেন), কোথাও বা আবার সামান্য জেলে।

দেখতে দেখতে এদের কারবার একচেটিয়া হয়ে গেল। এরা ছাড়া আর কোনো উপায়ে শবদেহ পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। শিক্ষকরা এদের খপ্পরে পড়ে গেলেন।

এই শব-চোরদের কারো শাস্তি হলে, জেলে গেলে, শিক্ষকরা তাদের সাহায্য করতে বাধ্য হতেন এবং তাদের পরিবার প্রতিপালন করতেন। নাহলে বিপদ হত। এদের সঙ্গে কারবার হঠাৎ বন্ধ করলে কিংবা কোনো দাবি না মানলে শবদেহ পাওয়া তো দূরের কথা, প্রাণ নিয়েই শেষে টান পড়ত। কারণ এদের প্রকৃতি ছিল হিংস্র। প্রতিশোধ নিতে এরা দ্বিধা করত না।

গায়ের জোরে ভয় দেখিয়ে ঘুষ দিয়ে কবরখানার পাহাবাদার ও তত্ত্বাবধায়ককে এরা সর্বদা হাতের মুঠোয় রাখত। কাজেই শিক্ষকদের এবং বিজ্ঞানীদের কাছে এরা যা খুশি তাই দাবি করতে পারত।

ইংলণ্ডের আইন তখন ভারি অদ্ভুত। শব চুরি যদিও একটা অপরাধ তবু সেটা সামান্য। কিন্তু মৃতদেহের ইঞ্চিখানেক পোশাকও যদি কেউ কবর থেকে তোলে, সে অপরাধ সাংঘাতিক।

কাজেই এই শব-চোর মৃতদেহের সব পোশাক কফিনে ফেলে শবটি শুধু উঠিয়ে নিয়ে আসত। একবার ভগান নামে দাগী এক শবচোর এবং তার স্ত্রী সকালবেলা এক শবযাত্রার সঙ্গী হয়ে রাতে গিয়ে কবর থেকে শব তুলে আনে। শেষে ধরা পড়ায় তাদের বিচার হয়। শব চুরির অপরাধে শাস্তি হয় এক মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু শবের এক পায়ে মোজা ছিল। তাড়াতাড়িতে আর সেটা আসামীরা খুলে রেখে আসতে পারে নি। সেই অপরাধে ভগান দম্পতির শাস্তি হল সাত বছরের নির্বাসন।

তখন শব-চোররা গরীবদের আস্তানা কি হাসপাতালে নির্ভয়ে এসে ঢুকত। যদি শুনত, কেউ মারা গেছে অমনি নিজেকে মৃতের আত্মীয় বলে পরিচয় দিত। হাসপাতালের কর্তারা হাতে যেন স্বর্গ পেতেন। কপর্দকহীন এই মৃতের সংকারের খরচ নিজেদের আর লাগবে না এই ভেবে তাড়াতাড়ি এদের হাতেই শব তুলে দিতেন।

কখনও কখনও এরা একটি শব এক শিক্ষকের কাছে বেচে আবার সেখান

থেকে সেটি চুরি করে এনে অপর এক শিক্ষকের কাছে বিক্রি করত। কখনও বা শবের বদলে মাতাল এক জীবন্ত লোককে বস্তাবন্দী করে নিয়ে যেত। তারপর জোচ্চুরি ধরা পড়বার আগেই পয়সা নিয়ে পালিয়ে আসত।

কখনও-বা এদের একদল কোনো এক মেডিকেল স্কুলে গিয়ে বলত, এরা এই স্কুলেই শুধু শব সরবরাহ করবে, অন্য কোনো স্কুলে দেবে না। অতএব মোটা টাকার বোনাস চাই। স্কুলের কর্তৃপক্ষ সহজেই রাজী হয়ে যেতেন। এই ফন্দি করে, একই কথা সবাইকার কাছে বলে এরা সব স্কুল থেকেই মোটা বোনাস আদায় করত।

পুলিসের চেয়ে এরা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের হাতেই মার খেত বেশি। একদল আর একদলকে হিংসা করত এবং পরস্পরের কারবার নষ্ট করবার অদ্ভুত সব ফন্দি বার করত। যেমন এরা ধূর্ত, তেমনি তারা কুশলী। আইন যত কড়া হল, শবের দামও ততই বাড়তে লাগল।

শব-চোররা তখন শুধু শাবল ও চেন দিয়ে যে কৌশলে সমাধি থেকে দ্রুত শব তুলে আনত তা সত্যি ভারি বিস্ময়কর। নিঃশব্দে ক্ষিপ্রহস্তে কবর খুঁড়ে রাতের অন্ধকারে এরা চটপট কফিন খুলে শব তুলত। শবদেহ থেকে পোশাক খুলে কফিনে রেখে এমন নিপুণভাবে মাটি চাপা দিয়ে আসত যে, কারো সাধ্য ছিল না বোঝে। শোকার্ত আত্মীয় বন্ধু শূন্যগর্ভ এই কবরের ওপর দিনের পর দিন অঝোর ধারে অশ্রুপাত করতেন। অতি যত্নে ফুলের চারা লাগাতেন। স্নেহে প্রেমে শ্রদ্ধায় এই শূন্য কবর ফুল দিয়ে সাজাতেন।

কবর থেকে শব যাতে চুরি না হয় সেজন্য মৃতের আত্মীয়রা কবরে কড়া পাহারা বসালেন। কবরখানার চারদিকে স্প্রিঙের বন্দুক লাগানো হল। শক্ত লোহার বার দিয়ে সমাধি ঘিরে রাখার ব্যবস্থা হল। অনেকে পেটেন্ট-করা লোহার কফিন ব্যবহার করতে লাগলেন। তবু সমাধি থেকে শবদেহ উধাও হতে লাগল।

কাজেই এই সব শব-চোর একবার ধরা পড়লে তাদের আর নিস্তার ছিল না। জনতার প্রতিহিংসা থেকে এদের রক্ষা করা কঠিন হত। চার্লস ডারউইনের স্মৃতিকথায় এই রকম এক ঘটনার উল্লেখ আছে। ডারউইন তখন ডাক্তারি পড়া ছেড়ে এডিনবরা থেকে পাদ্রী হওয়ার জন্য কেমব্রিজে পড়তে এসেছেন।

ডারউইন লিখেছেন, কেমব্রিজের রাস্তায় আমি একদিন বীভৎস এক কাণ্ড

দেখি। কেবল ফরাসী বিপ্লবের সময়েই এরকম নৃশংস ব্যাপার ঘটা সম্ভব ছিল। দুজন শব-চোর ধরা পড়েছে। হাজতে নিয়ে যাবার পথে কনস্টেবলের হাত থেকে ক্রুদ্ধ জনতা এদের ছিনিয়ে নিল। ইঁট পাটকেল পাথর যার যা খুশি তাই এই হতভাগ্যদের ওপর ছুঁড়তে লাগল। অবশেষে রাস্তায় ফেলে দু-পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। পাথরের রাস্তার ওপর ঘষা লেগে এদের পোশাক ছিঁড়ে গেল। হাত পা গা মুখ ক্ষতবিক্ষত হল। রক্তে কাদায় সারা গা মাথামাখি হল। তবু জনতার আক্রোশ গেল না। জিঘাংসায় মত্ত হয়ে সবাই এদের মুখে গায়ে লাথি দিতে শুরু করল।

অ্যানাটমির শিক্ষক এবং সার্জনরা তখন এই সব শব-চোরের হাতেব মুঠোয়। এদের ছাড়া তাঁদের অন্য উপায় নেই। অথচ এদের হাতের মুঠোয় থাকার অনেক বিপদ। কারণ এরা ভদ্রলোক নয়। মেরিলিস নামে এক প্রসিদ্ধ শব-চোর তার নিজের বোনকে পর্যন্ত সার্জনদের কাছে বেচে দিতে কোনো সঙ্কোচ করে নি।

সেই সময় এডিনবরার সার্জনস স্কোয়ারে ছজন প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষক অ্যানাটমির লেকচার দিতেন। সবাই শব-চোরদের কাছ থেকে চোরাই শব কিনতেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁর বেশি ছাত্র, তাঁর নাম ববার্ট নকস। অ্যানাটমির শিক্ষক হিসেবে ডাঃ নকস-এব তখন বিরাট খ্যাতি। তাই তাঁর কাছে শিক্ষার জন্য ছাত্রদের ভিড় হতে লাগল। ছাত্র-সংখ্যা বাড়তে বাড়তে পাঁচশর ওপব উঠে গেল।

কাজেই একই লেকচার তিন দল ছাত্রকে একই দিনে তাকে দিতে হত। তিনি নিজে শব-ব্যবচ্ছেদ করতেন, তারপর ছাত্রদের শেখাতেন।

সার্জনস স্কোয়ারের কিছু দূরেই ট্যানারস ক্লোজ। সেখানে দুজন আইরিশম্যান থাকত। একজনের নাম উইলিঅম হেয়ার আর একজন উইলিঅম বার্ক।

হেয়ার আর তার স্ত্রী মারগারেট বাড়িতে ভাড়াটে রাখত। সামান্য কয়েক পেনিতেই একটা বিছানা এ-বাড়িতে পাওয়া যেত, আর তাতেই এদের সংসার চলত।

বার্ক জাতে মুচি দেখতে বেঁটে-খাটো, কিন্তু খুব মিশুক। নাচ বেশ ভালো জানত। কাছেই তার বাসা। বার্কের স্ত্রীর নাম হেলেন, কিন্তু আদর করে বার্ক ডাকত নেলী।

এই নেলীর চেয়ে হেয়ারের স্ত্রী মারগারেট দেখতে অনেক বেশী সুশ্রী, চটপটে আর স্ফূর্তিবাজ।

এই চারজন রোজ একসঙ্গে আড্ডা দিত। ফাঁক পেলেই সারাদিন একসঙ্গে বসে মদ খেত, আর হল্লা করে ঘরে বসে স্ফূর্তি করত।

হেয়ারের এক ভাড়াটে ছিল অবসরপ্রাপ্ত এক সৈনিক। নাম তার ডোনাল্ড। তিন মাস অন্তর অন্তর তার পেনশন আসত। তিন মাসের বাকি একসঙ্গে হেযারকে সে শোধ করত। এই ডোনাল্ডের একদিন এমন অসুখ হল যে পেনশন হাতে আসার আগেই তার মৃত্যু হল। হেয়ারের পাওনা চার পাউণ্ড তাই সে আর শোধ দিয়ে যেতে পারল না। হেয়ার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। গির্জা থেকে লোক এসে যখন ডোনাল্ডের মৃতদেহ কফিনে ভরে রেখে গেল হেয়ার একা বসে বসে ভাবতে লাগল।

হেয়ার ও মার্গারেট

এমনি সময়ে বার্ক এল। দুই বন্ধুতে অনেক সলা-পরামর্শ হল। এরা কেউ আগে কখনও শব চুরি করে নি। কিন্তু শুনেছে মৃতদেহও নাকি বিক্রি করা যায় সার্জনদের কাছে। অনেক ভেবেচিন্তে দুই বন্ধু মনস্থির করে ফেলল।

কিছুক্ষণ পরে গির্জা থেকে লোক এসে কফিনটা নিয়ে গেল। কফিনের ভেতর তখন শুধু ইট পাথর আর চট। ডোনাল্ডের মৃতদেহ হেয়ারের বিছানায় চাদর দিয়ে ঢাকা।

বার্ক এবং হেয়ার এইবার এডিনবরার ডাক্তারী কলেজের দিকে গুটিগুটি রওনা হল। কলেজের কাছে এসে একটি ছাত্রকে দেখে জিজ্ঞেস করল, অ্যানাটমির লেকচারারের ঘরটা কোথায়। ছেলেটি ডাঃ নকসের ছাত্র। তক্ষুনি তাঁর ঘর দেখিয়ে দিল, ১০নং সার্জনস স্কোয়ার।

সেই রাত্রে মৃত ডোনাল্ডের শব ডাঃ নকসের শব-ব্যবচ্ছেদ ঘরে এসে পৌছল। হেয়ার ডোনাল্ডের দেনার ডবল দাম পেল। কোনো কৈফিয়ত দিতে হল না, বরং বলা হল এই রকম শব আরও পেলে যেন চটপট এখানে নিয়ে আসে। সেদিন ২৯শে নভেম্বর। ১৮২৭ সাল।

হেয়ারের বাড়ির আর একটি বাসিন্দার একদিন জ্বর হল। তার নাম জোসেফ। এমনিতেই লোকটি মরে যেত। বেশিদিন ভুগলে বাড়িটারই শুধু বদনাম হবে মিছিমিছি। তাই বার্ক আর হেয়ার একদিন জোসেফের মুখ বালিশ দিয়ে চেপে ধরল। ডাঃ নকস এই শব দশ পাউণ্ড দিয়ে কিনলেন।

এর পর থেকে বার্ক এবং হেয়ারের নতুন কারবার শুরু হল। হিসাবের খাতায় ঘন ঘন জমা পড়তে লাগল, ডাঃ নকসের কাছে দশ পাউণ্ডে বিক্রি। অজানা এক গরিব ইংরেজ এডিনবরায় পাথরকুচি বেচত। একদিন তার জনডিস হল। অতএব তার নামও এই কোম্পানির খাতায় উঠে গেল।

কোম্পানির দুই অংশীদার হেয়ার এবং বার্ক এইবার শিকারের খোঁজে বাইরে বেরুল। অপরিচিত, নির্বান্ধব, গরিব পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক দেখলেই তারা এগিয়ে গিয়ে ভাব জমাত। তারপর বাড়িতে ডেকে আনত।

তারপর খোলা হত হুইস্কির বোতল। মদ খেয়ে খেয়ে বেহুঁশ হলে ঝাঁপিয়ে পড়ত একজন নতুন এই শিকারের উপর। আর একজন তার মুখ চেপে ধরত হাত অথবা বালিশ দিয়ে। দম বন্ধ হয়ে বেচারার মৃত্যু হত কিন্তু দেহে কোনো দাগ থাকত না। বাক্সে ভরে তারপর এই শব সার্জনস স্কোয়ারে চালান যেত। ডাঃ নকস শব-পিছু দশ পাউণ্ড দাম দিতেন। কোনো প্রশ্ন করতেন না।

কারণ প্রশ্ন করার তাঁর কোনো উপায় ছিল না। একে তো আইনত শব পাবার কোনো উপায় নেই। হাউস অব কমন্সে বড় বড় ডাক্তারদের আবেদন-নিবেদন বার বার অগ্রাহ্য হয়েছে। তার ওপর ছাত্র-সংখ্যা যত বাড়ছে, শবদেহের প্রয়োজনও সেই অনুপাতে নিত্য বাড়ছে। তাই খামকা প্রশ্ন তুলে শব আমদানি বন্ধ হয় এমন কোনো ঝুঁকি নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সেই সুযোগে বার্ক এবং হেয়ার নির্ভয়ে কারবার চালাতে লাগল। মারগারেট এবং নেলীও ক্রমশ পাকা সাকরেদ হয়ে উঠল। প্রথম প্রথম

অচেনা অজানা ভবঘুরে দেখে এরা শিকার বাছত। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সাহস যত বাড়ল, হাতও তেমনি পাকা হল। অচেনা অজানা ছাড়া এখন জানা-শোনাদের মধ্যেও শিকার ধরতে এদের আর কোনো সঙ্কোচ বা ভয় রইল না। কিছুদিন ব্যাবসা মন্দা দেখে হেয়ারের স্ত্রী মারগারেট বার্কের স্ত্রীকেই একদিন চালান দিতে চাইল। কিন্তু বার্ক অতটা পারল না। তার আদরেব নেলীকেও এমনিভাবে পণ্য করতে কিছুতেই সে রাজী হল না।

এই নেলীর দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়া গ্রাম থেকে একদিন বেড়াতে এল। প্রচুর হুইস্কি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করা হল। নেশা যখন বেশ জমেছে, তখন হেয়ারকে বাইরে ডেকে বার্ক বলল, হাজার হোক এ যখন আমাদের আত্মীয়া এবং অতিথি, তখন শুরুটা আর তার নিজের হাতে করা ভালো দেখায় না। কাজেই হেয়ার শুরু করল। বার্ক বাকিটা শেষ করল।

এই পদ্ধতিতে মেরী পেটারসনের শব যেদিন ডাঃ নকসের টেবিলে গিয়ে উঠল, সেদিন ছাত্রদের মধ্যে তুমুল এক হৈ-চৈ পড়ে গেল। আঠারো বৎসর বয়সের যুবতী এই মেরী ক্যাননগেট বস্তির সুন্দরী এক বারবনিতা। উদ্ধত যৌবনে পরিপুষ্ট নগ্ন এই নারীদেহ যেন গ্রীক ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ এক নিদর্শন। ছাত্ররা টেবিলের চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়াল। কৌতূহলে উত্তেজনায় গুঞ্জন শুরু করল। একটি ছেলে মাত্র তিন রাত্রি আগেও এই মেরীর সঙ্গ পেয়ে এসেছে, আজ সেই মেরীর অবিকৃত এই শব টেবিলে দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ডাঃ নকস নারীদেহের এই অপূর্ব প্রকাশ স্পিরিটে ডুবিয়ে মিউজিয়মে রেখে দিলেন।

স্কটল্যাণ্ডের এক নৈশ উৎসবের নাম হ্যালোউইন। কথিত আছে, সেদিন রাত্রে ভূত প্রেত শয়তান এবং ডাইনীরা হানা দেয়। নিবিড় অন্ধকারে কুকর্ম করে বেড়ায়। বার্কও সেদিন শিকারের সন্ধানে বেরুল। এক মদের দোকানে ঢুকে গ্লাস নিয়ে বসে ভিড়ের মধ্যে কাকে পাকড়াও করা যায়, তার ফন্দি আটতে লাগল। খানিক পরে এক বুড়ী এসে ভিক্ষে চাইল। নাম তার ডোকার্টি। ছেলের খোঁজে আয়র্ল্যাণ্ড থেকে এসেছে, কিন্তু তাকে পায় নি। হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেছে তাই ভিক্ষে চায়।

বার্ক নিজেও আইরিশ। বুড়ীকে দেখেই তার মন আনন্দে নেচে উঠল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলল, তার মার পদবীও যখন ডোকার্টি, তখন বুড়ী নিশ্চয়ই তার কোনো আত্মীয়া। অতএব বুড়ীর ছেলেকে খুঁজে বার করা তো

বার্কেরই কর্তব্য। কাজেই বুড়ী সঙ্গে চলুক। যে কদিন ছেলেকে না পাওয়া যায়, বার্কের বাড়িতে থাকুক।

মিসেস ডোকার্টি অতি সহজে ফাঁদে পড়ে বার্কের সঙ্গে সঙ্গে চলল। কিন্তু বাড়ি পৌছে দেখা গেল, জেমস গ্রে বলে এক মজুর তার স্ত্রী ও বাচ্চা নিয়ে হ্যালোউইন পরব করতে এসে ঘরটি দখল করে বসে আছে। কাজেই বার্কের মেজাজ খিঁচড়ে গেল; এবং গ্রেকে তক্ষুনি ঘর ছেড়ে দিতে বলল। কিন্তু এত রাতে বেচারা যায় কোথায়? গোলমাল শুনে হেয়ারের স্ত্রী মারগারেট এসে একটা ফয়সালা করে দিল, এক রাতের জন্য গ্রেদের তাব বাড়িতে একটা বিছানা দিয়ে। পরদিন সকালে আবার ফিরে আসবে বলে গ্রেরা তাই চলে গেল।

পরবের দিন সবাই ফূর্তি করে নাচে, গায়, মদ খায়। বার্কের বাড়িতেও খুব হুল্লোড় হল। প্রতিবেশীরা এল। খুব নাচ গান হল। বুড়ী ডোকার্টিও নাচল আর প্রচুর মদ খেল। অনেক রাতে প্রতিবেশীরা একে একে সব বিদায় নিল। শুধু বার্ক এবং হেয়াররা থেকে গেল। হঠাৎ একটা শব্দ হল। তারপর সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

পরদিন সকালে গ্রেরা ফিরে এসে দেখে ডোকার্টি নেই। জিজ্ঞাসা করল, বুড়ী কোথায়?

নেলী জবাব দিল, মদ খেয়ে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছিল, তাই তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

গ্রের স্ত্রী অ্যান ছেলের মোজা খুঁজে পাচ্ছিল না। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে যেই আস্তাবলের খড়ের গাদার কাছে গেছে, অমনি বার্ক হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, খবরদার ওদিকে যাবে না।

তাই দেখে অ্যানের মনে খটকা লাগল। কিন্তু মুখে কিছু সে বলল না। দেখল,—সারাদিন বার্ক বাড়িতে বসে পাহারা দিচ্ছে। ওদিকে কাউকেই আর যেতে দিচ্ছে না। সন্ধ্যের মুখে বার্ক উঠল। স্ত্রী নেলীকে পাহারায় বসিয়ে নিজে একটু গলা ভেজাতে মদের দোকানে গেল। নেলী পাহারায় বসে যেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে একবার বাইরের ঘরে গেছে, সেই ফাঁকে অ্যান আস্তাবলে ছুটে গিয়ে খড়ের গাদা তুলে দেখে বুড়ী ডোকার্টির মৃতদেহ। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে অ্যান স্বামী ও বাচ্চাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সিঁড়ির মুখেই নেলীর সঙ্গে দেখা। নেলী অনেক কাকুতি-মিনতি করল। সপ্তাহে দশ পাউণ্ড করে

ঘুষ দেবে বলেও প্রতিজ্ঞা করল। কিন্তু গ্রেরা শুনল না। সোজা গিয়ে থানায় খবর দিল।

সেইদিন রাত আটটার সময় বার্কের সদর দরজায় ঠক-ঠক শব্দ শোনা গেল। নেলী দরজা খুলে দেখে পুলিস।

এই কর্মচারীটি ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আস্তাবলে এল। খড়ের গাদা তুলে নাড়াচাড়া করে দেখল। কিন্তু মৃতদেহের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না।

শৃঙ্খলিত বার্ক

বার্ক বলল, গ্রেরা ভাড়া দেয় না, তাই ওদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই আক্রোশে থানায় গিয়ে মিথ্যে নালিশ করেছে।

পুলিসেরও তাই মনে হল। তবু একবার এই দুজনকে থানায় নিয়ে গেল।

পরদিন রবিবার। এডিনবরার দোকান-পাট বন্ধ। স্কুল-কলেজ বন্ধ। হঠাৎ সার্জনস স্কোয়ারে একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। ছাত্ররা, শিক্ষকরা সব ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল।

কি ব্যাপার ?

শোনা গেল, ডাঃ নকসের শব-ব্যবচ্ছেদ ঘরে সদ্য খুন-করা এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পুলিস এসেছে।

ডাঃ নকস বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। শবদেহ তিনি গোপনে ক্রয় করেন সত্যি। কিন্তু তাই বলে, খুন করে সেই শব তাঁর কাছে কেউ বিক্রি করতে পারে, এতটা কখনও তিনি ভাবেন নি। তাই পুলিসের কথায় তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তাড়াতাড়ি তাঁর শব-ব্যবচ্ছেদ ঘরের দরওয়ানকে ডেকে পাঠালেন।

দরওয়ান এসে বলল, গত রাত্রে স্বাভাবিক নিয়মে একটি চালান এসেছে বটে। কিন্তু এখনও তা খোলা হয় নি।

পুলিসের সামনে যখন সে বাক্স খোলা হল জেমস গ্রে সেই শব বুড়ী ডোকার্টির বলে সনাক্ত করল।

এডিনবরায় হুলস্থুল পড়ে গেল। ধরা পড়ল বার্ক এবং হেয়ার সস্ত্রীক। ডাঃ নকসকেও লোকে দোষী মনে করল। কিন্তু তাঁকে পুলিস ধরল না। কাজেই জনতা ক্ষেপে গেল।

ক্রুদ্ধ জনতা ডাঃ নকসের নিউইংটনের বাড়ি আক্রমণ করল। জানালা দরজা সব ভেঙে দিল। তাঁর কুশপুত্তলিকা গলায় দড়ি দিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দিল। তারপর রাস্তায় ধরে তাঁকে প্রহার দেবে বলে সুযোগ খুঁজতে লাগল। লোকের মুখে মুখে ছড়া শোনা গেল—

> Down the close and up the stair
> But and ben wi' Burke and Hare,
> Burk's the butcher, Hare's the thief,
> Knox the man that buys the beef.

অবশেষে একদিন বার্ক এবং হেয়ারের বিচার শুরু হল। উকিলরা আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে এত বেশি বিতর্ক তুললেন যে আসল সত্য চাপা পড়ে রইল। খুনের কিন্তু কোনো কিনারা হল না। বাইরে ক্রুদ্ধ জনতা তাই নিস্ফল আক্রোশে গর্জাতে লাগল। অবশেষে রাজসাক্ষী হলে হেয়ার মুক্তি পাবে ঘোষণা করার পর হাসিমুখে হেয়ার ষোলোটি খুনের অপরাধ স্বীকার করল। আইন-আদালত এবং পুলিসের বিরাট যন্ত্র যা পারে নি, খবরের কাগজ একদিন সে অসাধ্য সাধন করল। ষোলোটি খুনের বিস্তারিত বিবরণ এবং বার্কের পূর্ণ স্বীকৃতি আদালতে প্রকাশ হবার আগেই একদিন এডিনবরার ইভনিং কুরাণ্টে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ষোলোটি খুনের বিচার করা সম্ভব হল না। প্রচলিত আইনে কিছু বাধা থাকায় শুধু মিসেস ডোকার্টির খুনের জন্য বার্ক এবং হেয়ারদের বিচার হল। হেয়ার, মারগারেট এবং নেলী বেকসুর ছাড়া পেল। একা বার্কের শাস্তি হল; ফাঁসিতে প্রাণদণ্ড। বিশ পঁচিশ হাজার দর্শকের সামনে লন মার্কেটে বার্কের একদিন ফাঁসি হয়ে গেল।

বার্কের ফাঁসি হয় ২৮শে জানুআরি, ১৮২৯ সালে। আর অ্যানাটমি অ্যাক্ট পাশ হয় তার তিন বছর পরে। ১৯শে জুলাই ১৮৩২ সালে। তখনকার দিনে আইন যাঁরা তৈরি করতেন, তাঁদের ঝোঁক ছিল ব্যক্তিগত আমোদ-প্রমোদে, এবং শেয়াল-শিকারে। শিক্ষা এবং বিজ্ঞান নিয়ে মাথা

ঘামাবার তত সময় তাঁদের হত না। তাই শিক্ষার জন্য, বিজ্ঞানের জন্য শব-সংগ্রহ আইন অনুমোদিত করবার চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হয়েছে। আর্ক বিশপ অব ক্যাণ্টারবেরী রাজী হননি। নিজেদের মধ্যে দলাদলি থাকায় লণ্ডনের রয়াল কলেজ অফ সার্জনস পর্যন্ত এর বিরোধিতা করেছেন। কাজেই সমগ্র জাতিকে সচেতন করতে, কুসংস্কার এবং দলাদলি ভেঙে একমত হতে এই বার্ক ও হেয়ার কোম্পানির প্রয়োজন ছিল। স্ত্রী-পুরুষ-শিশুনির্বিশেষে খুন করে শব বিক্রির এই স্বীকৃতির এত বেশি দরকার ছিল। এ না হলে শব-চোরের কবল থেকে বিজ্ঞানীদের অত শীঘ্র কখনোই মুক্তি হত না। অ্যানাটমি অ্যাক্ট পাশ হতে আরও দেরি হত।

গ্রেট ব্রিটেনে অ্যানাটমি সার্জারির যাঁরা পথিকৃৎ লণ্ডনের জন হাণ্টার তাঁদের মধ্যে প্রধান। নিজের ওপর ঝুঁকি নিতে কখনও তিনি ভয় পান নি। তাই তাঁর মিউজিয়মে অমন বিচিত্র সংগ্রহ তিনি রেখে যেতে পেরেছেন। মাত্র এক-হাত-উঁচু বামনের কঙ্কাল থেকে সাড়ে সাত ফুট লম্বা বিরাট দৈত্যকায় মানুষের কঙ্কাল সংগ্রহ করা শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে।

সাড়ে সাত ফুট লম্বা দৈত্যকায় এক আইরিশ ছিল। তার যখন অসুখ হয়, জন হাণ্টার রোজ তাকে দেখতে যেতেন। অনেকক্ষণ তার পাশে বসে থাকতেন।

দৈত্যকায় আইরিশটির অসুখ ক্রমশ বাড়তে লাগল। জন হাণ্টারও ঘন ঘন আসতে লাগলেন। একদিন দৈত্যটি বুঝল, এ-রোগ আর তার সারবে না, সেদিন তার হঠাৎ ভয় হল। জন হাণ্টার বিদায় হলে তার বন্ধুদের একে একে ডেকে মিনতি করে বলল, সে মরে গেলে যেন সীসের কফিনে করে তার মৃতদেহ মাঝসমুদ্রে ফেলে আসা হয়। মাটি খুঁড়ে কবর কখনও যেন না দেওয়া হয়।

তারপর একদিন এই দৈত্যটির মৃত্যু হল। কিছুকাল পর দেখা গেল, জন হাণ্টারের মিউজিয়মে নতুন এক কঙ্কাল এসেছে। কঙ্কালটি লম্বায় সাত ফুট ছ ইঞ্চি।

ডাঃ নকসের এক যুগ আগে জন হাণ্টারকেও শব-চোরদের কাছ থেকেই শব কিনে ব্যবচ্ছেদ করতে হত। শবদেহ থেকে বিচিত্র সব নমুনা তিনি তাঁর মিউজিয়মে কাঁচের পাত্রে স্পিরিট দিয়ে রক্ষা করতেন। আইনত কোনো শব

পাবার তাঁর কোনো উপায় ছিল না। অথচ সবাই জানত তিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করেন।

একবার এক খুনের মামলায় তাঁকে সাক্ষী দিতে হয়। আদালত জিজ্ঞাসা করেন, সমগ্র ইওরোপের মধ্যে আপনিই তো সবচেয়ে বেশি শব-ব্যবচ্ছেদ করেছেন ?

জন হাণ্টার উত্তর দেন, হ্যাঁ। এই তেত্রিশ বছরে একা আমিই শুধু হাজার হাজার শব-ব্যবচ্ছেদ করেছি।

উত্তর শুনে আদালতের তো চক্ষু চড়ক গাছ! সাহস করে আর জিজ্ঞাসা করা গেল না, এই হাজার হাজার শব আপনি পেলেন কি করে ?

সার্জন হান্টার

বিলেতে সার্জারির (শল্যবিদ্যার) সবচেয়ে বড় উপাধি এফ. আর. সি. এস; ফেলো অফ রয়েল কলেজ অফ সার্জনস্, ইংলণ্ড অথবা এডিনবরা। দেশ বিদেশ থেকে ডাক্তাররা এই কঠিন পরীক্ষা দিতে বিলেতে আসেন। নিদারুণ শ্রম এবং অধ্যবসায়ের গুণে অবশেষে পাশ করে বিশেষজ্ঞ হয়ে দেশে ফিরে যান। তারপর সার্জারি প্র্যাক্‌টিস করেন এবং ছাত্রদের শেখান। সার্জনদের আজকাল খাতির বেশি; ভাঁট বেশি।

আগেকার দিনে কিন্তু সার্জনরা সমাজে এত খাতির পেতেন না। এখনকার মতো এত প্রতিপত্তি তো দূরের কথা, সাধারণ মর্যাদা পর্যন্ত তাঁদের কেউ দিত না। এমন কি, চিকিৎসক-সমাজের মধ্যেও সার্জনরা ছিলেন অপাঙক্তেয়, নিচু শ্রেণীর হরিজন। কারণ নাপিতরাও তখন সার্জারি করত।

তখনকার দিনে রাষ্ট্রের উপর গির্জার আধিপত্য ছিল বেশি। নাপিতরা এই গির্জার সাহায্যেই সার্জন বনে যায়। তখন এক একটা গির্জার অধীনে অনেক অনেক মঠ। আবার এক একটা মঠে অনেক অনেক ভিক্ষু। ভিক্ষুদের মাথা প্রায়ই কামাতে হত। নাহলে পরচুলা বা মাথার পোশাক ঠিক মতো বসানো যেত না। কাজেই সব মঠেই নাপিতের দরকার হত। এই নাপিতরা ভিক্ষুদের মাথার চুল কামাত; আবার অসুখ হলে দেহ থেকে দূষিত রক্ত বার করার জন্য শিরা কেটে রক্ত মোক্ষণও করাত। তখন কঠিন রোগের এটাই ছিল প্রধান চিকিৎসা। কারণ সবাই ভাবত রক্ত দুষ্ট হয়েই অসুখ হয়।

শিরা কেটে হাত পাকিয়ে নাপিতরা দেখল, বাইরেও তাদের চাহিদা নিতান্ত মন্দ নয়। বরং রোজগার বাইরে অনেক বেশি। অভিজাত চিকিৎসকদের তখন ভারি দেমাক। রক্তমোক্ষণ কি ফোঁড়া কাটা এইসব ছোট কাজে তাঁরা হাত দিতে চাইতেন না। অনেকেই বেশ ঘৃণাবোধ করতেন।

তাই দেখে নাপিতরা চটপট এই কাজে লেগে গেল। ঘরে ঘরে তাঁদের ডাক পড়তে শুরু হল। রক্ত মোক্ষণ থেকে শুরু করে ফোঁড়া কাটা, কাটা ছেঁড়া জোড়া দেওয়া সব কাজেই এরা হাত লাগাতে শুরু করল। দেখতে দেখতে নাপিতরাও একদিন পাকা সার্জন বনে গেল। এদের নাম হল বারবার-সার্জন।

সেই সময় চিকিৎসকরা ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর। সার্জনদের তাঁরা নিচু শ্রেণীর মনে করতেন। সার্জনরা আবার বারবার-সার্জনদের ঘৃণা করতেন। কাজেই এই তিন দলের মধ্যে রেষারেষি ঝগড়াঝাটি নিত্য লেগে থাকত। বারবার-সার্জনরা পণ্ডিত ছিলেন না কিন্তু তাঁরা আতুরের সেবা করতেন। মহামারী লাগলে অভিজাত শ্রেণীর মতো প্রাণভয়ে আত্মরক্ষা করবার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতেন না। কাজেই ইংলণ্ডের রাজা হেনরী একদিন আইন করে বারবার কোম্পানি এবং সার্জনদের এক করে দিলেন; ১৫৪০ সালে। এইবার এঁদের নাম হল সংযুক্ত বারবার-সার্জন কোম্পানি।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে ১৫০৫ সালে এডিনবরায় ছুতোর, কামার, চর্মকার, দর্জি ইত্যাদির মতো বারবার-সার্জনরাও তাদের সমিতি রেজিস্টারি করে রাখে। কারণ, রেজিস্টারি করা থাকলে রাষ্ট্র থেকে কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেত। ফলে গ্রেটব্রিটেনে এরাই সর্বপ্রথম বৎসরে একটি করে ফাঁসির আসামীর শব ব্যবচ্ছেদ করে শিক্ষানবিশদের শেখাবার অধিকার পায়। বারবার সার্জনদের এই সমিতিই পরে এডিনবরার রয়েল কলেজ অফ সার্জনে পরিণত হয়; ১৭৭৮ সালে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে সব জাহাজ এদেশে আসত তাতে একজন করে এই নাপিত এবং সার্জন থাকত। ১৬১৪ সালে জন উড অল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সার্জন জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি তখন লণ্ডনের বারবার কোম্পানির একজন সদস্য, আবার সেণ্ট বার্থলোমিউ হাসপাতালের একজন সার্জন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে তখন তাঁর কাজ ছিল, কোম্পানির জাহাজের জন্য সার্জন যোগাড় করা এবং ওষুধের বাক্স যন্ত্রপাতি ও ওষুধে ভর্তি করা। এছাড়া তাঁর আরও একটি কাজ ছিল। সে কাজ কোম্পানির কর্মচারীদের মাথার চুল কাটা। কোম্পানির ছুতোর, নাবিক, শ্রমিক অথবা অন্য কর্মচারীদের মাথার চুল চল্লিশ দিন অন্তর অন্তর একবার করে এই সার্জন

জেনারেলকে নিজে অথবা তাঁর ডেপুটিকে দিয়ে অতি উত্তমরূপে কেটে দিতে হত। এজন্য কর্মচারীরা প্রত্যেকে বেতন থেকে মাস মাস দু-পেনি করে দিতে বাধ্য থাকত। কাজেই অভিজাত চিকিৎসকরা যে সার্জনদের অবজ্ঞার চোখে দেখবেন তাতে আর আশ্চর্য কি?

বারবার-সার্জন

ফরাসী দেশেও তখন এই অবস্থা। চিকিৎসকরা অভিজাত শ্রেণীর। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার কলেজ অফ্ সেণ্ট কোমিতে চিকিৎসকদেরই আধিপত্য। সার্জনদের সেখানে স্থান নেই। বারবার-সার্জনদের সঙ্গে সার্জনরা আইনত যদিও সংযুক্ত, কিন্তু কার্যত তাদের থেকে পৃথক। শুধু পৃথক নয়, বারবার-সার্জনদের সঙ্গই তাঁরা ঘৃণা করেন। নিচু জাত বলে অস্পৃশ্য মনে

করেন। চিকিৎসকরা বর্ণশ্রেষ্ঠ ; সার্জন এবং বারবার-সার্জন দু-জাতকেই ঘৃণা করেন।

ফরাসী সার্জনরা জাতে উঠলেন রাজা চতুর্দশ লুইএর অনুগ্রহে। রাজার ভগন্দর (এনাল ফিসচুলা) রোগ ছিল। সেঁক, মলম ইত্যাদি নানা রকম চিকিৎসায় যখন এ-রোগ সারল না, তখন সার্জন ফেলিক্স্ অপারেশন করে রাজার এই কঠিন রোগ সারিয়ে দিলেন। রাজা খুশী হয়ে ফেলিক্স্কে প্রচুর টাকা এবং জায়গাজমিই শুধু দিলেন না, তাঁকে এবং তাঁর পরবর্তী সার্জন মারেস্কালকে রাজার ব্যক্তিগত সার্জন নিযুক্ত করলেন।

এই মারেস্কালই পরে রাজা পঞ্চদশ লুইকে ভজিয়ে চিকিৎসকদের কলেজ সেণ্ট কোমিতে সার্জারির জন্য পাঁচখানা আসন মঞ্জুর করিয়ে নিলেন ; ১৭২৪ সালে। তাই দেখে চিকিৎসকদের সঙ্ঘ প্যারিস ফ্যাকালটি সাঙ্ঘাতিক চটে যান। এত বেশী অপমান বোধ করেন যে, সার্জনরা যখন কলেজ অফ সেণ্ট কোমিতে ছাত্রদের ক্লাশ নিতে শুরু করেন তখন তা বন্ধ করবার জন্য রাজার আদেশ না মেনে সার্জনদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে এক শোভাযাত্রা বার করেন।

সঙ্ঘের বিজ্ঞজনোচিত লাল জমকালো লম্বা পোশাকে বিভূষিত হয়ে চিকিৎসকরা রাজপথে বেরুলেন। সকলের আগে চললেন সঙ্ঘের প্রধান, প্যারিস ফ্যাকাল্টির ডীন। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া, তুষারপাত এবং শিলাবৃষ্টি উপেক্ষা করে গুরুগম্ভীর পায়ে কলেজের দিকে অগ্রসর হলেন। আগে আগে একজন পথপ্রদর্শক চলল। কৌতূহলী জনতা এই দারুণ শীত ও দুর্যোগ উপেক্ষা করে এই শোভাযাত্রার সঙ্গ নিল। বরফ পড়ে চিকিৎসকদের লাল জমকালো পোশাক সাদা হয়ে গেল। কিন্তু এই দুর্যোগ অগ্রাহ্য করে কলেজে পৌঁছে দেখা গেল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ডীন দরজায় ঘা দিলেন, কিন্তু ভেতর থেকে কেউ দরজা খুলল না। চিকিৎসকরা চীৎকার করে দরজা খুলতে বললেন, অভিশাপ দিলেন, না খুললে দরজা ভেঙ্গে ফেলা হবে বলে ভয় দেখালেন। উত্তরে ভিতর থেকে ছাত্ররা ঠাট্টা করে হেসে উঠল, টিটকারি দিল কিন্তু দরজা খুলল না ; সার্জনদের ক্লাশে বসে রইল। দরজার উপর দমাদম ঘা পড়তে লাগল। এমনি সময় শোভাযাত্রার পথপ্রদর্শকটি সিঁড়ির উপর লাফিয়ে উঠে, সার্জনরা চিকিৎসকদের কাছে কি কি বিষয়ে ঋণী, তাই নিয়ে যেই বক্তৃতা শুরু করল, অমনি জনতা হঠাৎ

ক্ষেপে গেল। কে বড় কে ছোট না বুঝে যে চিকিৎসকদের তারা এতদিন ধর্মের মতো নিষ্ঠাভরে শ্রদ্ধা করেছে তাদেরই ওপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে-ধরে তাদের তাড়িয়ে দিল। সার্জনদের জয় হল।

সার্জনরা আরও জাতে উঠলেন যখন অ্যাকাডেমি অফ সার্জারি প্রতিষ্ঠা হল ১৭৩১ সালে। দু-বছর পরে রাজা পঞ্চদশ লুই যেদিন অর্ডিন্যান্স করে বারবার-সার্জন এবং সার্জনদের আলাদা করে দিলেন, উপযুক্ত শিক্ষালাভ না করে সার্জারি করা বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন, সেদিন থেকেই ফরাসী সার্জনরা স্বাধীনতা পেলেন, এবং চিকিৎসকদের সমপর্যায়ে উঠে গেলেন। এখন থেকে সার্জনরাও চিকিৎসকদের মতো বিজ্ঞানী বলে স্বীকৃত হলেন।

কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে সার্জনরা তখনও নাপিতদের সঙ্গে বাঁধা। এডিনবরায় এ বাঁধন ছিন্ন হয় ১৬৯৫ সালে, আর ইংলণ্ডে ১৭৪৫ সালে। বারবার কোম্পানী থেকে আলাদা হয়ে লণ্ডনে রয়াল কলেজ অফ সার্জনস্ প্রতিষ্ঠা হয় ১৮০০ সালে।

কিন্তু এডিনবরায় তখন সার্জারির চেয়ে অ্যানাটমির প্রতিই ঝোঁক ছিল বেশী। আর ইংলণ্ডেও সার্জারি তেমন কিছু ছিল না। সার্জারি তখন সমগ্র ইওরোপে শুধু প্যারিসেই ঠিকমত শেখা যেত। ইংলণ্ডের যা কিছু অপারেশন সবই ছিল ফরাসী পদ্ধতির রকমফের।

এমনি সময়ে জন হাণ্টার লণ্ডনে এলেন, কুড়ি বৎসর বয়সে, ১৭৪৮ সালে। হাণ্টার জাতে স্কচ। গেঁয়ো অমার্জিত কুৎসিত চেহারা। পড়াশুনার চেয়ে থিয়েটার এবং মদের আড্ডাই তাঁর ভাল লাগত বেশী। যেমন তাঁর চোয়াড়ে চেহারা, তেমনি রুক্ষ মেজাজ, তেমনি তিনি ঠোঁট-কাটা। রূঢ় অপ্রিয় কঠিন সত্য মুখের উপর বলে দিতে একটুও তাঁর বাধত না।

এই জেদী হাণ্টারকে তাঁর দাদা উইলিআম হাতে নিলেন। উইলিআম হাণ্টারের তখন লণ্ডনে বেশ ভাল প্র্যাকটিস। তাঁর মার্জিত রুচি, সুন্দর চেহারা এবং মিষ্টি ব্যবহার; তার উপর তিনি অবিবাহিত। দেখতে দেখতে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। প্র্যাকটিস ছাড়া বাড়িতেও তিনি ছাত্র পড়াতেন; অ্যানাটমি, সার্জারি এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধার প্রণালী নিয়ে লেকচার দিতেন।

এই ক্লাসে তিনি জন হাণ্টারকে ভর্তি করে নিলেন; নিজে হাতে শব-ব্যবচ্ছেদ করা শেখালেন; এইখানে এসে এতদিন পরে জন হাণ্টার যেন

নিজেকে খুঁজে পেলেন। এই কাজ তাঁর এত বেশী ভাল লাগল যে মাত্র বছরখানেক শিক্ষানবিশী করেই তিনি এই বিদ্যায় বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠলেন।

উইলিআম হাণ্টার ভাইয়ের কাজে খুব খুশি হলেন। শব-ব্যবচ্ছেদে এই দক্ষতা এবং অ্যানাটমিতে এত স্বল্পকালে এই অদ্ভুত জ্ঞান দেখে একবছর পরেই জন হাণ্টারকে তাঁর নিজের ছাত্রদের পড়াবার সুযোগ দিলেন। এক বছরের মধ্যেই জন হাণ্টার অ্যানাটমির শিক্ষক হয়ে গেলেন এবং নিজে শব-ব্যবচ্ছেদ করে ছাত্রদের শেখাতে শুরু করলেন।

ছাত্রদের অ্যানাটমি শেখাবার পর তিনি নিজে বিশ্রাম না নিয়ে সার্জারি শিখতে যেতেন চেসেল্‌ডেন এবং পটের কাছে। চেসেল্‌ডেন ছিলেন সেণ্ট টমাসেস হাসপাতালে আর পট সেণ্ট বার্থলোমিউতে। এঁরাই ছিলেন তখনকার দিনে লণ্ডনের প্রথম শ্রেণীর ক্লিনিক্যাল সার্জন।

সার্জারি শিখে নিজের অ্যানাটমি ও শব-ব্যবচ্ছেদের ক্লাস তাঁর এক ছাত্রের হাতে দিয়ে জন হাণ্টার স্টাফসার্জন হয়ে একবার যুদ্ধক্ষেত্রে যান। সেখানে গিয়ে আঘাতজনিত ক্ষত, বিশেষ করে বন্দুকের গুলিতে ক্ষত সম্বন্ধে তাঁর নতুন এক অভিজ্ঞতা হল।

ফিরে এসে তিনি লণ্ডনে সার্জারি প্র্যাকটিস শুরু করলেন। অ্যানাটমিব ক্লাস তো তাঁর ছিলই। দেখতে দেখতে তাঁর প্র্যাকটিস খুব জমে উঠল এবং শিক্ষক হিসাবে খুব নাম হল।

গতানুগতিক পথে চলা হাণ্টারের স্বভাব ছিল না। তাঁর আগেকার সার্জারি ছিল শুধু কাটা ছেঁড়া জোড়া দেওয়া। আঘাতে অথবা রোগে দেহের কি পরিবর্তন হয় এবং কেমন করেই বা দেহ সেই আঘাত বা রোগ প্রতিরোধ করে এবং কি করেই বা সেই ক্ষত ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় সে সব দিকে সার্জনদের কোনো নজর ছিল না তখন। হাণ্টার এইদিকে মন দিলেন এবং নিজে হাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন।

এই কারণে সমসাময়িক অনেক বিজ্ঞানীর কাছে তাঁকে ঘা খেতে হয়েছে। কোনো শিক্ষায়তনে তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো সুযোগ দেওয়া হয় নি। স্পষ্টই বলে দেওয়া হয়েছে, সার্জনদের এসব করবার কোনো অধিকার নেই। এসব কঠিন কাজের অধিকারী শুধু বিজ্ঞানীরা, সার্জনরা নয়।

ঘা খেয়ে হাণ্টারের জেদ আরও যেন বেড়ে গেল। তিনি তাই নিজের বাড়িতেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। শীতকালে গিরগিটি ধরে নিয়ে এসে

ঠাণ্ডা ঘরে রেখে তার গলার ভিতর দিয়ে মাংসের টুকরো ঢুকিয়ে দেখলেন, সে মাংস হজম হয় না। বুঝলেন, যেসব প্রাণী শীতকালে না খেয়ে মাটির নিচে আত্মগোপন করে থাকে তাদের হজমশক্তিও তখন বন্ধ থাকে।

অপারেশনের পর দেহের অসুস্থ অংশ আগেকার সার্জনদের মতো ফেলে না দিয়ে তিনি স্পিরিটে ডুবিয়ে কাঁচের বৈয়মে রেখে দিলেন। শবদেহ থেকে মৃতের রুগ্ন অন্ত্রের যন্ত্র যেমন ফুসফুস, পাকস্থলী ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করতে লাগলেন।

হাণ্টার নিজে যেমন কঠোর পরিশ্রম করতেন, তাঁর ছাত্রদেরও ঠিক তেমনি খাটাতেন। তাদেব দিয়ে এইসব নমুনা (স্পেসিমেন) তৈরি করাতেন। তারপর কাঁচের বৈয়মে ভর্তি করিয়ে রেখে দিতেন।

দেখতে দেখতে তাঁব এই সংগ্রহ বিচিত্র এক সংগ্রহশালায় পরিণত হল। ছোট্ট দেড হাত বামনেব কঙ্কাল থেকে বিরাট দৈত্যকায় সাত ফুট ছ-ইঞ্চি মানুষের কঙ্কাল যোগাড হল। এইসব নমুনা সংগ্রহে তাঁর যেমন বিপুল অর্থব্যয় হত, তেমনি লাগত প্রচুর শ্রম এবং সময়। তাঁর প্রিয় ছাত্ররা, যারা পাশ কবে গ্রামে গিয়ে প্র্যাকটিস করত, তাঁদের তিনি জীববিদ্যার গ্রাম্যকর্মী এবং সংগ্রাহক বলেই মনে করতেন। চিঠি লিগে তাগাদা করে তাঁদের দিয়ে কাজ আদায় করতেন এবং নমুনা সংগ্রহ করতেন।

জন হাণ্টারের এমনি এক ছাত্র ছিলেন, এডওআর্ড জেনার। ইনিই পরে বসন্তের প্রতিবিধান টিকা আবিষ্কার করে বিখ্যাত হন। হাণ্টার চিঠি লিখে প্রায়ই জেনারকে তাগাদা দিতেন এবং এটা ওটা পাঠাতে লিখতেন। একবার লিখলেন, গোটাকয়েক সজারু ধরে পাঠাও। বিশেষ প্রয়োজন।

জেনার নম্র প্রকৃতির লোক, হাণ্টারকে খুব ভয় করতেন। তাড়াতাড়ি তিনি তাই জঙ্গলে গিয়ে সজারু ধরার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। এই জীবরা এত বেশী ধূর্ত যে জেনারের সব ফন্দি-ফিকির পণ্ড করে ফসকে পালিয়ে গেল।

এই কথা হাণ্টারকে লিখতেই পরের ডাকে উত্তর এল। দেখা গেল, হাণ্টার লিখেছেন, তোমার সজারুরা কি এতই বেশী চটপটে যে, আমি নিজে না গেলে আসবে না? ওদের আরও একটু ফোসলাও। তারপর দেখো আনা যায় কিনা।

এমনি করে হাণ্টার নিজের বাড়িতে যে বিরাট সংগ্রহশালা তৈরি করলেন,

তার নাম হাণ্টারিয়ান সার্জিক্যাল মিউজিয়ম। এই সংগ্রহশালায় না ছিল হেন জিনিস নেই। প্রাণীবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানে প্রাণের প্রথম নিদর্শন থেকে সর্বোচ্চ প্রকাশ পর্যন্ত তিনি সংগ্রহ করে গেছেন। এডওআর্ড জেনার, স্যার অ্যাসটলী কুপার, অ্যাবারনেথী, ক্লাইন ইত্যাদি কৃতী ছাত্রদের সাহায্যে জন হাণ্টার তেরো হাজারের উপর বিচিত্র নমুনা তাঁর সংগ্রহশালায় রেখে গেছেন।

এই সংগ্রহশালা থেকেই জীবজগতের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। রোগে এবং আঘাতে দেহের কি পরিবর্তন হয় তা তিনি শিখতে পেরেছেন। অনেক কঠিন সমস্যা এই বিচিত্র নমুনা থেকে তিনি নিজেই শুধু সমাধান করে যান নি পরবর্তী যুগের সমস্যাকেও চোখের সামনে তুলে রেখে গেছেন। এই বিরাট সংগ্রহশালার আদর্শ থেকেই পরে অন্য সব বিভিন্ন মিউজিয়মের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু তখনকার দিনে এই সংগ্রহশালার মূল্য কেউ বোঝে নি। এই সংগ্রহশালা যে একটা বিরাট জাতীয় সম্পদ হতে পারে সে জ্ঞানও কারো হয় নি। পার্লামেণ্টে জন হাণ্টারের এই সার্জিকাল মিউজিয়ম জাতীয় সম্পত্তি করবার এক প্রশ্ন ওঠে। ঝানু প্রধানমন্ত্রী পিট্ ব্যঙ্গভরে সগর্বে উত্তর দেন, বটে? কতকগুলো কঙ্কাল, পোকা-মাকড়, মৃতদেহেব আস্তর যন্ত্র এইসব আজেবাজে জিনিস কিনতে হবে? পয়সা দিয়ে? আমার বলে বারুদ কেনবারই টাকা জুটছে না!

তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীরাও এ সংগ্রহশালার মর্যাদা দেওয়া তো দূরের কথা, এর ওপর শুধু ঘৃণা এবং শ্লেষের বিষ ছড়িয়ে গেছেন। বলেছেন, জন হাণ্টারের মিউজিয়ম? সে তো শুধু শূকরছানারই বিচরণের উপযুক্ত স্থান।

কিন্তু তাঁর পরবর্তী যুগ একবাক্যে ঘোষণা করেছে, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার স্থান ওষুধের দোকান নয়; সে স্থান হাণ্টারের সার্জিকাল মিউজিয়ম।

জন হাণ্টারের আগে সার্জারি শুধু মাত্র কাটা ছেঁড়া জোড়া দেওয়ার সামান্য একটা হাতের কাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তিনি এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে একে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাবিধির অন্যতম শাখারূপে উন্নত করে তুললেন। হাণ্টারের হাতে সার্জারি এই প্রথম প্রাণীবিদ্যা ও রোগ-বিদ্যার সঙ্গে শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়ল।

নিজের মিউজিয়মের বাইরে রিচমণ্ড পার্কে এবার তিনি হরিণের উপর

পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক সুযোগ পেয়ে গেলেন। স্তন্যপায়ী জীবদের মাথার উপর যে ধমনী দিয়ে রক্ত যায় তার নাম এক্স্‌টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি। হরিণের মাথার শিঙ এই ধমনী থেকেই পুষ্টি নেয় এবং ক্রমশঃ বড় হয়। গলার দুদিক থেকে এই ধমনী দুটি ওঠে, গালে মুখে মাথায় রক্ত বয়ে নিয়ে যায়। একদিন হান্টার রিচমণ্ড পার্কে গিয়ে ছোট্ট এক হরিণশাবক ধরে তার গলার একদিকে এই ক্যারোটিড আর্টারী বার করে সুতো দিয়ে বেঁধে দিলেন। দেখতে দেখতে শাবকটির মাথার উপর একদিকের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সেইদিকের সন্থ গজানো শিঙটিও হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হান্টার তাই প্রত্যাশা করেছিলেন, কাজেই বিচলিত হলেন না।

সপ্তাহ দুই পরে, গলার সেই ক্ষত শুকিয়ে যাবার পর, হান্টার আবার একদিন রিচমণ্ড পার্কে গেলেন। গিয়ে দেখেন, হরিণশাবকটি দিব্যি আছে, খেলছে, ছুটোছুটি করছে। মাথার শিঙটিও বেশ বাড়ছে। হাত দিয়ে দেখলেন শিঙটি আর আগের মত ঠাণ্ডা নেই, অপর দিকটির মতই বেশ গরম।

হান্টারের মনে এইবার খটকা লাগল। মাথার এইদিকে রক্ত চলাচল শুরু হল কি করে? তাহলে কি যে ধমনী তিনি বেঁধেছেন তা খুলে গেছে? ঠিকমত শক্ত করে বাঁধা হয়নি? কি হয়েছে দেখবার জন্য শাবকটি বধ করে গলা কেটে হান্টার দেখলেন, তাঁর বাঁধন তেমনি অটুট আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! বাঁধনের উপরে এবং নিচে ধমনীর অন্য সব ছোট ছোট শাখা প্রশাখা স্ফীত হয়েছে; গলা বেয়ে মুখে গালে উঠে মাথায় গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে শিঙ-এ রক্ত চলাচল অক্ষুন্ন রেখেছে।

দেখে হান্টার বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। মনে মনে বললেন, ওহো! প্রয়োজনের তাগিদে ছোটরাও তাহলে বড় হয়। ছোট ছোট ধমনীরাও দরকার পড়লে বড় বড় ধমনীদের কাজ চালাতে পারে। আচ্ছা, একথা আমাকে মনে রাখতে হবে।

কয়েক মাস পরে সেণ্ট জর্জেস হাসপাতালে একটি রুগী এল। তার হাঁটুর পেছনে ধমনীতে টিউমার। তখনকার দিনে এ রোগ হলে মৃত্যু নিশ্চিত। হয় টিউমার ফেটে রক্তপাত হয়ে মৃত্যু; নয় অপারেশন করাতে গিয়ে সার্জনের হাতে মৃত্যু। তাই সার্জনরা তখন টিউমারের অনেক উপরে উরু কেটে সমগ্র পাটাই বাদ দিতেন। হান্টারের এ চিকিৎসা মনঃপূত হত না। যে অপারেশনের পর রুগী বিকলাঙ্গ হয় সে অপারেশন হান্টার পছন্দ করতেন না।

রিচমণ্ড পার্কের সেই হরিণশাবকের ধমনী বাঁধার কথা হাণ্টারের মনে পড়ল। ভাবলেন, রুগীর হাঁটুর পেছনকার এই টিউমারটির অনেক উপরে উরুর মাঝখানে যদি ধমনীটা বেঁধে দেওয়া যায় তাহলে কি হয়? এখানেও কি প্রয়োজনের তাগিদে এই বড় ধমনীর শাখা-প্রশাখা স্ফীত হয়ে রুগীর পায়ে রক্ত চলাচল বজায় রাখতে পারবে না?

হাণ্টারের মনে হল, নিশ্চয়ই তা পারবে। তাই তিনি ঐ রুগীর উরু কেটে ধমনী বার করে একদিন বেঁধে দিলেন। দেড় মাসের মধ্যে রুগীর ঐ টিউমার ছোট হয়ে গেল। রুগী নিজের পায়ে হেঁটে বাড়ি গেল। এই অপারেশন সার্জারির ইতিহাসে যুগান্তর এনে দিল। সেইদিন থেকে এই রোগে কারুর পা আর কেটে ফেলতে হয় না। সার্জনের ছুরিতে কিংবা রোগের প্রকোপে কারুর আর মৃত্যু হয় না। উরুর যেখানে হাণ্টার এই ধমনী বার করে বেঁধেছিলেন এখনও তার নাম হাণ্টারিয়ান ক্যানাল।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নিজের দেহের উপর তিনি যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তও খুব কম। নিজের কোনো অসুখ হলে তার চিকিৎসা না করে রোগের প্রকোপ তিনি লক্ষ্য করতেন। দেহে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় তা লিখে রাখতেন। যন্ত্রণায় মুখের ভাবের কি পরিবর্তন হয়, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে পরে তা নোট করে রাখতেন।

সেই সময় যৌনব্যাধি নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে অনেক মতান্তর ছিল। এই ব্যাধি একটি রোগেরই দুটি বিভিন্ন প্রকাশ, না প্রকৃতই দুটি বিভিন্ন রোগ তাই নিয়ে প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হত। একদিন নিজের দেহেই এই রোগ সংক্রামিত করে হাণ্টার এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। সেদিন ১৭৭৬ সাল; মে মাসের এক শুক্রবার।

অচেনা অজানা এক প্রমেহ (গনোরিয়া) রুগীর দেহ থেকে বিষ নিয়ে হাণ্টার নিজের দেহেই সে বিষ সংক্রামিত করলেন আপন পুরুষাঙ্গে। কিন্তু তিনি জানতেন না রুগীটির শুধু প্রমেহই নয়, লুকোনো উপদংশও (সিফিলিস) ছিল। ফলে তাঁর দেহাংশে প্রমেহ এবং উপদংশ দুটি রোগের সব লক্ষণই প্রকাশ পেল। দেখে হাণ্টার নিশ্চিত বুঝলেন, প্রমেহ থেকেও যখন উপদংশ হয় তখন যৌনব্যাধি আসলে এক এবং একই রোগের এই দুই বিভিন্ন প্রকাশ।

নিজের উপর এই সাংঘাতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হাণ্টারের জীবনে মস্ত বড়

এক ট্র্যাজেডি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার এত বড় একজন বিশারদ নিজের উপর এই পরীক্ষায় কেমন নিমেষে সাংঘাতিক বিপথে চালিত হলেন। এই কি প্রকৃতির প্রতিশোধ? না পরিহাস?

উপদংশ রোগের ক্ষত হাণ্টার যেমন বিশদ এবং নিপুণভাবে বর্ণনা করে গেছেন, তার আর জোড়া নেই। আজও সেই ক্ষত হাণ্টারিয়ান শ্যাংকার নামেই প্রচলিত। কিন্তু তাঁর ভুলেরও বুঝি আর জোড়া নেই।

একে তো তিনি বিশ্বাস করতেন, যৌনব্যাধি দুটি আসলে এক। তার উপর তাঁর ধারণা ছিল, জঙ্ঘা ও উরুতে পারদ ঘষে তিনি উপদংশ সারিয়েছেন। হাণ্টার লিখে গেছেন, রোগটাকে আমি পারদ দিয়ে আক্রমণ করলাম; জঙ্ঘা ও উরুতে পারদ ঘষে ঘষে উপদংশ বধ করে দেহ থেকে নির্মূল করলাম। শুনেছি মানুষের আন্তর যন্ত্র যেমন হৃদযন্ত্র ফুসফুস যকৃত ইত্যাদি নাকি উপদংশে আক্রান্ত হয়। অনেকে এসব কথা বলেন বটে। কিন্তু আমি নিজে কখনও তা দেখি নি। কাজেই তা বিশ্বাস করি না।

কিন্তু এই সদম্ভ উক্তির করুণতম পরিণতি হল, যে রোগ হয় না বলে হাণ্টারের বিশ্বাস, সেই রোগেই তিনি আক্রান্ত হলেন। উপদংশ রোগ তাঁর হৃদযন্ত্র আক্রমণ করল।

৩৯ বৎসর বয়সে হাণ্টার নিজ দেহে উপদংশ সংক্রামিত করেন, তারপর যদিও তিনি আরও ছাব্বিশ বছর বেঁচে ছিলেন এবং অসুরের মতো কাজও করে গেছেন, তবু তাঁর শরীর আগের মতো শক্ত সমর্থ আর কখনও হয় নি। কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠলেই তাঁর বুকে ব্যথা উঠত। ডাক্তাররা বলতেন, হৃদরোগ, অ্যান্‌জাইনা পেক্‌টোরিস্। বিশ্রাম দরকার।

কিন্তু বিশ্রাম কে নেবে? বরং বুকে ব্যথা উঠলে হাণ্টার ছুটে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। ব্যথায় মুখের মাংসপেশীর কি বিকৃতি হয় তা লক্ষ্য করতেন। অথচ নিজের শরীর সম্বন্ধে কোনো মিথ্যা আশা তাঁর মনে কখনও ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলতেন, আমার জীবন যে-কোনো বদমায়েসের হাতের মুঠোয়। শয়তানী করে একদিন যদি কেউ আমায় ক্ষেপিয়ে দেয়, কি খুঁচিয়ে উত্যক্ত করে, সেইদিনই আমার শেষ।

একদিন সত্যি তাই হল। তাঁর সমসাময়িক সার্জনরা হাণ্টারের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। সুযোগ পেলেই কটু-মন্তব্য করতে তাঁদের বাধত না। হাণ্টার নিজে ছিলেন নিজের মতে অন্ধবিশ্বাসী। একদিন এক সম্মেলনে

এমনি একজন আলোচনার সুযোগে হাণ্টারের প্রতি কটাক্ষ করে তাঁর প্রতিবাদ করল। হাণ্টারের তা অপমান বলেই বোধ হল। রাগে জ্বলে গেল তাঁর সর্বদেহ। প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু তাঁর রুগ্ন হৃদযন্ত্র এ উত্তেজনা সইতে পারল না। সেই ব্যথাটা আবার টনটন করে উঠল। বুকে হাত দিয়ে তিনি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সে মূর্ছা আর ভাঙল না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই এত বড় একজন তেজী শক্তিমান জেদী পুরুষের মৃত্যু হল।

ইতিহাসে এখন সার্জারির যুগ ভাগ হয় হাণ্টারের নামে। জন হাণ্টারের আগের যুগ এবং পরের যুগ। তাঁর সমসাময়িক একজন নামকরা সার্জনও স্বীকার করেছেন, একা জন হাণ্টারই বিলেতের সার্জনদের ভদ্রলোক বানিয়ে গেছেন। তাঁর আগে সার্জনদের কেউ আর ভদ্রলোক বলত না।

বসন্ত ও জেনার

জন হাণ্টার যেমন সার্জারিতে নতুন যুগ এনেছিলেন, তেমনি তাঁর ছাত্র এডওআর্ড জেনার (১৭৪৯—১৮২৩) রোগ প্রতিবিধানের যুগান্তর এনে দিলেন আঠারো শতকের শেষে হঠাৎ একদিন বসন্তের টিকা আবিষ্কার করে। তারই ফলে আজকাল আর বসন্ত রোগ হয় না সময় মতো টিকা নিলে। পৃথিবীর সব সভ্য দেশে এ রোগটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জেনারের পদ্ধতিতে টিকা নিয়ে।

অথচ আগে কী সাংঘাতিক মহামারীই না হয়েছে ইওরোপে আঠারো শতকের শেষ পযন্ত। একবার এ রোগ শুরু হলে দেশে তখন মড়ক লেগে যেত। প্রাণভয়ে তাই সবাই দেশ ছেড়ে পালাত। পালিয়েও কিন্তু নিষ্কৃতি পেত না কেউ। এই পলাতকদের অগোচরে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে একদিন এ রোগ ফুটে বেরুত। রোগে ভুগে ভাগ্যক্রমে প্রাণে বাঁচলেও এ রোগের চিহ্ন থাকত সারা গায় এবং মুখে।

এই রোগের কোনো জাত বিচার নেই। ধনীর ঘর থেকে অনায়াসে গরীবের ঘরে ঢোকে। আবার বস্তি থেকে রাজপ্রাসাদে। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিআমের সুন্দরী তরুণী স্ত্রী রানী মেরী এই রোগে মারা যান, ১৬৯৪ সালে। রাজা নিজেও আক্রান্ত হন। কিন্তু অনেক কষ্টে বেঁচে ওঠেন, পঙ্গু এবং বিকলাঙ্গ হয়ে। ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুইএরও মৃত্যু হয় এই বসন্ত রোগে।

ইওরোপে যখন এই অবস্থা, প্রাচ্য দেশে তখন কিন্তু এই রোগ এতটা ভীষণ ছিল না। যদিও লোকে বিশ্বাস করত, দেবতার রোষেই মড়ক লাগে, তবু এদেশে এ-রোগের এক প্রতিবিধান ছিল। এ-খবর ইংলণ্ডে পৌছল ১৭১৭ সালে, লেডী মেরী ওরলী মণ্টেগুর চিঠিতে।

লেডী মেরী তখন তুরস্কের বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী। ২৫ বছর মাত্র বয়স। তুরস্ক থেকে তিনি বিলেতের বন্ধুদের সব মজার মজার চিঠি লিখতেন। সুলতানের

হারেমের ঐশ্বর্য ফলাও করে বর্ণনা করতেন। হারেমের স্নানাগার কি সুন্দর, বেগমের গলার মুক্ত কত বড়, সোনার ছুরি দিয়ে কেটে কি করে তিনি পঞ্চাশ রকমের রান্না মাংস বেগমের ঘরে একসঙ্গে বসে খেয়েছেন, এই সব খবরে তাঁর চিঠি ভরা থাকত।

এই লেডী মেরী নতুন এক খবর দিয়ে চিঠি লিখলেন, মিস সারা চিজ্‌ওয়েলকে। ১লা এপ্রিল, ১৭১৭ সালে।

লেডী মেরী লিখলেন, প্রাচ্য দেশ একদিক থেকে ইওরোপের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। বসন্ত রোগ ইংলণ্ডে যেরকম ভয়াবহ, তুরস্কে সেরকম কিছুই নয়। এখানে প্রতি শরৎকালে ভ্রাম্যমান বৃদ্ধারা বাদামের খোসা ভর্তি বসন্তের শুকনো বিষ নিয়ে আসে। মায়েরা ঐ বুড়ীকে পয়সা দিয়ে এই বিষ ছেলেদের গায়ে লাগিয়ে নেয়।

মায়েরা সবাই মিলে একসঙ্গে পনেরো-ষোলো জন বাচ্চা জড়ো করে। এক একজন বুড়ী বাদামের খোসা থেকে একটা ছুঁচের খোঁচায় ঐ বিষ তুলে এক একজন বাচ্চার হাতে অথবা পায়ে আঁচড় কেটে লাগিয়ে দেয়। চার-পাঁচ জায়গায়। তারপর বাদামের শূন্য এক খোসা ঐ ক্ষতের ওপর বসিয়ে বেঁধে দেয়।

এই বাচ্চারা সাত আট দিন বেশ ভাল থাকে। খেলাধূলা করে। ছুটোছুটি করে। তারপর জ্বর হয়। একদিন, দুদিন, কখনো বা তিন দিন শুয়ে থাকে। মুখে দু-তিনটি মাত্র গুটি ওঠে। সাত-আট দিনেই তা শুকিয়ে যায়। পরে খসে পড়ে। কোনও দাগ থাকে না।

হাজার হাজার ছেলেমেয়ের গায়ে প্রতি বৎসর এই বিষ লাগানো হয়। শুধু বুড়ীরাই এই বিষ লাগায় না। গ্রীক এবং টার্কিশ সম্ভ্রান্ত চিকিৎসকরাও এ-কাজ করেন। কারো এতে মৃত্যু হয় না। বসন্ত রোগও এদের জীবনে কখনো হয় না। তাই লেডী মেরী ঠিক করেছেন, নিজের ছেলেকেও এই বিষ লাগিয়ে নেবেন।

কিছুদিন পরে লেডী মেরী তাঁর স্বামীকে লিখলেন, বাচ্চাটাকে গত বৃহস্পতিবার এই বিষ লাগানো হয়েছে। আজ রবিবার। বাচ্চাটা খেলছে। গান গাইছে। এখন রাত্রের খাবারের জন্যে বায়না ধরেছে।

লেডী মেরীর অল্প বয়সে একবার বসন্ত হয়। নিজে প্রাণে বাঁচলেও তাঁর আঁখিপক্ষ্ম সব উঠে যায়। কিন্তু তাঁর মার যখন এ-রোগ হল, তিনি আর

বাঁচলেন না। তাই লেডী মেরী এ-রোগের এই প্রতিবিধান দেখে চুপ করে থাকতে পারলেন না। নিজের দেশে এ-প্রথা চালাবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন।

তুরস্কের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে ইংলণ্ডের চেনা-জানা সবারই কাছে লেডী মেরী চিঠি লিখতে লাগলেন। দেশে ফিরে বন্ধুদের কাছে গল্প করলেন। ডাক্তারদের কাছে গিয়ে গিয়ে তর্ক করলেন, অনুরোধ করলেন। শেষকালে খোঁচাতে শুরু করলেন। স্ত্রীলোকের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় অবশেষে একদিন এ-প্রথা চালু হয়ে গেল। লণ্ডনে ফেরার পাঁচ বছরের মধ্যেই লেডী মেরীর এ-অভিনব প্রথা এক চলতি ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেল।

আসলে এই প্রথা অতটা অভিনব ছিল না। টিমনি নামে এক গ্রীক ডাক্তার অক্সফোর্ডের এম ডি, কয়েক বছর আগেই রয়েল সোসাইটিতে এ নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু চিকিৎসার নতুন কোনো পন্থা দেখলেই ডাক্তাররা প্রথমে থাকে সন্দিগ্ধ। খামোখা কেমন যেন খুঁতখুঁত করে। সাধারণ অজ্ঞ লোকের মতো আত্মবিশ্বাস তাঁদের কখনো থাকে না।

লেডী মেরীর চেষ্টায় রাজা প্রথম জর্জ নিউগেট জেলে এটা পরীক্ষা করতে রাজী হলেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত তিনজন পুরুষ এবং তিনজন রমণীকে বলা হল, যদি তারা পরীক্ষায় সম্মতি দেয়, তাহলে তারা মুক্তি পাবে। কয়েদীরা সহজেই রাজী হল। ডাক্তারদের সামনে কয়েদীদের দুই বাহু ও ডান পায়ে বসন্তের বিষ ছুঁচ দিয়ে আঁচড়ে লাগানো হল। কয়েদীদের ভাগ্য ভাল। কারুরই ষাটটির বেশি গুটি বেরুল না। সবাই বেঁচে গেল।

রাজা জর্জ ঠিক করলেন, প্রিন্সেস অব ওয়েলসের দুই সন্তানকে এই ইনঅকুলেশন দেবেন। তার আগে ছজন ভিখারীর সন্তান এবং পাঁচজন হাসপাতালের শিশুর উপর পরীক্ষা করা হল। কিন্তু ডাক্তাররা এটা ভাল মনে করলেন না। রাজ-চিকিৎসক স্যার হানস্ স্লোন রাজাকে সতর্ক করে বললেন, কাজটা ভাল হচ্ছে না। শেষে হয়ত বিপদ হবে।

কিন্তু রাজা তা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, রক্তমোক্ষণেও লোকের বিপদ হয়। ওষুধ খেলেও হয়। ডাক্তারের হাতেও লোকের মৃত্যু হয়।

স্যার হানস্ বিদায় নিলেন। রাজকন্যা দুটিকে এই ইনঅকুলেশনের জন্য প্রস্তুত করা শুরু হল। এদের একজনের বয়েস নয়, আর একজনের এগারো। বেচারাদের খাওয়া কমিয়ে জোলাপ দেওয়া হল। মাঝে মাঝে শিরা কেটে

রক্তমোক্ষণও করা হল। দেড় মাস ধরে এমনি করে নির্জীব এবং কাহিল করে ঠিক হল, এদের রক্ত এখন বসন্তের বিষ গ্রহণ করতে সক্ষম। যথারীতি এদের ইনঅকুলেশন দেওয়া হল।

রাজপ্রাসাদের এই ঘটনার পর আভিজাত মহলে এই ইনঅকুলেশন নেবার হিড়িক পড়ে গেল। এতদিনে লেডী মেরীর চেষ্টা সফল হল। ইনঅকুলেশন বসন্ত রোগের একমাত্র প্রতিবিধান বলে স্বীকৃত হল।

আসলে এ কিন্তু মোটেই কোনো প্রতিবিধান নয়। স্বাভাবিকভাবে না হয়ে নিজের ইচ্ছায় দেহে বসন্ত রোগ সংক্রামিত করা। ইনঅকুলেশনের গুটি এবং বসন্তের গুটি সমান ছোঁয়াচে। তফাত শুধু এই যে স্বাভাবিকভাবে এ-রোগ হলে রোগের প্রকোপ হয় ভীষণ। একশ জনের মধ্যে দশ থেকে পঁচাত্তর জনের মৃত্যু হয়। যাঁরা বাঁচেন, তাঁদের মুখে গায়ে দাগ থাকে। কেউ হয়ত অন্ধ হয়।

নিজের ইচ্ছায় ইনঅকুলেশন নিলে গুটির দাগ থাকে না। একশ জনের মধ্যে এক থেকে তিনজনের বেশি মৃত্যু হয় না। কিন্তু ইনঅকুলেশন এবং বসন্ত রোগ সমান ছোঁয়াচে। যার ইনঅকুলেশন হচ্ছে, তার থেকেও অন্যের বসন্ত রোগ হতে পারে। তাই এই ইনঅকুলেশন ক্রমশঃ বসন্ত রোগ ছড়াতে লাগল। রাশিয়ায় প্রতি সাতজনের মধ্যে একটি শিশুর বসন্তে মৃত্যু হতে শুরু হল। ফ্রান্সে রিভলিউশনের আগেই ইনঅকুলেশন বেআইনী বলে ঘোষিত হল।

আমেরিকায় ১৭২১।১৭২২ সালের বসন্তের এপিডেমিকেব সময় বোসটনে ডাঃ বয়েলস্টোন ২৪৭ জন লোককে ইনঅকুলেশন দিয়েছিলেন। ৩৯ জন অন্য ডাক্তারদের কাছে নিয়েছিল। এদের মধ্যে ছজন মারা যায়। ঐ সময়ে বোসটনের প্রায় অর্ধেক লোক, ৫৭৫৯ জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। ৮৪৪ জনের মৃত্যু হয়। যারা বেঁচে ওঠে, তাদের অনেকেরই স্বাস্থ্য ভেঙে যায় এবং গায়ে মুখে দাগ থাকে।

কিন্তু যেই এপিডেমিক বন্ধ হল, অমনি ইনঅকুলেশন নিয়ে সাংঘাতিক বাদানুবাদ শুরু হল। ডাক্তাররাও সবাই ডাঃ বয়েসস্টোনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। পাদ্রীরা বেদী থেকে এবং সম্পাদকরা খবরের কাগজের মাধ্যমে ইনঅকুলেশনের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, ইনঅকুলেশনে যদি কারুর মৃত্যু হয়, তাহলে যে ডাক্তার ইনঅকুলেশন দিয়েছে, তার ফাঁসি হওয়া উচিত।

ডাঃ বয়েলস্টোনের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। যে-ঘরে মিসেস

বয়েলস্টোন ছিলেন, সে-ঘরে বোমা পড়ল। রাস্তায় ধরে জনতা ডাঃ বয়েলস্টোনকে প্রহার দিল। আইন পাশ হয়ে গেল, ইনঅকুলেশন যে দেবে, তার শাস্তি হবে।

AN

INQUIRY

INTO

THE CAUSES AND EFFECTS

OF

THE VARIOLÆ VACCINÆ,

A DISEASE

DISCOVERED IN SOME OF THE WESTERN COUNTIES OF ENGLAND,

PARTICULARLY

GLOUCESTERSHIRE,

AND KNOWN BY THE NAME OF

THE COW POX.

BY EDWARD JENNER, M.D. F.R.S. &c.

——QUID NOBIS CERTIUS IPSIS
SENSIBUS ESSE POTEST, QUO VERA AC FALSA NOTEMUS.

LUCRETIUS.

London:
PRINTED, FOR THE AUTHOR,
BY SAMPSON LOW, N°. 7, BERWICK STREET, SOHO:
AND SOLD BY LAW, AVE-MARIA LANE; AND MURRAY AND HIGHLEY, FLEET STREET.

1798.

জেনারের প্রথম বই 'গো-বসন্তের কারণ এবং পরিণাম অনুসন্ধান'-এর প্রচ্ছদ

ইংলণ্ডে কিন্তু এ-প্রথা গেল না। অনেকদিন টিকল। জেনারের আবিষ্কারের অনেক পরে অবশেষে একদিন নিষিদ্ধ হল। লেডী মেরী মণ্টেগু এই ইনঅকুলেশন অমন করে চালু করে না দিলে বসন্ত রোগের সত্যিকার প্রতিবিধান এডওআর্ড জেনার কখনো হয়ত অত দ্রুত বার করতে পারতেন না।

এডওআর্ড জেনার ইংলণ্ডের পশ্চিমে গ্লুচেস্টারশায়ারের ছোট্ট বার্কলী শহরের এক গ্রাম্য ডাক্তার। লণ্ডনের মস্ত বড সার্জন এবং আনাটমির শিক্ষক জন হাণ্টারের এক ছাত্র। জেনারকে হাণ্টার খুব ভালোবাসতেন। কাজেই জেনার অনায়াসে লণ্ডনে থেকে হাণ্টারের সঙ্গে প্র্যাকটিস করে নাম করতে পারতেন। কিন্তু জেনারের নিজের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। জবরদস্ত হাণ্টারকে তিনি ভয় করতেন। লণ্ডনের ফ্যাশানেবল প্র্যাকটিস তাঁর ধাতে সইল না। এমন কি ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজে সারা পৃথিবী ঘোরার এক লোভনীয় চাকরিও তিনি ছেড়ে দিলেন। গাঁয়ে ফিরে নিজের জন্মস্থান বার্কলী শহরে ডাক্তারি শুরু করলেন। ২৫ বছর কেটে গেল। তবু তিনি বার্কলী থেকে নডলেন না।

অনেকের ধারণা, ২৫ বছর ধরে ভেবেচিন্তে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবে বুঝি জেনার বসন্তের টিকা আবিষ্কাব করেছেন। এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক অনেক আবিষ্কারই বৈজ্ঞানিক পন্থা ঠিক ঠিক অনুসরণ করে আবিষ্কার হয়নি। জেনারের আবিষ্কারও সে-পথে হয়নি।

গ্রামের এক স্ত্রীলোক জেনারকে একদিন বলেছিল, আমাব কখনো বসন্ত হবে না। কারণ আমার গো-বসন্ত হয়ে গেছে।

জেনার তখন ছাত্র। ডাক্তাবী পডেন।

২৫ বছর ধরে জেনার ডাক্তারি করেছেন, কিন্তু এ নিয়ে আর মাথা ঘামান নি কখনও। কারণ ডাক্তারি কবা ছাডা জেনাবের অন্য এক নেশা ছিল। সে-নেশা জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ ও ফুলফলেব নেশা। এদের আচাবব্যবহাব লক্ষ্য করা।

কোকিলের ডিম থেকে কি করে বাচ্চা ফোটে এবং সেই বাচ্চাবা পরস্পর কি রকম ব্যবহাব করে, তাই দেখে জেনার দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারতেন। মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে পারতেন। ১৭৮৭ সালে এই নিয়ে তিনি এক প্রবন্ধ লেখেন। জন হাণ্টার সে প্রবন্ধ রয়েল সোসাইটিতে পাঠ করেন।

জেনারের বয়স যখন প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, তখন হঠাৎ একদিন তাঁর মনে পডল, জন হাণ্টার বলতেন, শুধু শুধু ভেবো না। তাতে কোনো লাভ নেই। নিজের হাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর।

লেডী মেরীর ইনঅকুলেশন প্রথা তখন বসন্ত রোগের একমাত্র প্রতিবিধান

বলে স্বীকৃত। তাই অন্য সব চিকিৎসকের মতো ইনঅকুলেশন দিতে জেনারেরও মাঝে মাঝে ডাক পড়ত।

জেনার দেখতেন, ইনঅকুলেশন দিলে সবার হাতেই গুটি ওঠে না। কৃষকরা বলত, ওর বসন্ত হবে না। কারণ একবার ওর গো-বসন্ত হয়ে গেছে।

ছেলেবেলা থেকেই জেনার একথা শুনে আসছেন। কিন্তু কি করে তা সম্ভব কখনো ভেবে দেখেন নি।

গো-বসন্ত গোরুর দেহে চামড়ার উপর ছোট ছোট গুটি নিয়ে উঠত। মেয়ে এবং পুরুষ যারা গোরুর পরিচর্যা করত, তাদের হাতেও এরকম গুটি কখনো কখনো হত। কিন্তু তারা অসুস্থ কখনো হত না। কয়েকদিন পরেই গুটি শুকিয়ে খসে পড়ত। সবাই বলত, এদের আর বসন্ত রোগ ধরবে না।

১৭৯৬ সালে জেনারের গ্রামে গ্লুচেস্টারশায়ারের এক ফার্মের গোশালায় গো-বসন্ত হল। তাই থেকে গোশালার এক গয়লানী সারা নেলমেসের এ-রোগ ধরল। হাতে কয়েকটা গুটি বেরুল।

জেনার তাঁর ছেলেকে দিয়ে গয়লানী সারার গুটিসুদ্ধ হাতের এক ছবি আঁকালেন। পরে কবিত্ব করে গুটির বর্ণনা দিলেন, এ দেখতে ঠিক গোলাপ পাপড়ির ওপর মুক্তোর মতো।

সেদিন ১৪ই মে, ১৭৯৬। জেনার এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। জন হাণ্টারের সার্জিক্যাল মিউজিয়মে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার এই ২৫ বছর পরে নিজের হাতে এক দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেণ্ট করে ফেললেন।

গয়লানী সারার হাতের নরম মুক্তোর মতো ঐ গুটি ছুরি দিয়ে ছেঁদা করে তার ঘোলাটে রস হাঁসের পালকের দাড় কেটে তার মুখে ধরলেন। তারপর জেমস ফিপস বলে এক কিশোর ছেলের বাহুতে আঁচড় কেটে সাহস করে ঐ ঘোলাটে রস মাখিয়ে দিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই ফিপসের বাহুতে ছোট্ট একটি গুটি উঠল। গো-বসন্তের গুটি শুধু ঐ একটি জায়গাতেই উঠল। কয়েকদিন পর সেটি শুকিয়ে গেল এবং ছোট্ট একটি দাগ রইল।

জেনার অপেক্ষা করলেন। একটি মাস কেটে গেল। জেনার ফিপসের বাহুতে আবার একটা আঁচড় কাটলেন। এইবার বসন্ত রোগীর গুটি থেকে

পুঁজ নিয়ে ঐ আঁচড়ের উপর ঘষে ইনঅকুলেশন করা হল। কিন্তু ফিপসের কোনো অসুখ হল না। কোথাও কোনো গুটি বেরুল না। কয়েক মাস পরে জেনার আবার ওকে ইনঅকুলেশন দিলেন। এবারও ওর বসন্ত ধরল না। জেনার বুঝলেন, গাঁয়ের মেয়েরা যা বলত, তা ঠিক। গো-বসন্ত আসল বসন্ত থেকে রক্ষা করে।

জেনার নিজের পরীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ লিখে ফেললেন এবং রয়েল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করবার জন্যে পাঠালেন। কিন্তু তাঁর লেখা ফেরত এল। রয়েল সোসাইটির মেম্বাররা এ-তথ্য মানলেন না। বললেন, ছেলেটার যে বসন্ত হয়নি, সে নেহাতই তার ভাগ্য।

জন হাণ্টার কিন্তু জেনারকে খুব উৎসাহ দিলেন। বললেন, তুমি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর। তোমার তথ্য প্রমাণ কর।

কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ-তথ্য প্রমাণ করা জেনারের ভাগ্যে ঘটল না। চিরাচরিত প্রথা যে মানে না, শতাব্দীর শান্তি বিক্ষুব্ধ করে যে লোক দুঃসাহসী অভিযানে বার হয়, ভাগ্য তার প্রতি সহজে অনুকূল হয় না। এই নির্বিরোধ শান্ত লোকটির প্রতিও প্রকৃতি যেন শত্রুতা শুরু করল। যে গো-বসন্তের উপর নির্ভর করে জেনার তাঁর পরীক্ষা চালাবেন ভাবলেন, হঠাৎ তা গাঁ থেকে উঠে গেল। অনেক খুঁজেও জেনার গো-বসন্ত আর পেলেন না। জেনারের পরীক্ষা আপাতত বন্ধ হয়ে গেল।

দু বছরের চেষ্টায় জেনার মাত্র সাতটি লোকের উপর গো-বসন্তের টিকা দিয়ে পরীক্ষা করতে পারলেন। ফল সবটাতেই এক হল। গো-বসন্ত বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করল।

১৭৯৮ সালে জেনার ছোট্ট একটি পুস্তিকা বার করলেন। নাম দিলেন, "গো-বসন্তের কারণ এবং পরিণাম অনুসন্ধান" (অ্যান ইনকোয়ারী ইনটু দি কজেজ অ্যাণ্ড এফেক্টস অফ ভ্যারিওলা ভ্যাকসিনি)। মাত্র ৭৫ পৃষ্ঠায় ২৩টি গো-বসন্তের বিবরণ।

এই ২৩টির মধ্যে ১৬টির রোগ হয় গোরু থেকে। বাকী সাতটি জেনারের টিকে দিয়ে করা। লেডী মেরীর ইনঅকুলেশন এই সব কটিতেই নিষ্ফল হয়েছে। এই সামান্য তথ্যের পুঁজি নিয়ে গো-বসন্তের টিকা দিয়ে বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করবার দুঃসাহসিক অভিযানে জেনার বেরিয়ে পড়লেন।

কয়েক কপি ঐ 'এনকোয়ারী' পকেটে নিয়ে জেনার সস্ত্রীক লণ্ডনে গেলেন।

কিন্তু আড়াই মাসের দিনরাত চেষ্টা বিফল হল। একটি লোকও টিকা নিতে রাজী হল না। মনের দুঃখে নিরুৎসাহ ও বিরক্ত হয়ে জেনার ঘরে ফিরে এলেন।

হাঁসেব পালকের এক দাড় ভতি গো-বসন্তের বীজ জেনার লণ্ডনে ফেলে রেখে এসেছিলেন। তাই থেকে ক্লাইন নামে এক সার্জন একটি ছেলের হাতে টিকা দেন। ছেলেটি পরে বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করে। তাই দেখে ক্লাইন জেনারকে তাড়াতাড়ি লণ্ডনে ফিরে আসতে লেখেন। বলেন, এখানে এসে গ্রোভনার স্কোয়ারে বাসা নিয়ে যদি আপনি এখন প্র্যাকটিস শুরু করেন, তাহলে বছরে দশ হাজার পাউণ্ড আপনার বাঁধা।

নিজের গাঁ থেকে জেনার উত্তর দিলেন, যেখানে তিনি আছেন, তাতেই তিনি খুশি। টাকাও যা পান, তাতেই তাঁর চলে যায়। তাছাড়া যশ? সে তো শুধু অপরের অনিষ্টকারী বিষাক্ত তীর দিয়ে চকচকে এক লক্ষ্যভেদ করা।

জেনারের সেই ছোট্ট পুস্তিকা এবার কাজ শুরু করল। জেনার দেখলেন, টিকার যারা বিরোধী, তাদের থেকে কোন ভয় নেই। কিন্তু টিকা যারা দেয়, অথচ ঠিক নিয়মমত দেয় না, তাদের নিয়েই মুশকিল।

লণ্ডনের উডভিল নামে এক ডাক্তার জেনারের ঐ বই হাতে করে গ্রেস ইন লেনের এক ডেয়ারীতে একদিন হাজির হলেন। বই-এর ছবি দেখে মিলিয়ে ঠিক করলেন কয়েকটি গোরুর বসন্ত হয়েছে। তাই থেকে বীজ নিয়ে হাসপাতালের ছটি ছেলেকে তিনি টিকা দিলেন। টিকার গুণ প্রমাণের জন্য টিকা ওঠবার আগেই তিন দিনের মধ্যে আবার এদের ইনঅকুলেশন দিলেন।

তার ফল হল সাংঘাতিক। গো-বসন্ত এবং আসল বসন্ত কসঙ্গে মিশে গেল।

জেনার দেখলেন ডাঃ উডভিল তাঁর কাজ সব ট পাকিয়ে দিচ্ছেন। টিকার বীজ নিজের খুশিমত লাগাচ্ছেন এবং কৌশলে নিজের নাম জাহির করবার এক ফন্দি বার করেছেন।

তাড়াতাড়ি তিনি আবার লণ্ডনে এলেন এবং নরফোক ষ্ট্রীটে একটা বাড়ি নিলেন। কিন্তু বেশিদিন টিকতে পারলেন না। দেখলেন, ডাঃ উডভিলের মত চতুর লোককে নিজের মতে চালানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কাজেই আবার তিনি বার্কলীতে ফিরে এলেন।

জেনার বুঝেছিলেন, গো-বসন্ত এবং আসল বসন্ত একই পরিবারের দুটি

বিভিন্ন শাখা। একটি অপরটিকে প্রতিরোধ করে। যদি ঠিকমত গো-বসন্তের বীজ সংগ্রহ করা যায়, তাহলে টিকা দিলে ফল হবেই। জেনারের এ বিশ্বাস কখনও শিথিল হয়নি। তাই নিজে যখন তিনি টিকা দিতেন, মনে কোন সংশয় থাকত না। ফল ঠিক আশানুরূপ হত।

তাঁর গ্রামে ৩২৬ জনকে তিনি টিকা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৭৩ জনকে যখন পরে ইনঅকুলেশন দেওয়া হল, সবাই বেশ সুস্থ রইল। সকলেরই ইনঅকুলেশন নিষ্ফল হল। তাই নিজের উপর তাঁর যথেষ্ট ভরসা। কিন্তু ডাঃ উডভিলের মত অতিচালাক লোকদের উপর সতর্ক নজর তিনি রাখবেন কি করে?

জেনার আবার লণ্ডনে এলেন। তখন ১৮০০ সাল। নদীর ধারে ফ্যাশানেবল পাড়ায় তিনি এক বাড়ি নিলেন অ্যাডাম ষ্ট্রীটে।

ডাঃ উডভিল এবং তাঁর বন্ধু পিয়ার্সন তখন জেনারের আবিষ্কার দিয়ে প্রভূত বিত্তশালী হবার বিরাট এক পরিকল্পনা খাড়া করেছেন।

ইংলণ্ডে কোনো এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে সকলের আগে চাই বড় বড় নামকরা লোকের পৃষ্ঠপোষকতা। উডভিল এবং পিয়ার্সন এমনি এক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করলেন যেখান থেকে বিনামূল্যে গো-বসন্তের বীজ বিলি করা হবে। ডিউক অফ ইয়র্ক পৃষ্ঠপোষক এবং আর্ল অফ এগ্রিমেণ্ট চেয়ারম্যান হতে রাজী হলেন।

এইবার পিয়ার্সন জেনারকে লিখলেন, বিনামূল্যে গো-বসন্তের বীজ সর্বসাধারণকে সরবরাহ করবার এক দাতব্য প্রতিষ্ঠান খোলার প্রচেষ্টা অনেকদূর এগিয়েছে। জেনারকে তাঁরা অতিরিক্ত পরামর্শদাতা চিকিৎসক হিসাবে রাখতে রাজী আছেন। এই পোস্টের বাৎসরিক ফী এক গিনি জেনারের সম্মানের জন্য প্রতিষ্ঠান মকুব করতে প্রস্তুত।

জেনার এমনিতেই খুব নম্র নিরীহ প্রকৃতির লোক। কিন্তু এই খোঁচা খেয়ে তিনি ক্ষেপে উঠলেন। পিয়ার্সনকে লিখলেন, এত বড় বড় প্রতিপত্তিশালী সব ডাক্তাররা তাঁর কাজের মূল্য বুঝেছেন দেখে তিনি গর্ববোধ করছেন। কিন্তু অপরের অসতর্ক ব্যবহারে যদি এই টিকা দিয়ে কোন খারাপ ফল হয়, অথবা কোন বদনাম রটে, তাহলে সেই বদনাম একা তাঁকেই শুধু ঘাড় পেতে নিতে হবে। কাজেই তিনি এ-দায়িত্ব নিতে অক্ষম।

এবার জেনার নিজের এক প্রতিষ্ঠান গড়বার সঙ্কল্প করলেন। তদ্বির করে

ডিউক অফ ইয়র্ক এবং লর্ড এগ্রিমণ্টকে পিয়ার্সনের কবল থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। লণ্ডনে একটা বাড়ি নিয়ে হেড কোয়ার্টার করা হল। সেখান থেকে তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে টিকার বীজ বাইরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হল।

জেনারের জীবনে ভাগ্যদেবী এই প্রথম প্রসন্না হলেন। তাঁর 'এনকোয়ারীর' দ্বিতীয় সংস্করণ রাজা তৃতীয় জর্জের নামে উৎসর্গ করার অনুমতি পাওয়া গেল। তাঁর নিজের গাঁয়ে আর্ল অফ বার্কলী এক অভিনন্দনের আয়োজন করলেন। চাঁদা তুলে তাঁকে একটা উপহার দেবেন ঠিক হল। কি উপহার চান জিজ্ঞাসা করায়, জেনার বললেন, সোনার একটি ঝাঁপি। তাতে খোদাই থাকবে, গোরু চাঁদের উপর লাফিয়ে যাচ্ছে। টিকা দেওয়া সম্ভব করার সম্মানে একটা প্রাণীর আনন্দে লাফিয়ে ওঠা কি সম্ভব নয় ?

কিন্তু এই টিকার জন্য খেটে খেটে জেনার অর্থসঙ্কটে পড়লেন। প্র্যাকটিস পড়ে গেল। তবু আশা করে রইলেন, হয়ত এই আবিষ্কারে ভবিষ্যতে তাঁর কিছু সুবিধে হবে।

তাঁব বন্ধুরা অনেক চেষ্টা করে অনেক মুসাবিদা করে হাউস অফ কমন্সে এক দরখাস্ত পেশ করলেন। বলা হল, গো-বসন্ত মানুষের দেহে সংক্রামিত করলে মানুষ বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। এডওআর্ড জেনার এই টিকা দেওয়া আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতিতে কঠিন বসন্ত রোগ একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই কাজে ডাঃ জেনার অনেক সময় এবং অনেক অর্থব্যয় করেছেন। কিন্তু বিনিময়ে নতুন কোনো অর্থাগম হয়নি। কিন্তু দায়িত্ব বেড়েছে। দুশ্চিন্তা বেড়েছে। অতএব প্রার্থনা, এই সব বিবেচনা করে .হাউস যা উপযুক্ত মনে করেন, জেনারকে সেই মত পুরস্কার দেওয়া হোক।

তিনটি মাত্র অধিক ভোটে হাউস অফ কমন্স জেনারের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের মূল্য ১০,০০০ পাউণ্ড ধার্য করা উপযুক্ত মনে করলেন।

এই খবর একদিন বেঞ্জামিন জেসটির কানে পৌছুল। বেঞ্জামিন জেসটি তখন আইল অফ পারবেকের একজন ধনী কৃষক। গো-বসন্তের বীজ মানুষের দেহে সংক্রামিত করে বসন্ত রোগ প্রতিরোধের জন্য হাউস অফ কমন্স ডাঃ জেনারকে ১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার দিয়েছেন দেখে তাঁর মনে পড়ল, এই জিনিস তো তিনিই আগে করেছেন জেনারের বাইশ বছর আগে। ১৭৭৪ সালে।

তখন তিনি জেনারেরই গ্রামের পঞ্চাশ মাইল দূরে ডরসেটের এক বড় ফার্মের মালিক। একদিন মোজা সেলাইএর এক ছুঁচ দিয়ে তিনি জেনারেরই মত নিজের গোশালার গো-বসন্তের বীজ নিয়ে তাঁর দু বছর এবং তিন বছরের দুটি বাচ্চার হাতে টিকা দেন। পরে নিজে নেন এবং স্ত্রীকেও দেন। কিছুদিন পরে তাঁর বাচ্চা দুটিকে ইনঅকুলেশন দেওয়া হয়। বাচ্চারা বসন্ত প্রতিরোধ করে। কোন গুটি বেরোয় না। তাই দেখে বেঞ্জামিন জেসটি তাঁর গয়লানীদেরও টিকা দেন।

কিন্তু তাঁর গ্রামের ডরসেটশায়ারের লোকেরা এর কোন মূল্য দিল না। বরং নিন্দে করল। বলল, এ জিনিস নিতান্তই পাশবিক। একটা অসুস্থ জন্তুর পুঁজ মানবদেহে লাগানো অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

জেসটি অবশ্য এ নিন্দা গায়ে মাখলেন না। বললেন, গোরুর মত এমন নিরীহ উপকারী জীবের দেহ থেকে জিনিস নিতে মানুষের বাধা কি? কেন, আমরা কি এই অতি প্রয়োজনীয় চমৎকার প্রাণীর দুধ খেয়ে জীবনধারণ করি না?

নিজের পরিবারের সবাইকে টিকা দিয়ে বসন্ত রোগ থেকে আত্মরক্ষা করে বেঞ্জামিন জেসটি এই নিয়ে আর মাথা ঘামানো দরকার মনে করলেন না।

পঁচিশ বছর পরে আজ জেনারকে এই টিকার জন্য গবর্ণমেণ্ট ১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার দিয়েছেন দেখে তাঁর মনে হল, তিনিই যখন সর্বপ্রথম এই টিকা দিয়েছেন, এই পুরস্কার তাঁরই ন্যায্য প্রাপ্য।

তাড়াতাড়ি তিনি সোয়ানেজ শহরে গিয়ে পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন এবং জেনারের বাইশ বছর আগে কি করে তিনি নিজের ছেলেদের টিকা দিয়েছেন তার গল্প বললেন। সব শুনে পাদ্রী সাহেব লণ্ডনের জেনারিআন সোসাইটির সেক্রেটারীর কাছে এক চিঠি লিখলেন। স্থানীয় এক এম পিও এই ঘটনায় জেসটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

এই চিঠি পেয়ে লণ্ডনের জেনারিআন একদিন সোসাইটি বেঞ্জামিন জেসটিকে নিমন্ত্রণ করলেন। বললেন, জেসটির প্রতিকৃতি এঁকে লিখে রাখা হবে তিনিই সর্বপ্রথম গো-বসন্তের এই টিকা দেন। শহরে যাওয়ার খরচের জন্য সোসাইটি পনেরো গিনি জেসটিকে পাঠালেন।

জেসটি তাঁর গ্রাম্য পোশাক পরে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনে গেলেন।

তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছে ছিল জেসটি আধুনিক পোশাক পরে শহরে যান। কিন্তু জেসটি তা শুনলেন না।

জেসটির আঠারো স্টোন ওজন। গ্রাম্য পোশাক, হরিণের চামড়ার ব্রিচেস, উলের মোজা, ভেলভেট জ্যাকেট এবং হলদে দাগ কাটা ওয়েস্ট কোট দেখে শহরের ডাক্তাররা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। চিত্রকর সার্পকে জেসটির প্রতিকৃতি আঁকতে নিযুক্ত করা হল। কিন্তু তিনি দেখলেন জেসটি বেশীক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। কাজেই মিসেস শার্পকে পিয়ানো বাজিয়ে জেসটিকে ভুলিয়ে রাখতে হল। অয়েল পেন্টিংএ এই ছবি পরে প্রদর্শনীতে দেখানো হল।

পঁচিশ বছর আগে টিকা নিয়ে এখনও বসন্ত রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা দেহে আছে কি না দেখার জন্য জেসটি এবং তাঁর ছেলেকে আবার ইনঅকুলেশন দেওয়া হল। জেসটি গো-বসন্তের প্রথম টিকাদার তাই তাঁকে সোনার এক ছুরি উপহার দেওয়া হল।

জেনারিআন ইনষ্টিটিউশনের সব ডাক্তার এবং কর্মীরা সবাই জেসটিকে অভিনন্দন জানালেন, জেসটির সাহসের প্রশংসা করলেন। তিনিই যে সর্বপ্রথম টিকা দিয়েছিলেন তা লিখে রাখা হল।

নিজেকে মস্ত বড লোক মনে করে গর্বে বুক ফুলিয়ে বেঞ্জামিন জেসটি পারবেকে ফিরে এলেন। কিছুদিন পরে লণ্ডনের ঐ সহৃদয় ডাক্তারদের তিনি লিখলেন, জেনার যে ১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার পেয়েছেন তা থেকে তিনি কিছু পেতে পারেন না কি ?

উত্তর এল, ওঁরা ভেবে দেখবেন। চেষ্টা করবেন।

কিন্তু ঐ সোনার ছুরি ছাড়া আর কিছু জেসটি জীবনে পেলেন না। বেঞ্জামিন জেসটি ওয়াটারলুর যুদ্ধের পরের বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। সোয়ানসনের কাছে গ্রামের গির্জায় তাঁর কবরের উপর আজও লেখা আছে—ইনিই সর্বপ্রথম মানুষের দেহে গো-বসন্তের টিকা দিয়ে বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করেন।

বেঞ্জামিন জেসটি শুধু নিজের পরিবারকে বসন্ত রোগ থেকে রক্ষা করেছেন। এডওয়ার্ড জেনার করলেন সমগ্র মানব জাতিকে। এইখানেই জেনারের কৃতিত্ব।

দি রয়াল জেনারিআন ইনষ্টিটিউশন, টিকা প্রসারের একমাত্র প্রতিষ্ঠানের এখন লণ্ডনে তেরটি শাখা। এই প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ড ছাড়া বিদেশেও এখন ভ্যাকসিন লিম্ফ অর্থাৎ টিকার বীজ পাঠাতে শুরু করল।

কিন্তু জেনারের আর্থিক সমস্যার কোনো সমাধানই হল না। বন্ধুরা বুদ্ধি দিল মেফেয়ারের হার্টফোর্ড স্ট্রীটে আবার প্র্যাকটিস শুরু করতে। জেনার দেখলেন, তিনি নিজের ফাঁদেই নিজে ধরা পড়েছেন। টিকা নিতে তাঁর কাছে আর কেউ আসতে চায় না। পুরনো রুগীরা বলে, এই সামান্য কাজের জন্য জেনারের মত অত বড় লোককে তারা আর বিরক্ত করতে চায় না। এ-জিনিস তাদের বাড়ির কাছের ডাক্তাররাই দিতে পারে। অন্যেরা প্রথমে একটা ফী দিয়ে পরের ফী আর দিল না। জেনার দেখলেন, প্র্যাকটিস আর তাঁর হবে না। দশ বছর চেষ্টা করে দেখে জেনার একদিন প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন।

ভাগ্যক্রমে নতুন চ্যান্সেলর অফ এক্সেচেকার জেনারের জন্য ২০,০০০ পাউণ্ডের দ্বিতীয় সাহায্যের এক দাবী পার্লামেণ্টে তুললেন। তিন ভোটের বদলে এবার তেরটি বেশি ভোটে এ-দান মঞ্জুর হল।

রয়াল জেনারিআন ইনস্টিটিউশন, ন্যাশনাল ভ্যাকসিন এস্টাব্লিশমেণ্টে পরিণত হল ১৮০৩ সালে। জেনার তার প্রথম ডাইরেক্টর নিযুক্ত হলেন।

দেশ-বিদেশে জেনারের নাম ছড়িয়ে পড়ল। রাশিয়ার বিধবা সম্রাজ্ঞী জেনারকে হীরেবসানো এক আংটী উপহার দিলেন। রাশিয়ায় প্রথম যে শিশু টিকা নিল, তার নাম রাখা হল ভ্যাকসিনফ। নেপোলিঅন তাঁর সমস্ত সৈন্যদের টিকা নেওয়ার হুকুম দিলেন। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা জেনারকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেরা স্বাক্ষর করে এক মানপত্র দিল এবং নানাবিধ উপহার পাঠাল। ২৫ বছর পরে জর্জ ওয়াশিংটন সমস্ত কন্টিনেণ্টাল আর্মির সৈন্যদের টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করে দিলেন।

সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখাল স্পেন দেশ। স্পেনের সম্রাট ঠিক করলেন, দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশে টিকা দেবেন। টিকার বীজ জিইয়ে রাখার জন্য ২২ জন টিকা না দেওয়া বাচ্চা নিয়ে এক জাহাজ রওনা হল। প্রথমে দুজনকে টিকা দেওয়া হল। সাত দিন পর গুটি উঠলে সেই থেকে আবার দুজনকে টিকা দেওয়া হল। পথে যেখানে যেখানে জাহাজ নোঙর ফেলে, সেখানেই অধিবাসীদের টিকা দেওয়া হয়। সাগ্রহে সবাই এই টিকা নেয়।

২২ জন বাচ্চার টিকা ওঠবার পর আরও ২৬ জন নতুন বাচ্চা জাহাজে তোলা হল। ৩০০ বছর আগে ইওরোপ থেকে স্পেনদেশীয় উপনিবেশকারীরা দক্ষিণ আমেরিকায় বসন্ত রোগ নিয়ে যায়। এতদিন প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ

লোকের এতে মৃত্যু হয়েছে। জেনারের এই আবিষ্কারের জন্য এখন থেকে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচল।

আমেরিকা থেকে এই জাহাজ একদিন ক্যাণ্টনে নোঙর ফেলল। চীনা ভাষায় লেখা এক পুস্তিকা প্রচারের জন্য বিলি করা হল। জেনারের টিকা চীন দেশেও চালু হয়ে গেল। সেখান থেকে তিব্বতে।

বিদেশ থেকে জেনার যে সম্মান পেলেন, নিজের দেশের লোক তা দিল না। জার্মানীর গেঅটিনগেনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে অনারারী মেম্বার করে নিল। কিন্তু লণ্ডনের রয়েল কলেজ অফ ফিজিশিয়ান বলল, পরীক্ষা দিতে হবে। টিকার আবিষ্কারকের আত্মসম্মানে ঘা লাগল। তাই জেনার বললেন, পরীক্ষা? কক্ষনো নয়। জন হাণ্টারের সমগ্র সার্জিক্যাল মিউজিয়মের বদলেও পরীক্ষা দিতে তিনি রাজী নন।

সেই সময় ফ্রান্সের রাজা অথবা স্পেনের সম্রাটকে যদি জেনার কখনও অনুরোধ করতেন, যুদ্ধের কোনো বন্দীকে মুক্তি দিতে, তক্ষুণি নিশ্চয় সে-বন্দী মুক্তি পেত। কিন্তু নিজের দেশে নিজের ভাইপো-ভাগ্নের জন্য কারু কাছে কোনো সুপারিশ করলে অনায়াসে তা অগ্রাহ্য হত।

১৮২৩ সালে জানুয়ারী মাসে জেনার তাঁর শেষ উইল করেন। তাতে লেখেন, টিকার সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস এবং মত প্রথম যা ছিল, আজও তা তেমনি অটুট আছে। পরবর্তী কালের কোনো ঘটনায় এর শক্তি কিছু বাড়েনি। আবার কমেও যায়নি। কারণ এতে বাড়া কমার কিছু নেই। নিষ্ফলতা কিছুই না ঘটলে আমার ঐ সুদৃঢ় মতের কঠোর সত্যতা এমনভাবে প্রমাণ হবার সুযোগই পেত না।

সেদিন হাড় কনকনে শীতের রাত। জেনার তাঁর এক আত্মীয় চিত্রকরের বাড়িতে আছেন। আত্মীয়টি গান গাইলেন। জেনার তার দুটি-একটি ভুল শুধরে গুন গুন করে একটু গাইলেন। তাঁর মনে হল, আগুনের চুল্লীতে কয়লা কমে গেছে। তাই কয়লা আনতে জেনার সেলারে গেলেন।

পরদিন ভোরে তাঁকে লাইব্রেরী ঘরে দেখা গেল। মৃত। ১৭৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করে ৭৪ বৎসর বয়সে জেনারের সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু হয় ১৮২৩ সালে।

জেনার যতদিন বেঁচে ছিলেন, তার মধ্যে জীবাণুতত্ত্ব আবিষ্কার হয়নি। জীবাণু কি এবং কি করেই বা তা মানবদেহে ঢুকে রোগের সৃষ্টি করে, জেনার কিছুই তা জানতেন না।

তখন টিকার বীজ একজনের বাহু থেকে অপরের বাহুতে লাগানো হত। এই বীজে অন্য জীবাণু মিশে থাকত। একজনের বাহু থেকে অপরের বাহুতে সেই জীবাণু সংক্রামিত হতে পারত।

আজকাল তা হয় না। টিকার বীজ (ভ্যাকসিন লিম্ফ) এখন বাছুরের গা থেকে নেওয়া হয়। অপারেশন থিয়েটারের মত জীবাণুশূন্য পরিবেশে এই বাছুরকে রাখা হয়। জীবাণুহীন উপায়ে তার দেহ থেকে টিকার বীজ নেওয়া হয়। কাজেই আজকালকার টিকার বীজে অন্য কোনো রোগের জীবাণু থাকে না। গোরুর যে দুধ আমরা খাই, তার চেয়ে এ-বীজ শতগুণে পরিষ্কার এবং জীবাণুশূন্য।

জেনারের এই টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করে পৃথিবীর সব সভ্য দেশ বসন্ত রোগ নিশ্চিহ্ন করেছে। আমাদের দেশেও প্রাথমিক টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক। না নিলে আদালতে দণ্ড হবার কথা। বিনামূল্যে টিকা দেবার ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমল থেকেই গভর্নমেণ্ট করে আসছেন।

তবু কি আশ্চর্য বিশ শতকের এই শেষ অর্ধে স্বাধীন ভারতেও এ-রোগ প্রতিবছর হয়, এমন কি মহামারী পর্যন্ত হয়।

গত ১৯৫৬-৫৭ সালে যে মহামারীটি হয়ে গেছে কলকাতার মত এত বড় শহরে, তাতে দেড় হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে নভেম্বর থেকে এপ্রিলের মধ্যে। অথচ প্রাথমিক টিকা না দেওয়ার অপরাধে একটি লোকও অভিযুক্ত হয় নি। একটি লোকও দণ্ড পায় নি আদালতে।

এই মহামারীর মধ্যেই সেবার শহরে লোক সভা, বিধান সভা এবং করপোরেশনের নির্বাচন হয়ে গেছে নির্বিঘ্নে। কিন্তু নির্বাচন কোন ইস্তাহারেই এ সমস্যার কোনো উল্লেখ পর্যন্ত দেখা যায়নি।

তাহলে এ সমস্যার সমাধান হবে কি করে? বেঞ্জামিন জেসটি যেমন নিজের পরিবারবর্গকে টিকা দিয়ে এ নিয়ে আর মাথা ঘামান নি, আমরাও কি সেই রকম নিজেরা টিকা নিয়ে প্রতি বছর এই রোগে ভারতের কোথায় কত মৃত্যু হয়, শুধু সেই খবরটুকুই ঘরে বসে পড়ব? এডওআর্ড জেনারের মত দেশ থেকে এ রোগ উচ্ছেদ করে মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে কোনো আন্দোলনই করব না?

জোচ্চুরি নয়

ক্রফোর্ড উইলিআমসন লঙ (১৮১৫-৭৮) আমেরিকার এক গ্রাম্য ডাক্তার। জর্জিয়া স্টেটের জেফার্সন গ্রামে তাঁর প্র্যাকটিস। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি ডাক্তারী ডিগ্রি নেন ১৮৩৯ সালে। পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি গ্র্যাজুয়েট।

লঙ নেহাৎই গাঁয়ের ডাক্তার। কাছাকাছি যে রেল স্টেশন সেও প্রায় একশ চল্লিশ মাইল দূরে। কাজেই ঘোড়ায় চড়ে রুগীর বাড়ি তাঁকে যেতে হয় এবং নিজের বাড়িতেও ওষুধের দোকান রাখতে হয়।

ওষুধের দোকানের সামনেই একখানা ঘর। এই ঘরে তিনি রুগী দেখেন। ছোট্ট ঘর। আসবাবের মধ্যে কয়েকখানা মাত্র চেয়ার এবং কাঠের একটি টেবিল। বিশেষ জরুরী হলে এই টেবিলেই তাঁকে ছোটখাট অপারেশন পর্যন্ত করতে হয়।

উনিশ শতকের পূর্বার্ধে আমেরিকায় এক মজার ব্যাপার ছিল, ইথার পার্টি। এই পার্টি যৌবনের। যুবক এবং যুবতীর। রুমালে ইথার ঢেলে কয়েকজন ইথার শুঁকত। বাকিরা সব মজা দেখত।

ইথার যদিও তরল, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি উবে যায়। রুমালে কি মাটিতে ঢাললে উগ্র গন্ধে ঘর ভরে ওঠে। ইথারে ভেজা রুমাল শুঁকলে নাকে গলায় চোখে ঝাঁঝ লাগে; কাশি আসে। এইটুকু সহ্য করে আরও একটু বেশি টানলে শরীরে ফুর্তি আসে, নেশা হয়। রক্তে উন্মাদনা জাগে। নেশার ঘোরে যুবক যুবতীরা হুটোপাটি করে। পার্টি জমে ওঠে। খুব ফুর্তি হয়। কেউ কেউ আবার বেহুঁশও হয়ে পড়ে। খানিকক্ষণ মেঝেতে শুয়ে থাকে; ঘুমিয়ে নেশার ঘোর কাটায়।

ডাক্তার লঙ যুবক। চেহারাও তাঁর সুন্দর। এইসব মজার পার্টি একটাও তিনি ছাড়তেন না। নিজে ইথার না শুঁকে অপরে কি হুল্লোড় করে তাই দেখে তিনি মজা পেতেন।

একদিন এইরকম এক পার্টিতে তিনি ঘোষণা করলেন, পরের পার্টিতে নিজেই তিনি ইথার শুঁকবেন। তারপর তাঁর ব্যবহারে সেদিন যদি কিছু বাড়াবাড়ি ঘটে, তা দেখে কেউ যেন আশ্চর্য না হন।

সবাই খুব বাহবা দিল আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল সেই দিনটির জন্য। নির্দিষ্ট দিনে লঙ রুমালে ইথার ঢেলে নিজের নাকে মুখে চেপে ধরলেন। কিন্তু বেশি জোরে তিনি শুঁকলেন না। কারণ তাঁর মতলব ছিল অন্য। একটু শুঁকে একটু কেশে তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন তাঁর খুব নেশা হয়েছে। টলতে টলতে এগিয়ে এসে একটি যুবতীর গায় তিনি ঢলে পড়লেন এবং জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বন করলেন। তারপর তাকে ছেড়ে আর একটিকে। এমনি করে পর পর সব কটি যুবতীকে।

সবাই ভাবল ডাক্তারের এই ব্যবহারের কারণ ঐ ইথার। সবাই খুব বাহবা দিল। ইথারের এই মোহিনী শক্তি দেখে তাজ্জব বনে গেল। যুবতীরা তো এত মজা পেল যে, আবার এই ইথার শোঁকার জন্য ডাক্তারকে ওস্কাতে লাগল।

এই ইথার শোঁকা তখনকার দিনের আমেরিকার মজার এক খেলা। বছরের পর বছর ধরে ভ্রাম্যমাণ বক্তা বা ওষুধের কীর্তনীয়ারা এই ইথার শুঁকিয়ে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করত। কখনও হয়ত কোন ছোকরা রাস্তায় এক নিগ্রো ধরে তার নাকে ইথার ভিজা রুমাল চেপে বেহুঁশ করে মজা দেখত।

ডাঃ লঙ-এর এক রুগী ছিল, জেমস এম ভেনএবলস। এই রুগীটির কাজ ছিল রোজ গ্রামের স্কুলে হাজিরা দেওয়া আর সুযোগ পেলেই এইরকম এক ইথার পার্টিতে যাওয়া। জেমস বলতো ইথার শুঁকতে তার খুব ভালো লাগে; বেশ নেশা হয়। নেশার ঝোঁকে সে কি করে কিছুই পরে মনে থাকে না। এমন কি আঘাত লাগলেও সে টের পায় না।

ডাঃ লঙও তা দেখেছেন। ইথার শুঁকে সবাই যা কাণ্ড করে, তা দেখে তাঁর ধারণা হয়েছে, আঘাত পেলেও কেউ তা বোঝে না। নিজে ইথার শুঁকে লঙ বুঝেচেন, সত্যি, ইথারের এই শক্তি আছে।

লঙ ভাবলেন অপারেশনের আগে এই ইথার শুঁকিয়ে নিলে কেমন হয়? ব্যথা না পেলে রুগী চেঁচাবে না, ছটফট করবে না। অতএব পরীক্ষা করতে দোষ কি?

জেমসের ঘাড়ের ওপর দুটি ছোট্ট টিউমার ছিল। অনেক দিন থেকেই

তার ইচ্ছা এটি কাটিয়ে ফেলে। ডাঃ লঙও কাটতে রাজী। কিন্তু দিন আর ঠিক হয় না। দিন ঠিক হলেও শেষে আর কাটা হয় না। একটা না একটা বাগড়া পড়ে।

একদিন স্কুল ছুটির পর জেমস এসে ডাক্তারের চেম্বারে বসে রইল। ঠিক করল টিউমার না কাটিয়ে আজ আর সে উঠবে না, ডাঃ লঙ একে একে

ষোল শতকে করাত দিয়ে পা কাটার দৃশ্য

সব রুগী বিদায় করে ছুরি-কাঁচি ঠিক করলেন। ভাবলেন, এই লোকটির ইথার শোঁকার অভ্যাস আছে; অতএব আজকেই এটা পরীক্ষা করতে দোষ কি?

এই ভেবে একটা তোয়ালের ওপর ইথার ঢেলে জেমসকে তিনি শুঁকতে দিলেন। জেমস ইথার শুঁকতে ভালোই বাসত। খুশি হয়ে শুঁকতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মনে হল, জেমস ঘুমিয়ে পড়েছে। নাক ডাকাচ্ছে। ডাঃ লঙ টিউমার দুটি কেটে দিলেন। জেমস একটুও নড়ল না। দিব্বি নাক ডাকাতে লাগল।

জেগে উঠে জেমস দেখল তার ঘাড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কিন্তু অপারেশন হল কখন? কখন ডাক্তার ছুরি বসালো? কিছুই তো তার মনে নেই? তাহলে কি আজও ডাক্তার ফাঁকি দিল? অপারেশন না করেই ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল? মিছিমিছি?

ডাঃ লঙ কাটা টিউমার দুটো জেমস-এর হাতে দিলেন। বললেন, সত্যি অপারেশন হয়ে গেছে। সেদিন ৩০শে মার্চ, ১৮৪২। লঙ কিন্তু বুঝলেন না, সেদিন কি ইতিহাস রচিত হল। অপারেশনের আগে ইথার শুঁকিয়ে রুগীকে যে এই সর্বপ্রথম অচৈতন্য করা হল সে খেয়াল তাঁর হল না।

জেমস চলে গেলে ডাঃ লঙ তাঁর লেজারে লিখলেন, জেমস ভেনএবলস, ১৮৪২। ইথার এবং টিউমার কাটার বাবদ দুই ডলার।

এর পর আরও কয়েকটা ছোট খাট অপারেশনে তিনি ইথার শোঁকালেন। কিন্তু অপারেশনে ইথার ব্যবহার রুগীরা পছন্দ করলেও সমাজ তা পছন্দ করল না। কানাঘুষায় শোনা গেল, ডাক্তার নীতিবিরুদ্ধ কাজ শুরু করেছেন। অপারেশনের আগে রুগীকে বেহুঁশ করে নিচ্ছেন; যা মেসমেরিজম কি হিপনোটিজমেরই মত অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

ডাক্তার লঙ ঘাবড়ে গেলেন। বদনামে প্র্যাকটিস নষ্ট হবে এই ভয়ে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। অপারেশনে ইথার ব্যবহার বর্জন করলেন। এমন কি, কোনো কাগজে পর্যন্ত এই ইথার প্রয়োগের কথা লিখে জানাতে সাহস পেলেন না। বহুদিন পরে সবাই যখন ইথার ব্যবহার শুরু করেছে এবং অজ্ঞান করার এই পদ্ধতির কে স্রষ্টা তাই নিয়ে যখন হৈচৈ হচ্ছে, তখনই তিনি নিজের এই অভিজ্ঞতা এক প্রবন্ধে লিখে প্রকাশ করলেন ১৮৪৯ সালে।

ডাক্তার লঙ যখন বদনামের ভয়ে ইথার বর্জন করলেন, সেই সময় জর্জিয়ার অনেক উত্তরে কানেকটিকাটের হার্টফোর্ডে হোরেস ওএলস (১৮১৫-৪৮) নামে এক দাঁতের ডাক্তার ছিলেন। কি করে প্র্যাকটিস বাড়ানো যায় সর্বদা তাই তিনি খুঁজতেন।

১৮৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এই হার্ট-ফোর্ডের ইউনিয়ন হলে খুব বড় একটা প্রদর্শনী হল। পোস্টারে পোস্টারে ঘোষণা করা হল, বারোজন যুবক হাসির গ্যাস (নাইট্রাস অক্সাইড) শুঁকবে; আর আটজন বাছা বাছা জোয়ান থাকবে তাদের সামলাবার জন্য। কর্মকর্তারা বুঝিয়ে দিলেন এই গ্যাস শুঁকলে লোকে হাসে, গায়, নাচে, বক্তৃতা করে। রুচি অনুসারে

কেউ কেউ হাতাহাতি মারামারিও হয়ত করতে পারে, তাই কর্তৃপক্ষের এই সাবধানতা। নইলে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরাই এই গ্যাস শুঁকবেন। কাজেই ভয়ের কোন কারণ নেই। তাছাড়া এই গ্যাসে এতটা মত্ত কেউ হয় না যে, নিজের কাজে কোন হুঁশ থাকে না।

দাঁতের ডাক্তার হোরেস ওএলস এই প্রদর্শনীতে গেলেন সস্ত্রীক। দেখলেন তাঁরই এক প্রতিবেশী সামুএল এ কুলী, এই গ্যাস শুঁকল। লোকটি এমনিতেই বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির। কিন্তু এই গ্যাস শুঁকে হঠাৎ যেন সে অসুরের শক্তি পেল। চোখ পাকিয়ে ঘুষি বাগিয়ে যেন কল্পিত শত্রু নিধনের জন্য ছোটাছুটি করতে লাগল। স্টেজে বাঁধা দড়ি টপকে খামোখা এক শান্ত নির্দোষ লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লাফাতে গিয়ে হোঁচট খেল, কিন্তু ব্যথা পাচ্ছে মনে হল না।

হোরেস ওএলস মুগ্ধ হয়ে কুলীর এই আজব কাণ্ড দেখছিলেন। এইবার নিজেই তিনি এগিয়ে গেলেন এবং হাসির গ্যাস শুঁকলেন। তারপর তিনি কি করলেন, কিছুই আর তাঁর মনে পড়ল না। যখন হুঁশ হল, দেখলেন, তিনি নিজের সীটেই বসে আছেন, আর পাশের সীটে বসে তাঁর স্ত্রী তাঁকে গঞ্জনা দিচ্ছেন। বলছেন, একঘর লোকের সামনে এই হতভাগা স্যামুএলটার মত অমন মাতলামো না করলে কি চলত না? ছি-ছি, লজ্জায় যে আমার মাথা কাটা গেল।

ওএলস তখন ভাবছেন অন্য কথা। তিনি বুঝে ফেলেছেন, এই গ্যাস শুঁকলে ব্যথা-বোধ থাকে না। তাহলে দাঁত তোলবার আগে এই গ্যাস শোঁকালে কেমন হয়?

হোরেস ওএলস ঐ প্রদর্শনীর কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, গ্যাস শুঁকিয়ে দাঁত তুললে কি ব্যথা লাগে?

কর্মকর্তার কাজ প্রদর্শনী চালানো। দাঁতের খবর কিছুই তিনি রাখেন না। সোজা বলে দিলেন, ওসব তিনি কিছু জানেন না।

ওএলস ভাবলেন নিজেই তিনি দাঁত তুলে পরীক্ষা করে দেখবেন। তাঁর নিজের একটা দাঁত খারাপ ছিল; ব্যথা হত। একদিন তিনি তাঁর এক বন্ধু ডেন্টিস্টস-এর কাছে গেলেন। জে এম রিগস তাঁর নাম।

বললেন, আগে তিনি হাসির গ্যাস শুঁকে নেবেন, তারপর রিগস দাঁত তুলবেন। রিগস রাজী হলেন। দাঁত তোলা হল। ওএলস কোন ব্যথা টের পেলেন না।

জেগে উঠে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওএলস বললেন, আজ থেকে দাঁত তোলার নতুন যুগ শুরু হল। সেদিন ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৪৪।

এইবার ওএলস নিজের প্র্যাকটিসে এই হাসির গ্যাস ব্যবহার শুরু করলেন এবং বিনা ব্যথায় রুগীর দাঁত তুলতে লাগলেন।

হাসির গ্যাস, অর্থাৎ নাইট্রাস অক্সাইডে যে মানুষ অচৈতন্য হয়, দেহের কোন আঘাতে যে ব্যথা বোধ থাকে না, তা ৪৪ বছর আগে ইংলণ্ডের স্যার হামফ্রী ডেভি বলে গেছেন নিজের ওপর পরীক্ষা করে। মাত্র বারো বৎসর বয়সে। তাঁর 'রিসার্চেস কেমিক্যাল এণ্ড ফিলসফিক্যাল' পুস্তকেও ১৮০০ সালে ডেভি বলেছেন, সার্জিকাল অপারেশনে যেখানে বেশি রক্তক্ষয়ের কোন সম্ভাবনা নেই, সেখানে ব্যথা দূর করার জন্য এ-গ্যাস অনায়াসে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু কোন সার্জন এতদিন তা ব্যবহার করেন নি। এতদিন পরে আমেরিকার হোরেস ওএলস সর্বপ্রথম এই গ্যাস সার্জারিতে ব্যবহার করলেন।

হোরেস ওএলস ভাবলেন, হার্টফোর্ড ছোট জায়গা। বিনা ব্যথায় দাঁত তুলে এখানে আর কতই-বা রোজগার হবে। এর চেয়ে বোসটন-এ যাওয়া ভাল। বোসটন শহর যেমন বড, লোকও তেমনি বেশি, লোকের হাতে পয়সাও সেরকম বেশি।

কাজেই ওএলস হার্টফোর্ড ছেড়ে বোসটনে এলেন এবং এই হাসির গ্যাস দিয়ে বিনা ব্যথায় রুগীর দাঁত তুলতে লাগলেন। এইখানে এসে তাঁর মর্টন-এর সঙ্গে পরিচয় হল।

উইলিআম টমাস গ্রীন মর্টন (১৮১৯—৬৮) তখন কৃত্রিম দাঁতের ব্যাবসা করেন। মর্টনের বাবা ছিলেন দোকানদার। ছেলেকে তিনি কোন মেডিক্যাল স্কুলে পাঠান নি। কিন্তু মর্টনের খুব শখ ডাক্তারি শেখে। কৃত্রিম দাঁতের ব্যাবসা করে দাঁত তুলে তিনি নিজেকে দাঁতের ডাক্তার বলতেন।

মর্টনের প্রকৃতি ছিল অনুসন্ধিৎসু। ওএলস-এর কাছে এসে এসে গ্যাস দিয়ে বিনা ব্যথায় কি করে দাঁত তোলা যায় তা তিনি শিখে নিলেন। তারপর ব্যবসায়ে ওএলস-এর অংশীদার হলেন।

ওএলস তখন ভাবছেন, এই গ্যাস দেওয়ার পদ্ধতি ব্যাপকভাবে চালু করে পয়সা রোজগার করতে হলে আগে বড় কোন হাসপাতালে এটা ব্যবহার করা দরকার এবং এই গ্যাসের সত্যকার গুণ সার্জনদের বোঝানো দরকার।

এই ভেবে তিনি ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের বড় সার্জন জন কলিনস ওআরেন-এর সঙ্গে একদিন দেখা করলেন। বললেন, তিনি নিজের প্র্যাকটিসে এই গ্যাস ব্যবহার করে দেখেছেন। অনেক দাঁত তুলেছেন কিন্তু রুগীরা কেউ একটুও ব্যথা পায়নি। কাজেই ওআরেনের কোন অপারেশনে এই গ্যাস তিনি ব্যবহার করে দেখতে চান।

ডাঃ ওআরেনের ওয়ার্ডে তখন একটা বড কেস ছিল। পা কেটে বাদ দিতে হবে। (অ্যাম্‌পুটেশন অব থাই)। তিনি তক্ষুণি রাজী হয়ে গেলেন। রুগী কিন্তু রাজী হল না। বলল, ব্যথা সহ্য করতে সে প্রস্তুত। কিন্তু অজানা এই গ্যাস শুঁকে অপারেশনের আগেই অজ্ঞান হওয়া সে চায় না।

কাজেই ডাঃ ওআরেনকে অন্য এক রুগী ঠিক করতে হল। গ্যাস দিয়ে দাঁত তুলতে একটিমাত্র রুগী রাজী হল। ১৮৪৫ সালে।

নির্দিষ্ট দিনে মর্টনকে সঙ্গে নিয়ে ওএলস ম্যাসাচুসেটস হাসপাতালে এলেন। অপারেশন থিয়েটারে সেদিন ছাত্রদের সাংঘাতিক ভিড়। সবাই নতুন এই গ্যাস শোঁকানো দেখবার জন্য উৎসুক।

ওএলস রুগীকে এই গ্যাস শোঁকালেন। কতখানি গ্যাস শোঁকালে রুগী ঠিকমত অজ্ঞান হয়, ব্যথাবোধ থাকে না, তা তখনও তাঁর ঠিকমত রপ্ত হয়নি। তাছাড়া এত লোকের সামনে বিশেষ করে ডাক্তার এবং ডাক্তারী ছাত্রদের সামনে এরকম করে আগে কখনও তিনি গ্যাস শোঁকান নি। তাই যখন ফরসেপস দিয়ে রুগীর দাঁত ধরে তিনি টান দিলেন, রুগী অমনি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল এবং হাত দিয়ে টেনে তাঁর ফরসেপস ফেলে দিল। ছাত্ররা হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, জোচ্চোর। হামবাগ।

লজ্জায় অপমানে হোরেস ওএলস হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন। এমনি তাঁর দুর্ভাগ্য যে, নিজের চেম্বারে এক রুগীর দাঁত তোলবার আগে হাসির গ্যাস শুঁকিয়ে অজ্ঞান করতে গিয়ে রুগীটির হঠাৎ মৃত্যু হল। ওএলস প্র্যাকটিস ছেড়ে বোসটন থেকে পালিয়ে গেলেন। হাসির গ্যাসে অজ্ঞান করার চেষ্টা এইখানেই শেষ হল।

বোসটনে তখন এক নামকরা রসায়নবিদ্‌ ছিলেন, ডাঃ চার্লস টমাস জ্যাকসন। তিনি শুধু রসায়নেই যে পণ্ডিত ছিলেন তা নয়। তাঁর পাণ্ডিত্য বহুমুখী। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসার ডিগ্রি নিয়ে তিনি তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তার ওপর রসায়ন, পদার্থ এবং খনিজ বিদ্যায়

তিনি সুপণ্ডিত। তাছাড়া দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে নানা বিষয়ে তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল।

হোরেস ওএলস-এর মাধ্যমে এই জ্যাকসনের সঙ্গে মর্টনের পরিচয় হয়। মর্টন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যাকসনের কাছে ডাক্তারি শিখতে শুরু করলেন।

ডাঃ জ্যাকসন বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। বিজ্ঞানের সর্ববিষয়ে অদ্ভুত তাঁর জ্ঞান। অতএব শ্রোতা পেলেই তাঁর পাণ্ডিত্য তিনি জাহির করতেন আর বক্তৃতা দিতেন।

যখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বৎসর, তখন একদিন তিনি সালী নামে এক জাহাজে চড়ে ইওরোপ থেকে আমেরিকায় আসছিলেন। সৈলুনে বসে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। তিনিও আমেরিকান, নাম স্যামুএল বি মরস। চিত্রকর হিসেবে তখন এই মরস-এর সবে একটু-আধটু নাম হচ্ছে।

কথায় কথায় এই মরস হঠাৎ বৈদ্যুতিক চুম্বক (ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিজম্) সম্বন্ধে খুব কৌতূহল দেখালেন। জ্যাকসনের উৎসাহ বেড়ে গেল। কেমন করে বৈদ্যুতিক চুম্বক তৈরি হয়, কি করে এর সাহায্যে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজানো যায়, এই সব তিনি মরসকে বোঝাতে লাগলেন।

জ্যাকসনের কথা শুনে মরস হঠাৎ বলে উঠলেন, এক জায়গায় বসে সুইচ টিপলে যদি আর এক জায়গায় ঘণ্টা বাজে, তাহলে মানুষের বুদ্ধিই বা কেন এই বিদ্যুতের সাহায্যে এক দেশ থেকে আর এক দেশে পাঠানো যাবে না?

এ-কথার গুরুত্ব জ্যাকসন তখন কিছু দিলেন না। অন্য কথা পাড়লেন। মরসকে চুম্বকশক্তির বিচিত্র সব ক্ষমতা বোঝাতে লাগলেন।

তিন বছর পরের কথা। স্যামুএল বি মরস এখন নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য এবং অঙ্কন বিদ্যার অধ্যাপক। ইলেকটিক টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা। দূর দেশে শব্দ পাঠানোর ডট এবং ড্যাশের সঙ্কেতের স্রষ্টা। পৃথিবী জুড়ে এই সঙ্কেতের নাম এখন মরস-এর কোড।

জ্যাকসনের মনে পড়ল তিন বছর আগের কথা। সমুদ্রের ওপর সালী জাহাজের কেবিনে বসে সেদিনকার সেই আলোচনার কথা। মরস সেদিন কার কাছ থেকে বৈদ্যুতিক চুম্বকের কথা প্রথম শুনল? কে তাকে বুঝিয়েছিল, এই শক্তি দিয়ে এক জায়গায় সুইচ টিপলে দূরে আর এক জায়গায় ঘণ্টা বাজানো যায়? সেই থেকেই না কথা উঠল, মানুষের বুদ্ধিও তাহলে এই বিদ্যুতের সাহায্যে দূর দেশে পাঠানো সম্ভব? তাহলে এই

ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের সত্যিকার আবিষ্কর্তা কে? ঐ হতভাগা জোচ্চোর মরস? না তিনি নিজে?

বছরের পর বছর ধরে জ্যাকসন সবাইকে বোঝাতে চাইলেন, টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা আসলে তিনি স্বয়ং। মরস তাঁর এই আবিষ্কার চুরি করে নিজের নামে চালাচ্ছে।

মরস-এর ওপর নিদারুণ ঘৃণা, ঈর্ষা ও প্রতিহিংসায় তিনি অনুক্ষণ জ্বলতে লাগলেন। মরসকেও অনেক জ্বালাতন করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে কোন লাভ হল না। তাঁর কথা কেউ মানল না। টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁর হাত থেকে ফস্‌কে গেল।

এই জ্যাকসনের কাছেই মর্টন ডাক্তারী শিখতে লাগলেন। এতদিনে মর্টন নকল দাঁত তৈরির এক কারখানা খুলেছেন। ব্যাবসাও বেশ ভাল চলছে।

হোরেস ওএলস-এর কাছ থেকে হাসির গ্যাস শুঁকিয়ে বিনা ব্যথায় দাঁত তোলার কায়দা মর্টন সব শিখেছেন। কিন্তু সেদিন হাসপাতালে ঐ কাণ্ডের পর এবং ওএলস-এর হাতে একটি রুগীর মৃত্যুর পর এই গ্যাস ছাড়া আর কি উপায়ে বেহুঁশ করা যায়, তাই তিনি খুঁজতে লাগলেন।

ইথারে যে মত্ততা হয়, তা মর্টন জানতেন। তাই বাড়িতে তিনি নিজের বুদ্ধিমত ইথার শুঁকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। কুকুরকে শোঁকালেন, নিজে শুঁকলেন, কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা হল না। নাইট্রাস অক্সাইডের বদলে ইথার কি করে রুগীকে শোঁকানো যেতে পারে তার কায়দা তাঁর মাথায় এল না।

হাসির গ্যাস, অর্থাৎ নাইট্রাস অক্সাইড লোহার সিলিণ্ডারে আবদ্ধ থাকে। স্ক্রু খুললেই হুস হুস করে গ্যাস বেরোয়। টিউব দিয়ে এই গ্যাস রবার ব্যাগে ঢুকিয়ে রুগীর নাকে মুখে ধরা যায়। কিন্তু ইথারে তা হয় না। কাঁচের বোতলে ইথার ছিপি আঁটা থাকে। রুমালে ঢেলে ইথার শুঁকতে হয়।

হাসির গ্যাসের (নাইট্রাস অক্সাইডের) বদলে ইথার কি করে ব্যবহার করা যায়, নিজের বুদ্ধিতে মর্টন তার কোন উপায় বার করতে পারলেন না। কাজেই একদিন তাঁর শিক্ষক ডাঃ জ্যাকসনের কাছে গেলেন। বললেন, আপনার গ্যাস শোঁকাবার রবার ব্যাগটা আমার একটু দরকার। কয়েকদিনের জন্য ওটা আমাকে দেবেন কি?

ডাঃ জ্যাকসন বললেন, তাহলে ডাক্তার তোমার সবই আছে শুধু ঐ ব্যাগ বাদে ?

মর্টন ভাবলেন জ্যাকসন বুঝি তাঁর মতলব বুঝে ফেলেছেন। তবু মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন না করে মর্টন বললেন, ব্যাগটা আমার দরকার ঠিক গ্যাস দেওয়ার জন্য নয়। ওটা থাকলে রুগী ভাববে আমি গ্যাস দিচ্ছি। তাতেই আমার কাজ হবে।

জ্যাকসন হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, এটা তো বেশ বলেছ ?

তখন মর্টন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, হাসির গ্যাসের বদলে যদি আমি ইথার দিই, তাহলে কি হয় ?

জ্যাকসন বললেন, ইথার দিতে হলে ব্যাগের চেয়ে একটা কাঁচের ফ্লাস্ক, তার মধ্যে স্পঞ্জে-ভরা ইথার রেখে রবার টিউব দিয়ে রুগীর নাকে মুখে একটা রবারের ঢাকনায় নিয়ে গেলে বেশি ভাল কাজ হবে।

কোথায় গেলে এসব যন্ত্র পাওয়া সম্ভব, তাও জ্যাকসন মর্টনকে বুঝিয়ে দিলেন।

এই ইথার মর্টনকে পেয়ে বসল। বাজার থেকে ইথার কিনে মর্টন রুগীদের এই নতুন উপায়ে শুঁকিয়ে দাঁত তুলতে লাগলেন। দেখলেন, রুগীরা সত্যি ব্যথা পায় না। তখন জুলাই মাস। ১৮৪৫ সাল।

এই সময় জ্যাকসনের স্ত্রীর একদিন দাঁতে ব্যথা হল। মর্টন সেই দাঁত তুলে দিলেন। কিন্তু জ্যাকসন ইথার শোঁকাতে দিলেন না। কারণ ইথার কি জিনিস মর্টনের চেয়ে জ্যাকসন অনেক বেশি জানতেন। তাই ইথারে জ্যাকসনের অত ভয়।

কিন্তু মর্টন জ্যাকসনের মত পণ্ডিত নন। কাজেই তাঁর কোন ভয়ডর নেই। নির্ভয়ে তিনি ইথার শুঁকিয়ে রুগীর ভাঙা দাঁতের গোড়া তুলে দিতে লাগলেন। নকল দাঁত বসানো এখন অনেক সহজ হল। রুগীরা কোন ব্যথা পেল না। নতুন দাঁত ব্যবহার করে আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি আরাম পেল। মর্টন এসব খবর জ্যাকসনের কাছে গোপন রাখলেন।

মর্টনের মনে হল, এইবার তিনি অজ্ঞান করার যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, তাতে অনায়াসে রুগীকে যতক্ষণ ইচ্ছা বেহুঁশ করে রাখা যাবে। বড় বড় অপারেশন এখন থেকে এই ইথার দিয়েই করা সম্ভব হবে। হোরেস ওএলস-এর মত আর অমন অপদস্থ হতে হবে না।

কিন্তু তার আগে হাসপাতালে আর একবার রুগী অজ্ঞান করে দেখানো চাই। বোঝানো চাই, সত্যি নতুন এক ওষুধ মর্টন আবিষ্কার করেছেন যার ফলে বিনা ব্যথায় বড় বড় অপারেশন করা চলে।

কিন্তু পুরনো এই ইথারকে কি করে মর্টন নিজের আবিষ্কার বলে চালাবেন? ইথারের উগ্র গন্ধ ডাক্তারদের চেনা; ছাত্রদেরও জানা। ইথার পার্টির কল্যাণে বহু যুবক-যুবতীরও এ-গন্ধ অতি পরিচিত। তাহলে কি করা যায়? এর গন্ধ কি কোনও উপায়ে বদলে দেওয়া যায় না?

১৮২৩ সালে দাঁত তোলা

মর্টন আবার একদিন জ্যাকসনের কাছে গেলেন। একথা সেকথার পর ইথারের কথা উঠল। জ্যাকসন জিজ্ঞাসা করলেন, কি ডাক্তার, ইথার শুঁকিয়ে দাঁত তোলা গেল?

মর্টন বললেন, না। বিচ্ছিরি গন্ধ। কেউ পছন্দ করে না।

জ্যাকসন আবার বক্তৃতা শুরু করলেন। কি করে ইথারের বর্ণ ও গন্ধ বদলানো যায়, তাই মর্টনকে বোঝাতে লাগলেন।

মর্টনের কাজ হাঁসিল হল। বাড়ি ফিরে তিনি এক কেমিস্টের দোকানে গেলেন। তারপর গন্ধদ্রব্য কিনে ইথারের সঙ্গে মেশালেন এবং রঙ মিশিয়ে বর্ণ

পরিবর্তন করলেন। এই নতুন ওষুধের নাম দিলেন লিথিঅন, কিন্তু জ্যাকসনকে কিছু বললেন না।

এইবার সব দিক থেকে আটঘাট বেঁধে সতর্ক হয়ে মর্টন ম্যাসাচুসেটস হাসপাতালে গেলেন এবং সার্জন ওআরেনের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন অজ্ঞান করার নতুন এক ওষুধ তিনি বার করেছেন। তাই দিয়ে দাঁত তুলে পরীক্ষা করেও দেখেছেন। এখন হাসপাতালে একবার বড় অপারেশনে এর ফল দেখাতে চান।

ডাঃ ওআরেন রাজী হলেন। ঠিক হল, এক টিউমার কাটার অপারেশনে মর্টন এই নতুন ওষুধ ব্যবহার করে দেখাবেন।

সেদিন ১৬ই অক্টোবর, ১৮৪৬। অপারেশন থিয়েটার আজ লোকে ভর্তি। কাঠের টেবিলের ওপর রুগী শুয়ে। তার চোয়ালে বড় একটি টিউমার। নার্স যন্ত্রপাতি সব ঠিক করে রেখেছে। ডাক্তার ওআরেন পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। ছাত্ররা বেঞ্চে ঠেলাঠেলি করে বসেছে। ভাল করে দেখতে পাবে এই আশায় কেউ কেউ গ্যালারির সামনে মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসেছে। ছাত্র এবং ডাক্তার ছাড়াও বাইরের কোন কোন লোক মজা দেখতে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকেছে।

অপারেশনের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হল। ডাঃ ওআরেন অপেক্ষা করতে লাগলেন। সমস্ত অপারেশন থিয়েটার নিস্তব্ধ। দেখতে দেখতে পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল, মর্টন এলেন না।

ডাঃ ওআরেন ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাঃ মর্টন এখনও এসে পৌঁছলেন না। নিশ্চয় তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন।

ছাত্ররা সবাই হেসে উঠল। খুব মজা পেল এই কথা শুনে। কেউ কেউ বলল, তিনি আর এপথ মাড়াবেন না।

ডাঃ ওআরেন ছুরি হাতে নিলেন। রুগীর গায়ে বসাতে যাবেন এমন সময় মর্টন থিয়েটারে ঢুকলেন। হাতে তাঁর ইথার শোঁকাবার যন্ত্র। এইটেই দোকান থেকে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছায় নি বলে তাঁর এত দেরি।

ডাঃ ওআরেন ছুরি হাতে সরে দাঁড়ালেন। বললেন, ডাঃ মর্টন রুগী প্রস্তুত।

মর্টন গম্ভীর মুখে এগিয়ে এলেন। রুগীকে জিজ্ঞাসা করলেন, নতুন এই ওষুধ শুঁকে বেহুঁশ হতে তার কোন আপত্তি নেই তো?

রুগী বলল, না।

মর্টন তাঁর যন্ত্র ঠিক করে তখন রুগীর নাকে মুখে লাগালেন। ভাল্‌ভ লাগানো কাঁচের একটা গোলক তার মধ্যে স্পঞ্জে ভেজা ইথার। তাই থেকে নল দিয়ে রবারের একটি বাটিতে লাগানো। এই বাটি মর্টন রুগীর নাকে মুখে ধরলেন। রুগী যখন নিশ্বাস নিল, কাঁচের গোলকে টান পড়ে ভালভ খুলে হাওয়া ঢুকল এবং স্পঞ্জে ভেজা ইথারের সঙ্গে মিশে রুগীর নাকে মুখে এল। রুগী যখন প্রশ্বাস ছাড়ল, ঠোঁটের পাশ দিয়ে সে হাওয়া বাইরে বেরিয়ে গেল। খুব সাদাসিধে যন্ত্র; কিন্তু চমৎকার কার্যকরী।

ইথার শুঁকলে মদের মত দেহে প্রথমে উত্তেজনা আসে। মুখ চোখ লাল হয়। রুগী হাত-পা ছোঁড়ে। তাই তাকে জোর করে ধরে রাখতে হয়।

এই রুগীটিও প্রথমে একটু ছটফট করল। তারপর শান্ত হয়ে গেল এবং নাক ডাকতে শুরু করল।

মর্টন এবার বললেন, ডাঃ ওআরেন আপনার রুগী এখন প্রস্তুত। অর্থাৎ আপনি এবার ছুরি চালাতে পারেন।

ডাঃ ওআরেন ছুরি বসিয়ে দিলেন। চটপট টিউমার কেটে বার করলেন। রুগী কিন্তু একটুও নড়ল না। যেমন ঘুমুচ্ছিল তেমনি আরামে নাক ডাকতে লাগল।

সমস্ত অপারেশন থিয়েটার নিস্তব্ধ। বিস্ময়ে অবাক হয়ে সবাই আজ এই অপারেশন দেখতে লাগল। ছাত্ররা সব হঠাৎ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ডাঃ ওআরেন-এরও এই অভিজ্ঞতা আজ নতুন। আগে অপারেশনের সময় রুগী যন্ত্রণায় ছটফট করত। চেঁচিয়ে কঁকিয়ে থিয়েটার মাত করত। টেবিলে ধরে রাখতে জোয়ান জোয়ান সব ছাত্রদের দরকার হত। টেবিলের দুদিকে ছেঁদার ভেতর স্ট্র্যাপ ঢুকিয়ে রুগীকে বেঁধে রাখতে হত। তবু কিন্তু তার চীৎকার বন্ধ করা যেত না। সার্জনকে তাই ক্ষিপ্রগতিতে অপারেশন শেষ করতে হত। যিনি যত তাড়াতাড়ি অপারেশন শেষ করতেন, তাঁর তত বেশি সুনাম হত।

আজ কিন্তু রুগী একটুও নড়ল না। কোনো চেঁচামেচি করল না। ছুরির আঘাতে কোনো ব্যথা পেল না। দিব্বি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল সে।

ডাঃ ওআরেন অভ্যাসমত ক্ষিপ্রগতিতে অপারেশন শেষ করলেন। টিউমার কেটে বাদ দিলেন। চামড়া সেলাই করলেন। অপারেশন শেষ করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার সময় রুগী জেগে উঠল।

বলল, এতক্ষণ কি হয়েছে কিছুই সে জানে না। কোনো ব্যথা পায় নি।

ডাঃ ওয়ারেনের মনে পড়ল, কিছুকাল আগে হোরেস ওএলস যখন হাসির গ্যাস শুঁকিয়ে এই হাসপাতালে দাঁত তোলেন, তখন রুগী যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠেছিল বলে ছাত্ররা সব হেসেছিল। বলেছিল, জোচ্চোর, হামবাগ।

আজ সেকথা স্মরণ করে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছাত্রদের ডাঃ ওআরেন বললেন, ভদ্রমহোদয়গণ, এ জোচ্চুরি নয়। (জেণ্টলমেন, দিস ইজ নো হামবাগ।)

দর্শকদের মধ্যে হাসপাতালের ভিজিটিং চিকিৎসক হেনরী জ্যাকব বিজলো ছিলেন। ডাঃ ওআরেনের এই কথার পর গুরুগম্ভীর স্বরে তিনি বলে উঠলেন, আজ যা আমি দেখলাম, সারা পৃথিবীময় তা ছড়িয়ে পড়বে।

১৬ই অক্টোবর ১৮৪৬, ইথার দিবস। মানবদেহের ব্যথা এবং কষ্ট বিজয়ের স্মরণীয় এক দিন।

পরদিন এই হাসপাতালে আর একটি বড় অপারেশন হল। ঘাড়ের ওপর বড় একটি চর্বির টিউমার। সার্জন জন হেওআর্ড এই অপারেশন করলেন। মর্টন লিথিঅন শুঁকিয়ে তাকেও অজ্ঞান করলেন। কোনো বিপত্তি হল না। রুগী কিছুই টের পেল না। মর্টনের জয়জয়কার হল।

হেনরী জ্যাকব বিজলো এই আবিষ্কার বোস্টন মেডিক্যাল এণ্ড সার্জিক্যাল জার্নালে প্রকাশ করলেন, ১৮ই নভেম্বর, ১৮৪৬ সালে।

এই সাফল্যে মর্টনের মাথা গরম হয়ে গেল। তাঁর আবিষ্কারে সারা পৃথিবীতে হুলুস্থুল পড়ে যাবে, দেশে দেশে সার্জনরা অপারেশনের আগে এই লিথিঅন ব্যবহার করবে, তাঁরই আবিষ্কৃত যন্ত্র লাখে লাখে বিক্রি হবে, এই চিন্তায় তিনি আহার-নিদ্রা ভুলে গেলেন। মাথার মধ্যে তাঁর নানারকম পরিকল্পনা আসতে লাগল। তাঁর নকল দাঁতের কারখানা অবহেলায় নষ্ট হতে চলল। দাঁতের ডাক্তারী বন্ধ হয়ে গেল। মর্টনের এখন এক চিন্তা। কি করে এই অজ্ঞান করার নতুন প্রক্রিয়া চালু করা যায়। কি করে এর সর্বস্বত্ব নিজের হাতে রাখা যায়।

অলিভার ওএনডেল হোমস তখন হারভার্ডের অধ্যাপক। খুব পণ্ডিত লোক। তিনি এই অজ্ঞান করার পদ্ধতির নামকরণ করলেন। অজ্ঞান করার নাম হল অ্যানএস্থেশিয়া। আর যে জিনিস দিয়ে অজ্ঞান করা যায়, তা অ্যানএসথেটিক। সেই থেকেই যিনি অজ্ঞান করেন, তিনি

অ্যানএসথেটিস্ট। এই নামকরণ হল—২১শে নভেম্বর, ১৮৪৬ সালে। হোমস্ এক চিঠিতে মর্টনকে এই নতুন নামকরণ লিখে জানালেন।

মর্টন এবার তাঁর এই লিথিঅন আমেরিকার সেনা ও নৌবিভাগে ব্যবহার করার জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু সে আবেদন অগ্রাহ্য হল। সেনাবিভাগ থেকে বলা হল, এ জিনিস এত বেশী দাহ্য যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা খুবই বিপজ্জনক।

মর্টন আশা করেছিলেন, তাঁর লিথিঅন আসলে কি, কেউ তা বুঝতে পারবে না। মাসাচুসেটস্ হাসপাতালের ডাক্তাররা সবাই বুঝেছিলেন, তবু

ষোল শতকের দু-শ বছর পরেও আঠারো শতকে
অস্ত্রোপচারের সেই একই দৃশ্য

মর্টনের কৃতিত্ব কখনও তাঁরা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু বিপদ হল প্রধান বিজ্ঞানী মর্টনের গুরু ডাঃ জ্যাকসনকে নিয়ে।

জ্যাকসন নিজে এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবী করলেন। একবার টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের সবটুকু কৃতিত্ব একা মরস তাঁকে ঠকিয়ে নিয়ে গেছে। এবার তিনি আর ছাড়লেন না। মর্টনের সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে রইলেন। বলা উচিত, মর্টনের টুঁটি চেপে ধরলেন।

মর্টন তখন এই লিথিঅন পেটেণ্ট করার স্বপ্ন দেখেছেন। যে যেখানে এই লিথিঅন ব্যবহার করবে, তার জন্য মর্টন রয়্যালটি পাবেন। প্রচুর অর্থাগম হবে। জ্যাকসন পণ্ডিত লোক, বিজ্ঞানী। আমেরিকায় তাঁর যথেষ্ট

প্রতিপত্তি। কাজেই এই লোকটিকে না চটিয়ে নিজের হাতে রাখলে ভবিষ্যতে এই পেটেণ্ট করায় অনেক বেশী সুবিধে হবে মনে করে মর্টন জ্যাকসনের সঙ্গে একটা রফা করে ফেললেন। ঠিক হল এই লিথিঅন পেটেণ্ট হলে লাভের শতকরা দশভাগ পাবেন জ্যাকসন এবং পঁচিশ ভাগ তাঁদের উকিল। মর্টন এইবার জ্যাকসনের অংশীদার হয়ে বাঁধা পড়লেন।

কিন্তু এই জিনিস পেটেণ্ট হবে কি করে? লিথিঅন আসলে ইথার। বহুপূর্বে তা আবিষ্কার হয়েছে। ইথার পার্টিতে এই ইথারের ব্যবহার হয়েছে। ইথার শুঁকে যে মত্ততা হয়, কে তা না জানে? তাহলে কিসের উপর এই পেটেণ্ট? মানুষের ব্যথা দূর করবার উপর? তাহলে মানুষের সুখের উপব, আনন্দের উপর পেটেণ্ট দাবি করতে বাধা কি?

মর্টনের কোনো অনুমতি না নিয়ে ইওরোপের সার্জনরা ইথার ব্যবহাব শুরু করলেন। এমন কি মর্টনের নিজের দেশে যে সৈন্য এবং নৌবাহিনী আগে মর্টনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন, তাঁরা পর্যন্ত এখন এই ইথার ব্যবহার শুরু করলেন, মর্টনকে না জানিয়ে। মর্টন ভয় দেখালেন, সব ডাক্তারের নামে তিনি মামলা করবেন।

কিন্তু ডাক্তাররা এই হুমকিতে মোটেই কোনো ভয় পেলেন না। সবাই ইথার ব্যবহার করতে লাগলেন। মর্টন দেখলেন, আইনত তাঁর কোনো দাবি টেঁকে না। কাজেই পেটেণ্ট তিনি পাবেন না। অতএব জ্যাকসনের সঙ্গে অংশীদারী তাঁর ছুটে গেল। কিন্তু জ্যাকসন তাঁকে ছাড়লেন না।

পুরনো ইথারকে লিথিঅন বলে চালাবার চেষ্টায় মর্টনেব অনেক শত্রু বাড়ল। কাগজে কাগজে তাঁর নিন্দে বেরুতে লাগল। এমন কি মাসাচুসেটস হাসপাতালের ডাক্তাররা পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এমনি সব কথা উঠল। জ্যাকসন নিজে এসব রটাতে লাগলেন। ফলে একদিন মর্টনের কুশপুত্তলিকা তাঁর বাড়ির সামনে লোকে দাহ করল।

অবশেষে মর্টন এক প্রবন্ধ লিখে স্বীকার করলেন, এই লিথিঅন আসলে ইথার। এই প্রবন্ধ বোস্টনে প্রকাশিত হল ১৮৪৭ সালে।

মর্টনের প্রধান শত্রু এখন জ্যাকসন। ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমিতে জ্যাকসন একটা চিঠি লিখলেন। মর্টনের কোনো উল্লেখ না করে কি করে তিনি এই অজ্ঞান করার পদ্ধতি আবিষ্কাব করেছেন, তা ফলাও করে বর্ণনা করলেন।

খবর পেয়ে মর্টন তাড়াতাড়ি প্যারিসে এক দূত পাঠালেন। জ্যাকসন

যা ক্ষতি করেছেন, এই দূত গিয়ে কিছুটা তা খণ্ডন করলেন। কিন্তু ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি মর্টন এবং জ্যাকসন দুজনকেই আবিষ্কর্তা বলে ঘোষণা করলেন এবং দু-হাজার ফ্রাঁ পুরস্কার দিলেন। মর্টন এ পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন এই টাকায় সোনার একটা মেডেল এবং সোনার একটা ফ্রেম কেনা হল। তাতে নাম থাকল শুধু উইলিআম মর্টনের। মর্টন এইবার খুশি হলেন।

অপরে যে যাই বলুক না কেন, মাসাচুসেটস হাসপাতালের ডাক্তাররা মর্টনকেই এই আবিষ্কারের সম্মান দিলেন। হাসপাতাল থেকে এক হাজার ডলার তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হল।

মর্টন যখন দেখলেন এই আবিষ্কারের কোনো পেটেন্ট পাবার তাঁর কোনো আশা নেই, তখন গভর্নমেন্টের কাছে এক আবেদন পেশ করলেন। ভাবলেন, জনহিতকর এত বড় এক আবিষ্কারে কংগ্রেস নিশ্চয়ই তাঁকে যথেষ্ট পুরস্কার দেবেন। বড় বড় রাষ্ট্রবিদ এবং মাসাচুসেটস হাসপাতালের ডাক্তাররা তাঁর এই দাবি সমর্থন করলেন।

এখানেও তাঁর চিরশত্রু জ্যাকসন এসে বাগড়া দিলেন এবং মর্টনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে একটা দল তৈরী করলেন। ভোটে মর্টন হেরে গেলেন।

এখন থেকে মর্টনের কাজ হল কংগ্রেসের সভ্যদের কাছে গিয়ে তদ্বির করা। নিজের দাঁতের ব্যবসা নষ্ট হল, ডাক্তারী উঠে গেল। মর্টন এই তদ্বির নিয়ে পড়ে রইলেন।

মর্টন দ্বিতীয়বার আবেদন করলেন। এবারও কংগ্রেস তাঁর খুব প্রশংসা করল, সুখ্যাতি করল, বাহবা দিল ; কিন্তু অর্থসাহায্য করল না।

মর্টন তৃতীয়বার আবেদন করলেন। এবার হঠাৎ সেই হোরেস ওএলস প্যারিস থেকে ফিরে এসে বললেন, হাসির গ্যাস শুঁকিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম রুগীকে বেহুঁশ করে দাঁত তোলেন। মর্টন তাঁর কাছ থেকেই এ বিদ্যা শিখেছেন। অতএব অজ্ঞান করার পথিকৃত তিনি। মর্টন নয়। আবার মর্টনের আবেদন অগ্রাহ্য হল।

মর্টন কিন্তু ছাড়লেন না। চতুর্থবার তিনি পুরস্কারের জন্য আবেদন করলেন। এবার সেনা এবং নৌবিভাগ এ প্রস্তাব সমর্থন করল। কথা হল এক লক্ষ ডলার মর্টনকে এই আবিষ্কারের জন্য দেওয়া হবে। জ্যাকসন আবার দল পাকালেন এবং বাধা দিলেন।

কিন্তু অতর্কিতে মোক্ষম যে আঘাত এবার এল, তার জন্য মর্টন মোটেই তৈরী ছিলেন না। এমন কি তাঁর অত বড় প্রধান শত্রু জ্যাকসনও না।

হঠাৎ কংগ্রেসের কাছে এক চিঠি এল যে, ইথারের এই গুণের আবিষ্কারক, জর্জিয়ার এক গ্রাম্য ডাক্তার, ক্রফোর্ড উইলিআমসন লঙ। তিনিই এই ইথার সর্বপ্রথম সার্জারিতে ব্যবহার করেন ১৮৪২ সালে। মর্টনের চার বছর আগে।

লঙ এখন নিজের গ্রাম জেফার্সন ছেড়ে এথেন্স শহরে উঠে এসেছেন। ডাক্তার হিসেবে তাঁর সুনামও হয়েছে। কাগজে ইথার নিয়ে এই বাদানুবাদ দেখে এতদিনে তিনি তাঁর নিজের দাবি কংগ্রেসের কাছে পেশ করলেন।

এই কথা শুনে জ্যাকসন বোস্টন ছেড়ে তাড়াতাড়ি এথেন্সে এলেন এবং লঙ-এর সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, আসুন আমরা দুজনে জোট হয়ে ঐ বদমায়েশ মর্টনের বিরুদ্ধে লড়াই করি। আমরা বলব, ইথারের গুণ আমি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করি, আর আপনিই সর্বপ্রথম তা রুগীর ওপর প্রয়োগ করেন।

ক্রফোর্ড লঙ কিন্তু এই শহুরে বিজ্ঞানীকে কোনো পাত্তাই দিলেন না। নিজের লেজার বই খুলে দেখালেন, জেমস ভেনএবলস-এর টিউমার তিনি অপারেশন করেছেন, ইথার প্রয়োগ করে ১৮৪২ সালে। তখন জ্যাকসন কোথায়?

জ্যাকসনের কোনো প্রলোভনে ক্রফোর্ড লঙ ভুললেন না। ব্যর্থ হয়ে, নিষ্ফল আক্রোশ নিজের মনে চেপে জ্যাকসন ফিরে এলেন। এই কীটাণুকীট গেঁয়ো ডাক্তারটা পর্যন্ত তাঁর মত এত বড় বিজ্ঞানীকে অনায়াসে হারিয়ে দিল। টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের কৃতিত্ব তো তাঁর আগেই গেছে, অজ্ঞান করার আবিষ্কারের এই পদ্ধতিও তাঁর হাত থেকে ফসকে গেল। এই পরাজয় জ্যাকসন সইতে পারলেন না। মাথাটা তাঁর হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। অবশেষে পাগলাগারদে তাঁর একদিন মৃত্যু হল।

অজ্ঞান করবার যাঁরা পথিকৃত, সকলের ভাগ্যই প্রায় অনুরূপ। হোরেস ওএলস সর্বপ্রথম হাসির গ্যাস (নাইট্রাস অক্সাইড) শুঁকিয়ে রুগীকে বেহুঁশ করে দাঁত তুলেছিলেন। ম্যাসাচুসেটস হাসপাতালে এই গ্যাস শোঁকাতে গিয়ে তিনি অপদস্থ হলেন। নিজের চেম্বারে এই গ্যাস শুঁকে একটি রুগী মরে গেল বলে তাঁকে দাঁতের ডাক্তারী ছাড়তে হল। তিনি প্যারিসে চলে

গেলেন। সেখানে গিয়ে হাসির গ্যাস শুঁকিয়ে অজ্ঞান করার প্রবর্তক বলে তিনি অবশ্য সামান্য কিছু সম্মান পেলেন। কিন্তু দেশে ফিরে দেখলেন, তারই ছাত্র উইলিআম মর্টন অজ্ঞান করার আবিষ্কারক বলে কংগ্রেসের কাছে পুরস্কার দাবি করেছেন।

ওএলস প্রতিবাদ করলেন এবং নিজের দাবি উপস্থিত করলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁরও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল। প্রকাশ্য রাস্তায় একদিন এক বারবণিতার মুখে তিনি অ্যাসিড ছুঁড়ে মারলেন। ফলে তাঁকে হাজতে যেতে হল। সেখানে গিয়ে তিনি একদিন আত্মহত্যা করলেন, ১৮৪৮ সালে।

মর্টন সর্বপ্রথম অপারেশনের আগে হাসপাতালে ইথার প্রয়োগ করে রুগীকে অজ্ঞান করেন। কাজেই তিনি বিশ্বাস করতেন অজ্ঞান করার এই পদ্ধতির তিনিই একমাত্র পথিকৃত এবং আবিষ্কারক। জ্যাকসনের দাবিকে তাই এতদিন অনায়াসে তিনি অবজ্ঞা করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু কখনও হার মানেন নি। কংগ্রেস তাঁর দাবি অগ্রাহ্য করলেও নতুন উদ্যমে তিনি আবার তাঁর দাবি পেশ করেছেন। তদ্বির করেছেন।

কিন্তু এতদিন পরে আজ ক্রফোর্ড লঙ তাঁর ইথার প্রয়োগের ঘটনা ব্যক্ত করে মর্টনের সর্বনাশ করে দিলেন। যে এক লক্ষ ডলার গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে পাবেন বলে মর্টন এতদিন আশা করেছিলেন তা মরীচিকার মত মিলিয়ে গেল। এতদিনকার এই সংগ্রাম, উত্তেজনা এবং অর্থকষ্টে তাঁর দেহ-মন ভেঙে গেল। স্ত্রীর সঙ্গে গাড়িতে করে নিজের বাড়ি ফেরবার পথে একদিন মর্টন সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হলেন। মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হল, ১৮৬৮ সালে।

এই আবিষ্কারের জন্য মর্টন চেয়েছিলেন যশ, মান, প্রতিপত্তি এবং অর্থ। জীবিতকালে কিছুই তিনি পান নি। নিদারুণ অর্থকষ্টে মর্টনের শেষজীবন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে মর্টনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সেখানে অজ্ঞান করার প্রবর্তক ক্রফোর্ড লঙ নন, উইলিআম টমাস গ্রীন মর্টন।

মার্কিনী ধোঁকা

বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য যখন কোথাও অস্ত যেত না তখন ইংলণ্ডে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব। সেই সময় শক্তিতে, ঐশ্বর্যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ব্রিটিশ জাতি অগ্রগণ্য। সারা পৃথিবী ব্রিটিশ সিংহের দাপটে কম্পমান।

রবার্ট লিসটন তখন লণ্ডনের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্জন। লিসটন আসলে স্কটল্যাণ্ডের লোক। তিনি ছিলেন এডিনবরার সার্জন। সার্জনদের মধ্যে রেষারেষিতে এডিনবরায় স্থান না পেয়ে তিনি লণ্ডনে চলে আসেন। লণ্ডনে এসে নিজের দক্ষতা দেখাবার সুযোগ পান। ক্রমে একদিন অভিজাত শ্রেণীর সেরা সার্জন হয়ে ওঠেন।

রবার্ট লিসটন সুপুরুষ। যৌবনে দেহে তিনি অসাধারণ শক্তি রাখতেন। ছাত্রাবস্থায় শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য কবর থেকে শব চুরির দলের তাই তিনি বড় একজন পাণ্ডা ছিলেন। চল্লিশের উপরে দেহ তাঁর যদিও কিছু মেদবহুল হয় তবু তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন।

গল্প আছে, একবার এক টিউমারের রুগী অপারেশনের আগেই ভয়ে টেবিল থেকে উঠে দৌড়ে পালিয়ে যায় এবং বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষা করে। লিসটন নিজে গিয়ে দরজায় কাঁধ লাগিয়ে চাপ দিয়ে ছিট্‌কিনি ভেঙে ফেলেন। তারপর রুগীকে ধরে টেবিলে এনে অপারেশন করেন।

তখনকার দিনের অপারেশন এই রকমই ছিল। রুগীকে বেহুঁশ করবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাই জোর করে তাকে টেবিলে ধরে রাখতে হত। ধরে রাখবার জন্য ঘণ্টা বাজিয়ে ছাত্রদের ডাকা হত। টেবিলে শুইয়ে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে রুগীকে বেঁধে রাখা হত।

ফাঁসীর আসামীর মত অসহায় রুগী অপারেশনের দিন গুণত আর সার্জনের হাতে বলি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করত। রুগীর কাছে সার্জন তখন ঠিক যেন বধ্যভূমির ঘাতক।

নির্দিষ্ট দিনে অপারেশন টেবিলে শুয়ে রুগী রাস্তায় সার্জনের গাড়ির শব্দ শুনে চমকে উঠত। ভয়ে আতঙ্কে তার শ্রবণশক্তি প্রখর হত। শুনত, সদর দরজায় এইমাত্র সার্জনের গাড়ি থামল। সার্জন নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠে কলিং বেল টিপলেন। তারপর কানে আসত সার্জনের ধীর মন্থর ভারী পদশব্দ; অপারেশন থিয়েটারের দিকে সগর্বে অগ্রসর। থিয়েটারে ঢুকে গম্ভীর স্বরে রুগীকে দুটি একটি কথা বলা। তারপর যন্ত্রপাতি সাজানোর ঝনঝন আওয়াজ। সার্জনের প্রস্তুতির শব্দ। ফাঁসির দিনে আসামী যেমন জল্লাদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়, রুগীও তেমনি অপারেশনের আগে সার্জনের হাতে নিজেকে সমর্পণ করত।

তখন ১৮৪৬ সাল। রবার্ট লিসটন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতালের বড় সার্জন। এই হাসপাতালে মেডিসিনের প্রফেসর জন ইলিঅটসন তখন দুটি তরুণীকে মেসমারের পদ্ধতিতে মোহাবিষ্ট করে চিকিৎসক এবং ছাত্র মহলে তুমুল হৈ চৈ বাধিয়েছেন। বর্জিত মেসমেরিজম আবার নতুন করে চালু করবার ব্যবস্থা করেছেন। বিজ্ঞানীরা এই মেসমেরিজম কোনদিনই মানতে পারেন নি। তাই হাসপাতালে এই নীতিবিরুদ্ধ বর্জিত-পদ্ধতি প্রয়োগ করা নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ শুরু হল।

কিন্তু বেশীদিন এই হৈ চৈ চলল না। সার্জারীতে ইথার ব্যবহার করে রবার্ট লিসটন সব বাদানুবাদ ঠাণ্ডা করে দিলেন। মেসমেরিজম-এর সঙ্গে সঙ্গে ইলিঅটসনেরও পতন হল।

রবার্ট লিসটন ছিলেন সার্জনদের মধ্যে অভিজাত শ্রেণীর। অপারেশনের আগে রুগীকে অজ্ঞান করার কোনো উপায় ছিল না বলেই তখনকার সার্জনরা খুব দ্রুত অপারেশন শেষ করতেন। যাঁর অপারেশন যত তাড়াতাড়ি শেষ হত তাঁর সুনাম তত বেশী হত। রবার্ট লিসটন তখনকার দিনের সবচেয়ে দ্রুত সার্জন। বিদ্যুৎ ঝলকের মত তাঁর ছুরি চলত এবং নিমেষে অপারেশন শেষ হত।

তখন আমেরিকায় মাসাচুসেটস হাসপাতালে মর্টন ইথার শুঁকিয়ে রুগী অজ্ঞান করেছেন। পর পর দুটো অপারেশন হয়ে গেছে। ডাঃ হেনরী জ্যাকব বিজলো বোস্টন মেডিক্যাল এণ্ড সার্জিকাল জার্নালে তা প্রকাশ করেছেন।

রবার্ট লিসটন খবর পেলেন, হাসপাতালের কাছেই গাওয়ার স্ট্রীটের এক ডাক্তার আমেরিকার ডাঃ হেনরী জ্যাকব বিজলোর এক চিঠিতে এই খবর

পেয়েছে এবং ইথার প্রয়োগ করে বিনা ব্যথায় দাঁত তোলাও হয়ে গেছে। তাই শুনে লিসটন অক্সফোর্ড স্ট্রীটের এক নামকরা কেমিস্টের দোকানে খবর পাঠালেন। বললেন, এই নতুন জিনিসটি তাঁর হাসপাতালে তিনি ব্যবহার করে দেখতে চান।

তখন লিসটনের ওয়ার্ডে বছর ত্রিশ বয়সের এক রুগী ছিল। নাম তার ফ্রেডরিক চার্চিল। বেচারার হাঁটুর নিচে পায়ের হাড় ভেঙে চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। ঘা হয়, জ্বর হয়। কয়েকমাস ঐ ঘায়ের জন্যে জ্বরে ভুগে বেচারা এবার বুঝেছে, এই পচা পা কেটে না ফেললে তার আর নিস্তার নেই।

অপারেশনের দিন ঠিক হল ২১শে ডিসেম্বর, ১৮৪৬। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের ঐ কেমিস্টের এক আত্মীয় ডাঃ উইলিআম স্কোয়ার একটা অদ্ভুত সাইজের বোতল ও রবারের নল নিয়ে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকলেন। তখনও সার্জন আসেন নি। রুগীকেও আনা হয় নি। শুধু ছাত্ররা, নার্সরা ও বেয়ারারা আছে।

নতুন ওষুধে কি রকম কাজ হয় দেখার জন্য একটা বেয়ারাকে টেবিলে শোয়ানো হল। রবারের নলটা তার মুখে ঢুকিয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বলা হল। কিন্তু বিশেষ কোনো সুবিধা হল না। বার কয়েক শ্বাস টেনে, কেশে হঠাৎ বেয়ারাটা টেবিল থেকে লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে গেল। ছাত্ররা সব হৈ হৈ করে উঠল। হাসতে লাগল।

এমনি সময় রবার্ট লিসটন ঘরে ঢুকলেন। মুহূর্তের মধ্যে ছাত্রদের হৈ চৈ বন্ধ হয়ে গেল। নার্স, বেয়ারা ডাক্তাররা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে অপারেশন থিয়েটার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। লিসটন পকেট থেকে লম্বা একটা বাক্স খুলে ছুরি বার করলেন, আঙুল দিয়ে ধার পরীক্ষা করলেন। কোটের বোতামের ঘরে লম্বা একটা সুতো ঝুলিয়ে নিলেন। অপারেশনের আগে এইভাবেই তখন সার্জনরা তৈরী হতেন।

ফ্রেডরিক চার্চিলকে স্ট্রেচারে করে আনা হল এবং টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হল।

রবার্ট লিসটন ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ আমরা মানুষকে অচৈতন্য করবার জন্য এক মার্কিনী ধোঁকা ব্যবহার করব। (উই আর গোইং টু ট্রাই এ ইয়াংকি ডজ ফর মেকিং পিপল ইনসেনসিবল)।

ডাঃ স্কোয়ার রবারের নল চার্চিলের মুখে ঢুকিয়ে নাক বন্ধ করে মুখ দিয়ে শ্বাস টানতে বললেন। সারা ঘর ইথারের উগ্র গন্ধে ভরে উঠল। ছাত্ররা

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগল। রুগীর পাশে দাঁড়িয়ে লিসটন আঙুল দিয়ে তাঁর লম্বা ছুরির ধার পরীক্ষা করতে লাগলেন। চাচিল লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে লাগল। শেষে নাক ডাকাতে শুরু করল। ডাঃ স্কোয়ার লিসটনকে ইশারা করে জানিয়ে রুগীর মুখ থেকে টিউব বার করে রুমালে ইথার ঢেলে নাকে মুখে চেপে ধরলেন।

রবার্ট লিসটন আবার ছুরি হাতে ছেলেদের দিকে তাকালেন। বললেন, সময়টা একটু দেখো ভাই।

ছেলেরা অমনি পকেট থেকে ঘড়ি বার করল। সবাই আবার এক তড়িৎগতির অপারেশন দেখার জন্যে প্রস্তুত হল। কারণ রবার্ট লিসটনের অপারেশন দেখতে হলে সর্বদা সতর্ক থাকা চাই। নইলে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তাঁর অপারেশন শেষ হয়ে যায়।

লিসটন বাঁ হাতের মোটা বুড়ো আঙুল রুগীর উরুতে চেপে রক্ত চলাচল বন্ধ করেন। ডান হাত দিয়ে ছুরি চালান। দাঁত দিয়ে করাত ধরে রাখেন। ছুরির কাজ শেষ হলে, চট করে ছুরি ফেলে করাত টেনে হাড় কাটেন। তারপর কোটের বোতামের ঘরে ঝোলানো সুতো দিয়ে শিরা ধমনী বেঁধে দেন।

ছাত্ররা আজ আবার লিসটনের ক্ষিপ্রগতির হাত চালানো দেখল। ঘস ঘস করে করাত চালানো শুনল। টেবিলের নিচে বালুভরা ট্রের ওপর ফ্রেডরিক চার্চিলের কাটা পা ধপ করে পড়ল।

লিসটন ধমনী বাঁধা শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, কতক্ষণ লাগল ভাই?

কেউ বলল, পঁচিশ সেকেণ্ড; কেউ বলল ছাব্বিশ। আটাশ সেকেণ্ডের বেশী কেউ আর বলল না। আধমিনিটেরও কম সময়ে প্রথম ছুরি বসানোর পর অপারেশন শেষ হয়ে গেল। এত কম সময়ে লিসটন এই অপারেশন আগে কখনও করেন নি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রুগী নড়ে চড়ে উঠল। চোখ মেলে তাকিয়ে এদিক ওদিক দেখে চেঁচিয়ে উঠল। বলল, কখন হবে অপারেশন? না না অপারেশন আমি করাব না। আমাকে ঘরে যেতে দাও।

মেঝেতে ট্রে-র ওপর রাখা কাটা পা দেখিয়ে চার্চিলকে শান্ত করা হল। বোঝানো গেল সত্যি অপারেশন হয়ে গেছে।

রবার্ট লিসটন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। রুগীকে মদ অথবা আফিং

খাইয়ে অপারেশন করা তিনি দেখেছেন। তাতে কিন্তু ব্যথা-বোধ রুগীর যেত না; অপারেশনের সময় চীৎকার করত, ছটফট করত। কিন্তু আজ সে মোটেই কিছু জানল না কখন অপারেশন হয়ে গেল। আবেগে অভিভূত হয়ে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস হাসপাতালের সার্জন ডাঃ ওআরেন যেমন ছাত্রদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, এ জোচ্চুরি নয়; তেমনি রবার্ট লিসটনও আজ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ফেললেন, ভদ্রমহোদয়গণ এই মার্কিনী ধোঁকা মেসমেরিজম-এর বারোটা বাজিয়ে দিল। (জেণ্টলমেন দিস ইয়াংকি ডজ বিটস মেসমেরিজম হলও)।

এর পর থেকেই হাসপাতালে জন এলিঅটসনের মেসমেরিজম বন্ধ হল। এলিঅটসন চাকরি ছেড়ে দিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলা চার্চিল কাটা উরুতে বেশ একটা যন্ত্রণা বোধ করল। মনে হল, পায়ের ওপর দিয়ে যেন একটা চাকা চলে যাচ্ছে। কিন্তু আস্তে আস্তে ঘা শুকিয়ে গেল। অপারেশনের মাস দুই পরে চার্চিল সুস্থ হয়ে বাড়ি গেল।

এই মার্কিনী ধোঁকার কথা শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। সব সার্জনরাই ইথার ব্যবহার শুরু করলেন। এই খবর এডিনবরায় পৌঁছল। সার্জারিতে এডিনবরা তখন খুব উন্নত। ডাঃ জেমস ইয়ং সিমসন এডিনবরা থেকে লণ্ডনে এসে লিসটনের কাছে সব শুনে গেলেন। নিজের প্র্যাকটিসে এখন থেকে অজ্ঞান করার এই পদ্ধতি চালু করার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি এডিনবরা ফিরে গেলেন।

রবার্ট লিসটন ইংলণ্ডে সার্জারির এই নতুন যুগের প্রবর্তক। তিনিই সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে অপারেশনের আগে ইথার ব্যবহার করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে রুগীকে অচৈতন্য করে সার্জারির কৃতিত্ব দেখানো লিসটনের ভাগ্যে আর ঘটে উঠল না।

বছরখানেকের মধ্যেই একদিন তিনি নিজের এক জাহাজ চড়ে সমুদ্রে বেড়াতে গেলেন। জাহাজের ওপর দাঁড়িয়ে সমুদ্রের বিরাট এবং বিচিত্র শোভা দেখে তিনি যখন তন্ময়, তখন অতর্কিতে মাস্তলের দড়ি ছিঁড়ে হঠাৎ একটা বাঁশ তাঁর বুকে এসে লাগল। রবার্ট লিসটন পড়ে গেলেন। বুকের ভেতরকার বড় একটি ধমনী ছিঁড়ে রক্তপাত হয়ে তক্ষুণি তাঁর মৃত্যু হল। লিসটনের তখন মাত্র ৫৩ বৎসর বয়স। অজ্ঞান করবার আর একজন প্রবর্তকের অকালে মৃত্যু হল।

"আমি দেবদূত"

স্যার ওআল্টার স্কটের পর উনিশ শতকের স্কটল্যাণ্ডে সবচেয়ে বেশী যিনি জনপ্রিয় তিনি স্যার জেমস ইয়ং সিমসন (১৮১১-১৮৭০)। সিমসন তখন এডিনবরা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং ধাত্রীবিদ্যার বিশেষজ্ঞ। কুইন স্ট্রীটে তাঁর বাড়ি। আর বিরাট তার প্র্যাকটিস।

ভারতবর্ষে যেমন তাজমহল আর প্যারিসে যেমন ইফেল টাওয়ার, তেমনি এডিনবরায় তখন সিমসন। জেমস সিমসনকে না দেখলে তখন স্কটল্যাণ্ডের কিছুই দেখা হত না। তাই বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক কি ভ্রমণকারী সবাই দেশবিদেশ থেকে সিমসনকে দেখতে তাঁর কুইন স্ট্রীটের বাড়িতে যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রাতরাশ কি মধ্যাহ্নভোজন করতেন।

এ হেন লোকটি প্রথম যখন এডিনবরায় আসেন, তখন কিন্তু কেউ তাঁকে চিনত না। মাত্র তেরো বৎসর তাঁর বয়স। নিতান্ত অপরিচিত বিরাট এই শহর। আর নিজে তিনি বন্ধুহীন। কপর্দকহীন।

জেমস-এর বাবা ছিলেন রুটি প্রস্তুতকারক। বাথগেট গ্রামে তাঁর বাড়ি। রুটি তৈরী করে কোনোরকমে তিনি সংসার চালাতেন। জেমস তাঁর সপ্তম সন্তান। জেমস-এর জন্মের পর রুটির ব্যাবসা আরও মন্দা হল এবং সংসার চালানো কঠিন হল। তাই দেখে জেমস-এর মা নিজে এই ব্যাবসা হাতে নিলেন। আর তাইতেহ্ সংসারটা কোনোরকমে উদ্ধার হল একেবারে ভরাডুবি থেকে।

আট বছর বয়সে জেমস-এর বুদ্ধি ও লেখাপড়ায় আগ্রহ দেখে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করা হল। পরিবারের মধ্যে এই ছেলেটিই লেখাপড়া শিখছে কাজেই সকলের গর্বের। তেরো বৎসর বয়সে তাঁকে এডিনবরা ইউনিভার্সিটিতে পাঠানো হল। সমগ্র পরিবার, বিশেষ করে তাঁর বড় ভাই আলেকজান্দার এজন্য আর্থিক কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হলেন এবং নিজের অনেক সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

এডিনবরায় এসে সিমসন অ্যাডাম স্ট্রীটে একখানা ঘর নিলেন। ভাড়া সপ্তাহে তিন শিলিং। কিন্তু ডাকটিকিটের দাম তখন প্যাকেট প্রতি সাড়ে ছ-পেনি। কাজেই মাসে একবারের বেশী বাড়িতে চিঠি লেখার কোনো উপায় তাঁর ছিল না।

সিমসন গ্রীক ও দর্শন ক্লাসে ভর্তি হলেন। কিন্তু বেশীদিন এই নীরস ক্লাস তাঁর ভাল লাগল না। এডিনবরায় তখন ডাঃ রবার্ট নকসের অ্যানাটমি ক্লাসের খুব নাম। দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে অ্যানাটমি শিখতে আসে। দেখতে দেখতে ছাত্রসংখ্যা পাঁচশ-র ওপর উঠে গেল। সিমসনও তাই গ্রীক এবং দর্শন ক্লাস ছেড়ে এই দিকে ঝুঁকলেন এবং একদিন ডাঃ নকসের ক্লাসে ভর্তি হলেন।

তখন শব-চোরদের রাজত্ব। চড়া দামে শিক্ষকদের কাছে তারা শব বিক্রি করে। শিক্ষকরাও তাই ছাত্রদের কাছে শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য চড়া দাম ধার্য করতেন। তাই জেমসএর তখনকার হিসেবের খাতায় দেখা যায়—শবের বাবদ দু-পাউণ্ড আর পায়ের হাড় এক পাউণ্ড এক শিলিং।

সিমসন ক্লাসে অসাধারণ কৃতিত্ব কিছুই দেখাতে পারেননি। আর ধাত্রীবিদ্যায় ছিলেন সবচেয়ে বেশী কাঁচা। বিকেলের দিকে এই ক্লাস শুরু হতেই ঘুমে তাঁর চোখ বুজে আসত। ক্লাসের পেছনে বসে তিনি ঢুলতেন। ধাত্রীবিদ্যা তখন অবশ্যশিক্ষনীয় একটা বিষয়ও ছিল না।

সিমসন আঠারো বৎসর বয়সে ডাক্তারী পাশ করে প্যাথলজির অধ্যাপকের সহকারী হয়ে অনেকদিন কাজ করেন। এই অধ্যাপকটিই সিমসনকে ধাত্রীবিদ্যা শেখার বুদ্ধি দেন। তাঁর কথায় সিমসন এইদিকে মন দিলেন। এই কাজে তিনি চটপট এত বেশী দক্ষ হয়ে উঠলেন যে, কয়েক বৎসর পরে ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক হ্যামিল্টন যখন অবসর নিলেন তখন এই শূন্য পদের জন্য তিনিও একজন প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। সিমসনের তখন মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়স।

অধ্যাপকের এই পদ নির্বাচন তখন এডিনবরা টাউন কাউন্সিলের হাতে। শুধু ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী হলেই এ পদ পাওয়া যায় না। অন্য অনেক কিছু গুণ থাকা চাই। তার মধ্যে সবচেয়ে যা বেশী প্রয়োজন সে হল আভিজাত্য। সিমসনের তা ছিল না। তিনি ছোট্ট এক গ্রামের সামান্য এক রুটি প্রস্তুতকারকের ছেলে। তাই অনেকে তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াল।

টাউন কাউন্সিলের তেত্রিশজন সভ্য। নির্বাচনপ্রার্থীরা ভোট সংগ্রহের জন্য কাউন্সিলারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগলেন। নিজ নিজ যোগ্যতা ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন ছাড়লেন, পুস্তিকা প্রকাশ করলেন, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার মারলেন। সিমসন নিজের যোগ্যতা, বক্তৃতা ও নিজের সংগ্রহশালার বিবরণ ছাপিয়ে বিলি করতে লাগলেন। এই নির্বাচন প্রতিযোগিতায় তাঁর খরচ হল তিন-শ পাউণ্ড। কেউ কেউ বলেন পাঁচ-শ।

শোনা গেল সিমসনের এক প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু একটি বিষয়ে তাঁর চেয়ে বেশী গুণসম্পন্ন। তিনি বিবাহিত। তাই তাঁরই এ পদ পাওয়ার বেশী সম্ভাবনা।

শুনে সিমসন এডিনবরা ছেড়ে চলে গেলেন। কয়েকদিন পর লিভারপুল থেকে ফিরলেন, সস্ত্রীক। এসে ঘোষণা করলেন, এই পদের জন্য যদি আমি নিজেকে সবচেয়ে বেশী যোগ্য মনে না করতাম, তাহলে কখনও আমি এই পদপ্রার্থী হতাম না।

লোকেরা সিমসনের এই কথায় খুব খুশি হল। নির্বাচনে এক ভোটে সিমসনের জিত হল।

সেইদিন সিমসন তাঁর শ্বশুরকে লিখলেন—আজ আমি অধ্যাপকের পদে নির্বাচিত হয়েছি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছে ষোল ভোট আর আমি সতেরো। আমার বিরুদ্ধে অধ্যাপক এবং অভিজাত সম্প্রদায় সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেও আমাকে হারাতে পারেন নি। কাল থেকে আপনার মেয়ে জেসি এবং আমার মধুচন্দ্রিকা শুরু হবে।

ইতি মঙ্গলবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৮৪০। আপনার স্নেহের পুত্র জেমস ইয়ং সিমসন।

এত অল্পবয়সে সামান্য এক গেঁয়ো ঘরের ছেলের পক্ষে এত বড় এক সম্মান সত্যি খুব গৌরবের। কিন্তু এই পদ অধিকার করে সিমসন যাঁর বিরাগভাজন হলেন, তিনি তখন ক্লিনিক্যাল সার্জারির অধ্যাপক; প্রবল প্রতাপশালী জেমস সাইম। এই সাইম তখন সার্জারির নেপোলিঅন নামে বিখ্যাত। এত বিরাট তাঁর নাম এবং এত বিশাল তাঁর প্রতিপত্তি। এত বড় একজন লোক সিমসনের চিরশত্রু হয়ে রইলেন।

তখনকার দিনে সার্জনদের মধ্যে রেষারেষি এবং ঝগড়াঝাঁটি নিত্য লেগে থাকত। একজন আর একজনের বিরুদ্ধে যা খুশি তাই বলতেন। কাগজে কাগজে গালাগাল দিয়ে চিঠি ছাপাতেন। সিমসন অথবা সাইম প্রকাশ্যে

এমন কিছু করেছেন বলে জানা নেই। কিন্তু বেনামীতে যে নিশ্চয় করেছেন, তাতেও কারু সন্দেহ নেই।

অনেকদিন ধরে গবেষণা করে রুগীর কাটা পায়ের রক্তপাত বন্ধ করার জন্য স্টিল পিন ব্যবহার করার এক উপায় বার করে সিমসন এক পুস্তিকা রচনা করেন ; ধাত্রীবিদ্যার লোক সার্জারিতে অনধিকার হস্তক্ষেপ করেছে বলে সাইম তাতে সাংঘাতিক ক্ষেপে গেলেন।

একদিন অপারেশন থিয়েটারে ছাত্রদের সামনে ট্রেতে করে সিমসনের এই পুস্তিকা সাইম বেয়ারাকে দিয়ে আনিয়ে নিলেন। তারপর ট্রে থেকে পুস্তিকাটি তুলে ব্যঙ্গ ভরে পুস্তিকার নামটি পড়ে ঘৃণা ও অবজ্ঞায় সেটি ছিঁড়ে টুকরো করে ছুঁড়ে ফেললেন। টেবিলের নিচে রুগীর কাটা পা রাখার বালুভরা ট্রের ওপর সিমসনের এই পুস্তিকা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে রইল। এইবার সাইম লেকচার শুরু করলেন। ছাত্ররা সব বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল।

পরদিন সিমসনের ক্লাস। ছাত্রদের আজ সাংঘাতিক ভিড। যথাসময়ে আজও বেয়ারা একটি ট্রে হাতে ক্লাসে ঢুকল। তার ওপর সাইমের লেখা সার্জারির মোটা পাঠ্যপুস্তক। পেছনে সিমসন নিজে।

ছাত্ররা সাংঘাতিক একটা কিছু দেখার জন্য প্রস্তুত হল। সিমসন মৃদু হেসে বইখানা খুললেন। মার্কা দেওয়া নির্দিষ্ট একটি পাতা বার করে সাইমেরই লেখা পড়ে শোনালেন, ছেঁড়া শিরা-উপশিরায় রক্তপাত হয় না। ছিঁডলে কোন ক্ষতি হয় না। (টোরনভেসলস নেভার ব্লীড। টরশন ডাজ নো হারম।) এই বলে বই বন্ধ করে সেদিনকার লেকচার শুরু করলেন।

তখন সন্তানের জন্ম সাধারণ একটা প্রাকৃতিক নিয়ম বলেই লোকে জানত। এর পেছনেও যে আবার বৈজ্ঞানিক কোন তথ্য থাকতে পারে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। সিমসন নিজে এ তথ্য অনুসন্ধান করেই শুধু যাননি, ছাত্রদেরও শিখিয়েছেন। বুঝিয়েছেন, শিশুর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের জন্য তার এবং মার দুজনের প্রতিই আগে থেকে সমান যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

তাঁর কুইন স্ট্রীটের বাড়ির প্র্যাকটিস একটি দেখাবার জিনিস ছিল। সব সময় লোকেরা তাঁকে ঘিরে থাকত। সিমসন তাই খুব ভালবাসতেন। অনর্গল কথা বলতেন। কাজের মধ্যেই তাঁর প্রতিভা খুলত। লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব তিনি যেমন ভালবাসতেন, শত্রুর সঙ্গে ঝগড়াও ঠিক তেমনি তিনি পছন্দ

করতেন। টাকা পয়সার হিসেব কখনও তাঁর ছিল না। অনেক সময় জানালার খটখটে আওয়াজ নোট গুঁজে তিনি বন্ধ করতেন।

১৮৪৬ সালের শেষের দিকে অভিজাত সমাজের ধনী এক মহিলা রুগীকে দেখতে তিনি লণ্ডনে এলেন। এখানে এসে রবার্ট লিসটনের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। লিসটন তখন সার্জারিতে সবে ইথার ব্যবহার করেছেন। সিমসন মন দিয়ে লিসটনের অভিজ্ঞতা শুনলেন। তক্ষুণি তাঁর মনে হল, ধাত্রীবিদ্যায় নিজের প্র্যাকটিসে ইথার প্রয়োগ করলে কেমন হয়?

এডিনবরায় ফিরে সিমসন নিজের রুগীদের ওপর ইথার ব্যবহার শুরু করলেন এবং ইথার শুঁকিয়ে প্রসব-ব্যথা দূর করলেন। দেখলেন, ফল বেশ ভালই হয়। কিন্তু তার সমসাময়িক বিশেষজ্ঞরা এটা পছন্দ করলেন না। এ জিনিস তাঁদের কাছে নিতান্ত উদ্ভট বলেই মনে হল। আহার-নিদ্রা যেমন জীবের ধর্ম; সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে প্রসব বেদনাও তাই। তাহলে খাবার আগে মানুষকে বেহুঁশ কর না কেন?

প্রসব-বেদনা কেন হয়? সুস্থ শিশুকে মাতৃগর্ভ থেকে বার করবার জন্যেই তো? সেই ব্যথা দূর করলে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে কি করে? মাকে অজ্ঞান করে বেশীক্ষণ রাখলে শিশুর ক্ষতি-হবে না? সেই শিশু যদি নির্বোধ হয়? কাজ কি বাপু অত ঝঞ্ঝাটে গিয়ে, যেমন আছে তেমনি থাকতে দাও। প্রসব-ব্যথা কমাবার ফন্দি বাদ দাও। এই হল বিশেষজ্ঞদের মত।

সিমসন ইথার ব্যবহার করে নিজেও অনেক অসুবিধা লক্ষ্য করলেন। তাই ইথার ছাড়া অজ্ঞান করার জন্য আর কি ব্যবহার করা যায়, তার খোঁজ নিতে লাগলেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ি লিভারপুলের ওয়ালডি নামে এক কেমিস্ট একদিন খবর দিলেন, ক্লোরোফরমের কথা। বললেন, এ জিনিস শুঁকিয়েও বেহুঁশ করা যায়।

ক্লোরোফরম আবিষ্কার হয় ১৮৩১ সালে। একই সময়ে জার্মানীতে লিবিগ, প্যারিসে সুবেরাঁ এবং আমেরিকার সামুএল গুথরী ক্লোরোফরম আবিষ্কার করেন। ইথারের মত ক্লোরোফরমও খুব তাড়াতাড়ি উবে যায়। শুঁকলে প্রথমে নেশা হয়। পরে লোকে অচৈতন্য হয়। কিন্তু এই ষোল বছরে কেউ তা সার্জারিতে ব্যবহার করেনি।

সিমসন ঠিক করলেন নিজে আগে ক্লোরোফরম শুঁকে পরীক্ষা করে দেখবেন। সেদিন নভেম্বর মাসের শীতের এক সন্ধ্যা। ১৮৪৭ সাল।

সিমসনের কুইন স্ট্রীটের বাড়ির খাবার টেবিলে সিমসন তাঁর দুই সহকর্মী ডাক্তার কিথ ও ম্যাথ্ ডানকানকে নিয়ে বসলেন। তারপর বোতল থেকে তিনটি গ্লাসে ক্লোরোফরম ঢেলে মুখের কাছে তুলে ধরলেন। সবার আগে শুঁকলেন ডাঃ কিথ। বললেন, বেশ মিষ্টি গন্ধ। খুব মজা লাগছে। বেশ যেন নেশা হচ্ছে। তাই দেখে সিমসন এবং ডাঃ ডানকান তাঁদের গ্লাস নাকের কাছে তুলে ধরলেন। ক্লোরোফরমের মিষ্টি গন্ধ তাঁদের নাকে গেল। রক্তে মাদকতা জাগল। দেহে স্ফূর্তি এল। হাসি ঠাট্টায় তাঁরা মেতে উঠলেন। দেখতে দেখতে তাঁদের চোখের সামনে পরস্পরের মুখ নাচতে লাগল। টেবিল-চেয়ার, দেয়াল, বাতি সব দুলতে লাগল। কানের ভেতর বোঁ বোঁ শব্দ হতে লাগল। পরে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

সিমসনের যখন জ্ঞান হল, দেখলেন মেঝেয় কার্পেটের ওপর লম্বা হয়ে তিনি পড়ে আছেন। পাশে কিথ এবং ডানকানেরও সেই অবস্থা। তিনি বলে উঠলেন, বাঃ এ তো দেখছি ইথারের চেয়েও অনেক বেশী ভাল!

কিছুক্ষণ পরে ডাঃ কিথ ও ডানকান যখন জেগে উঠলেন, তাঁরাও বললেন, ক্লোরোফরম ইথারের চেয়ে ভাল।

মিসেস সিমসন প্রথম দিকে এই ঘরে ছিলেন। ডাঃ কিথ যখন মেঝেতে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন, তাঁর খুব মজা লাগল। কিন্তু যেই কিথ স্তব্ধ হয়ে দুই হাত এবং দুই হাঁটুতে ভর করে টেবিলের সমান সমান উঠে দৃষ্টিহীন দুই চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইলেন অমনি ভয় পেয়ে মিসেস সিমসন ঘর থেকে পালিয়ে গেলেন।

ডাক্তাররা সবাই বললেন ক্লোরোফরম শুঁকে তাঁদের শরীর খারাপ কিছুই লাগছে না। তখন সিমসনের ভাইঝিও ভরসা পেয়ে এই ক্লোরোফরম শুঁকতে রাজী হলেন। বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে বাহুর ওপর হাত চেপে ক্লোরোফরমের গ্লাস মুখের কাছে নিয়ে শুঁকতে শুঁকতে হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি দেবদূত, ওঃ আমি দেবদূত। বলেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

সিমসন তখন বুঝে ফেলেছেন ক্লোরোফরম কি জিনিস। ইথার বর্জন করে সিমসন এখন প্র্যাকটিসে ক্লোরোফরম ব্যবহার শুরু করলেন। মাত্র এগারো দিনের মধ্যেই পঞ্চাশটি রুগীর ওপর তিনি ক্লোরোফরম প্রয়োগ করলেন। কোথাও কোনো বাধা কি বিপত্তি তাঁর ঘটল না।

এইবার তাঁর সমস্ত শক্তি তিনি ক্লোরোফরম চালু করবার জন্য প্রয়োগ করলেন। সার্জারিতে এবং ধাত্রীবিদ্যায় এই নতুন পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হলেন।

ইংলণ্ডের সার্জনদের কাছে তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন যে, ক্লোরোফরম ইথারের চেয়ে ভাল। লর্ড লিস্টার তা মেনে নিলেন। কিন্তু আমেরিকার সার্জনরা তা মানলেন না। ইথারকেই তাঁরা বেশী ভাল বিবেচনা করলেন।

ধাত্রীবিদ্যায় ক্লোরোফরম ব্যবহার চালু হয়ে গেল। কিন্তু ধর্মযাজকরা ক্ষেপে গেলেন। তাঁরা বললেন, ক্লোরোফরম করে প্রসব-যন্ত্রণা দূর করা নীতিবিরুদ্ধ। ধর্মবিরুদ্ধ।

সিমসন যদিও বাদানুবাদ ভালবাসতেন, কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী। বাইবেলকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কাজেই ধর্মযাজকদের এই কথায় তিনিও ক্ষেপে গেলেন।

পাদ্রীরা যখন ঘোষণা করলেন বাইবেলে আছে স্ত্রীলোক দুঃখের সঙ্গে এবং ব্যথার সঙ্গে সন্তান ধারণ করবে তারপর কষ্ট পেয়ে প্রসব করবে (ইন সরও দাউ শ্যাল ব্রিঙ ফোর্থ চিলড্রেন) তখন সিমসন বাইবেলের মূল হিব্রু থেকে প্রমাণ করে দেখালেন, এই দুঃখ শারীরিক কোন ব্যথা অথবা যন্ত্রণা নয়।

তাছাড়া ঈশ্বর নিজে যখন আদমের পাঁজরার হাড় থেকে ইভকে তৈরী করেন, তখন আদমকে জাগ্রত না রেখে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। এই গভীর ঘুম কি ? ক্লোরোফরম মানুষকে এই গভীর ঘুমেই আচ্ছন্ন করে। অতএব ঈশ্বর নিজে অপারেশনের আগে অজ্ঞান করে নেবার পক্ষপাতী এবং অ্যানএসথেশিয়ার প্রথম প্রবর্তক।

এই প্রবন্ধে সিমসন বলেন, মানুষ যখনি কোন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, তখনই ধর্মের নামে তার প্রতিবাদ হয়েছে। বসন্তের টিকা যখন আবিষ্কার হয়, তখন বলা হত বসন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছায় অথবা অভিশাপে হয়। তার মধ্যেও কল্যাণ আছে। কিন্তু গো-বসন্তের বীজ মানবদেহে ঢোকানো দুষ্ট মানুষের কাজ। শয়তানের কাজ। একটি স্ত্রীলোক তখন বলেছিল, টিকা নেবার পর থেকেই তার মেয়ে গরুর মত কাশছে, আর সারা গায়ে তার গরুর মত লোম বেরিয়েছে।

আর একজন সগর্বে ঘোষণা করেছিল, তাদের দেশে টিকা নেওয়া বন্ধ হয়ে

গেছে। কারণ, দেখা গেছে যারাই টিকা নিয়েছে তাদের স্বভাবও ঠিক ষাঁড়ের মত হয়েছে।

তিনশ বছর আগে প্রসব-যন্ত্রণা দূর করার জন্য কোনো ওষুধ দেওয়া ছিল সাংঘাতিক এক অপরাধ এবং রাজদ্বারে দণ্ডনীয়। ১৫৯১ সালে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা ইউফেম ম্যাকালেন তাঁর নাম, এই প্রসব-যন্ত্রণা লাঘবের জন্য অ্যাগনেস স্যামসন নামে এক স্ত্রীলোকের সাহায্য নেন। সেই অপরাধে রাজা জেমসএর কাছে অ্যাগনেস স্যামসনের বিচার হয়। রাজা অ্যাগনেসকে ডাইনী বলে ঘোষণা করেন। এডিনবরার ক্যাসল হিলে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

এতদিন পরে ধর্মযাজকরা আবার সিমসনের ওপর খড়্গহস্ত হলেন। কিন্তু সিমসন তাতে দমলেন না। পাদ্রীদের নিজের অস্ত্রে সিমসন তাদের যুক্তি খণ্ডন করলেন; বাইবেল থেকে বিধান তুলে।

তারপর এক ঘটনা ঘটল, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি, ১৮৫৩ সালে। এই ঘটনায় সব বাদানুবাদ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মহারানী ভিক্টোরিয়া নিজে ক্লোরোফরম নিতে রাজী হলেন; তাঁর সপ্তম সন্তান প্রিন্স লিওপোল্ডএর জন্মের সময়। সিমসনের কাজ শেষ হল। ক্লোরোফরম ব্যবহারে আর কেউ আপত্তি তুলল না।

ক্লোরোফরম এত বেশী চালু হয়ে গেল যে, অজ্ঞান করাকেই লোকে বলতে লাগল ক্লোরোফরম করা। আমেরিকার ওএনডেল হোমসএর দেওয়া নাম অ্যানেসথেশিয়া পাঠ্য-বই এবং বিজ্ঞানীদের কাছেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল।

প্রথম শোঁকার মাত্র এগারো দিনের মধ্যেই সিমসন নিজের প্র্যাকটিসে পঞ্চাশটি রুগীর উপর ক্লোরোফরম প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। এই থেকেই বোঝা যায় তখনকার দিনে কি বিরাট তাঁর প্র্যাকটিস ছিল। দুবছরের মধ্যেই সিমসন আবার এক রিপোর্ট বার করলেন। তাতে বললেন, প্রসবকালে এবং সার্জারিতে শুধু এডিনবরাতেই চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার রুগীর ওপর এই ক্লোরোফরম প্রয়োগ করা হয়েছে।

কিন্তু সিমসন যা চেয়েছিলেন, তা হল না। ক্লোরোফরম দিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা সমূলে লাঘব করা গেল না। অপারেশনের সময় ক্লোরোফরম ব্যবহার চললেও প্রসবকালে দীর্ঘকাল ধরে তা দেওয়া গেল না। এমন কি শুধু ক্লোরোফরমের জন্যই অনেকের মৃত্যু হল।

সিমসন ভাবলেন, অন্য কোন নতুন ওষুধ পরীক্ষা করে দেখবেন। একদিন এমনি এক ওষুধ নিজের ওপর ব্যবহার করে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। তাঁর চাকর এসে দেখল, তিনি মড়ার মত অসাড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। দুঘণ্টা পর তাঁর জ্ঞান হল।

তখন কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন স্যার লাঅন প্লেফেয়ার। সিমসন একদিন তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, ক্লোরোফরম ছাড়া ভাল রাসায়নিক দ্রব্য আর কিছু কি নেই?

লর্ড প্লেফেয়ার বললেন, নতুন একটা জিনিস তিনি বার করেছেন, তার নাম ডাই-ব্রোমাইড-অফ-ইথিলিন। সিমসন শুঁকে দেখে বললেন, বাঃ বেশ ভাল গন্ধ। আজই এটা পরীক্ষা করে দেখি।

এই বলে তক্ষুণি লর্ড প্লেফেয়ারের ভেতরের ঘরে গিয়ে নিজের ওপর পরীক্ষার জন্য তিনি ব্যগ্র হলেন। কিন্তু লর্ড প্লেফেয়ার তা দিলেন না। বললেন, আগে খরগোসের ওপর পরীক্ষা করি। তারপর কাল আপনাকে দেব।

সিমসন ব্যস্তবাগীশ লোক। অপেক্ষা করতে রাজী হন না। অনেক কষ্টে তাঁকে একটা দিনের জন্য ঠেকিয়ে রাখা হল।

লর্ড প্লেফেয়ার দুটি খরগোসকে এই নতুন জিনিস শুঁকিয়ে রেখে দিলেন। পরদিন সিমসন সস্ত্রীক এসে উপস্থিত। দুটো চেয়ার টেনে একটির ওপর বসে আর একটির ওপর দুপা তুলে হেলান দিয়ে বসে তিনি লর্ড প্লেফেয়ারকে বললেন, কৈ আনুন আপনার ওষুধ।

লেডী সিমসন বাধা দিলেন। বললেন, আগে খরগোস দুটো আনা হোক। দেখা যাক, ওষুধ শুঁকে ওরা কেমন আছে।

লর্ড প্লেফেয়ার বেয়ারাকে বললেন। বেয়ারা খাঁচা খুলে খরগোস দুটো কানে ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে হাজির হল। দেখা গেল, অনেক আগেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। কাজেই সিমসনকে আর এই জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে কেউ দিলেন না।

ক্লোরোফরমের চেয়ে ভাল কোনো ভেষজ সিমসন আর খুঁজে পান নি। কিন্তু তখনকার দিনের সমাজের সঙ্কীর্ণ মন থেকে অজ্ঞান করার ভীতি এবং কুসংস্কার তিনি দূর করতে পেরেছিলেন। তা না হলে পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে লর্ড লিসটারের হাতে সার্জারির অত দ্রুত উন্নতি কখনও সম্ভব হত না।

সিমসন চেয়েছিলেন, মাতৃগর্ভ থেকে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে মাকে কোন কষ্ট না দিয়ে। ক্লোরোফরম তাঁর সে আশা পূর্ণ করেনি। এখনও মায়েরা পৃথিবীর সেই আদিমকালের মতই প্রসব-ব্যথায় কষ্ট পান। শুধু মুষ্টিমেয় সামান্য কয়েকটি ছাড়া যাঁদের ফরসেপস কিংবা অপারেশনের জন্য অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয়।

সার্জারি বা ধাত্রীবিদ্যায় ক্লোরোফরম আজকাল আর ব্যবহার হয় না। নাইট্রাস অকসাইড, ইথার এবং অন্য অনেক নতুন ওষুধ দিয়ে রুগীকে এখন অজ্ঞান করা হয়। কিন্তু যা দিয়েই বেহুঁশ করা হোক, রুগীরা কিন্তু এখনও বলে তাদের ক্লোরোফরম করা হয়েছে। এইখানেই সিমসনের কৃতিত্ব।

মাতৃহন্তা

ভারতবর্ষে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব, তখন ভিয়েনার জেনারেল হাসপাতালে ইগনাস ফিলিপ সেমেলভিস (১৮১৮—৬৫) সামান্য এক নতুন পাশকরা ডাক্তার এবং প্রস্থতি ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত নতুন এক সহকারী।

সেমেলভিসের বাড়ি হাঙ্গারীর বুডাপেস্টে। বাবা ছিলেন বণিক। বেশ ভাল তাঁর ব্যাবসা। ছেলেকে আইন শেখবার জন্যে তিনি ভিয়েনায় পাঠালেন। আইন ক্লাসে কিছুদিন পড়ে সেমেলভিস কৌতূহলী হয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন অ্যানাটমির লেকচার হলে গেলেন। বক্তৃতা শুনলেন, শবব্যবচ্ছেদ দেখলেন। অমনি তাঁর মত বদলে গেল। আইনের ক্লাস ছেড়ে হঠাৎ তিনি ডাক্তারীতে ভর্তি হয়ে গেলেন। অবশেষে ডাক্তারী পাশ করে এম. ডি ডিগ্রি নিয়ে ধাত্রী বিদ্যায় মন দিলেন। তারপর হাসপাতালের প্রস্থতি ওয়ার্ডে যখন তিনি সামান্য এক সহকারীর কাজ পেলেন, তখন ১৮৪৪ সাল। এপ্রিল মাস। তিনি মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সের এক যুবক।

হাসপাতালে প্রস্থতি ওয়ার্ড দুটি বৃদ্ধ অধ্যাপক ক্লাইনের তত্ত্বাবধানে। প্রথমটি গরীব দুঃখীর। ভিখারী, পরিত্যক্ত এবং অসহায় মেয়েরা এখানে প্রসবের জন্য ভর্তি হয়। এদের অনেকেরই না ছিল স্বামী, না ছিল পিতা, না ছিল কোনো অভিভাবক। ভর্তি হওয়ার নিয়ম সপ্তাহে তিন দিন। রবি, মঙ্গল এবং শনিবার। সেমেলভিস এই এক নম্বর ওয়ার্ডে অধ্যাপক ক্লাইনের সহকারী ডাক্তার নিযুক্ত হলেন।

অল্পবয়সী গরীব এই যুবতীরা কোনো কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে এই হাসপাতালে আসে না। এরা আসে প্রাকৃতিক নিয়মে গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসবের জন্য। এই তাদের প্রথম সন্তান। সেমেলভিসের কাজ এদের সাহায্য করা।

এক মাস এই কাজ করে সেমেলভিস দেখলেন, দু-শ আশি জন প্রস্থতির

মধ্যে ছত্রিশ জনের মৃত্যু হল সন্তান প্রসবের পর জ্বরে। প্রসবের পরে দিন দুই এরা বেশ ভাল থাকে। বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে আদর করে। শোয়। আনন্দে গর্বে এদের চোখে মুখে খুশির উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে। গালে লাল আভা দেখা দেয়। তারপর জ্বর হয়। পেটে ব্যথা শুরু হয়।

সেমেলভিস সান্ত্বনা দেন। মায়েরা উদ্বেগে আকুল হয়ে সেমেলভিসের দিকে ভয় বিহ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। জিভ শুকিয়ে যায়। বার বার শুধু একটু জল খেতে চায়। তবু পিপাসা যায় না। দিনচারেক পরে বলে, এইবার যেন একটু ভাল লাগছে। ব্যথা কম মনে হচ্ছে। আর একটু জল দেবেন ডাক্তার? এই বলেই হাঁপাতে থাকে।

শুনে সেমেলভিস মুখ ঘুরিয়ে নেন। বুঝতে পারেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আর এদের রক্ষা নেই। মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে শিয়রে। সব কষ্ট এইবার ঘুচে যাবে। এরা আর বাঁচবে না।

সেমেলভিস ভাবেন, কেন এমন হয়? হাসপাতালে যখন এরা আসে, তখন এরা নীরোগ। সবল এবং সুস্থ। পেটে তাদের সন্তান। সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর দুদিনের মধ্যেই কি এদের হয়? সর্বনাশা এই জ্বর কোত্থেকে আসে? ঝড়ের মত অতর্কিতে এসে যৌবনের বিরাট এই প্রাণ শক্তি নিমেষে উড়িয়ে নিয়ে যায়?

১৮৪৪ থেকে ১৮৪৬। এই দু বছর সেমেলভাস হাসপাতালে এই হতভাগ্য যুবতীদের মৃত্যু দেখলেন। কিন্তু কোন প্রতিকার করতে পারলেন না। প্রফেসর ক্লাইন বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ। সেমেলভিস তাঁরই সহকারী। দিনের পর দিন সেমেলভিস প্রফেসরের কাছে তার অভিযোগ জানান। বলেন, এক নম্বর ওয়ার্ডে এত বেশি মৃত্যু কেন হয়? কি তার প্রতিকার?

প্রফেসার হাসেন। বলেন, কেন মৃত্যু বেশী হয় তা কেউ জানে না। তবে মৃত্যু হয় শরীরে বিষ ঢুকে। এই বিষ হাওয়া থেকে মাতৃদেহে ঢোকে। প্রসবের পর।

সেমেলভিস তর্ক তোলেন। বলেন, তাহলে সব প্রসূতির দেহেই এই বিষ ঢোকে না কেন? জ্বরে সবাই মরে না কেন?

প্রফেসর উত্তর দেন, সবার শরীর এক নয়। কেউ রোগ প্রতিরোধ করে। কেউ পারে না।

কিন্তু প্রফেসারের এই ব্যাখ্যায় সেমেলভিস সন্তুষ্ট হন না। ভাবেন, পাশেই তো দু নম্বর প্রসূতি ওয়ার্ড। সেখানে তো এত মৃত্যু হয় না? ১৮৪৬ সালে এক বছরে এক নম্বর ওয়ার্ডে মারা গেছে চার-শ উনষাট জন। অথচ পাশেই তো ঐ দু নম্বর ওয়ার্ড। ওখানে মরেছে মাত্র নব্বই জন। কেন এত কম? কি করে তা সম্ভব হয়?

প্রসূতিরা সবাই জানত, এক নম্বরে ভর্তি হলে মৃত্যু তাদের নিশ্চিত। তাই

মৃত্যু ও চিকিৎসক

তারা ব্যথা চেপে রাখত। রবি মঙ্গল কি শনিবারে ভর্তি হতে চাইত না। হিসেবে ভুল করে হঠাৎ ভর্তি হয়ে যেই কেউ দেখত, ঐ সর্বনাশা এক নম্বরেই সে ভর্তি হয়েছে, অমনি সেমেলভিসের পায়ে পড়ে প্রসূতি কেঁদে উঠত। মিনতি করে বলত, আজ আমাকে ছেড়ে দাও ডাক্তার। কাল এসে ভর্তি হব।

সেমেলভিস হতভাগ্য অসহায় এই যুবতীদের কান্না শোনেন। কিন্তু তাঁর হাত-পা বাঁধা। সাহায্য করার কোনো উপায় তাঁর হাতে নেই। দু বৎসর

এখানে কাজ করে নিত্য তিনি এ-দৃশ্য দেখছেন। কি তিনি করবেন? কতটুকুই বা তাঁর ক্ষমতা?

সেমেলভিস খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন। কফি খেয়ে সকাল বেলা প্রথম যেতেন যম-ঘরে (পোস্ট মরটেম রুম)। আগের দিন রাত্রে পাচ দিনের শিশুটি রেখে যে হতভাগ্য যুবতী মাতার মৃত্যু হয়েছে, তার শব-ব্যবচ্ছেদ করতেন। ছাত্ররা তাঁকে সাহায্য করত।

তারপর এই ছাত্রদের নিয়ে তিনি এক নম্বর ওয়ার্ডে আসতেন। প্রস্থতিদের একে একে পরীক্ষা করতেন। কার প্রসবকাল কত বেশি আসন্ন পরীক্ষা করে তা নির্ণয় করতেন। যমঘরের মৃতদেহের গন্ধ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। নিজের আঙুলে, নিজের পোশাকে তিনি এই গন্ধ পেতেন।

কিন্তু এই এক নম্বর ওয়ার্ডে মৃত্যু-হার ক্রমশ বেড়ে চলল। এক-শ জন প্রস্থতির মধ্যে ত্রিশজনের মৃত্যু হতে শুরু হল। এই নিয়ে কথা উঠল। গুজব ছড়াল। শহরের লোকেরা পর্যন্ত বলতে লাগল, এর একটা বিহিত-ব্যবস্থা কিছু করা দরকার। কাজেই এক অনুসন্ধানী কমিশন বসানো হল।

প্রাচীন অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা এই কমিশনের সভ্য হলেন। অনেক গবেষণা করে তাঁরা বললেন, এক নম্বর ওয়ার্ডে ভিড় খুব বেশি। তাছাড়া পুরুষ ডাক্তার এবং ছাত্ররা প্রস্থতিদের পরীক্ষা করে প্রসব করায়। নারী সুলভ কোমলতা এঁদের পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। তাই দু নম্বর ওয়ার্ডে, যেখানে স্ত্রীলোক ধাত্রীরা প্রসব করান, সেখানে মৃত্যু-হার কম।

কমিশনের এই রিপোর্ট দেখে সেমেলভিসের হাসি পেল। ভাবলেন, জন্মের সময় শিশু মাকে যে কষ্ট দেয়, দেহাংশে যে ক্ষত করে ডাক্তারের পরীক্ষায় তার কতটুকু বাড়ে কমে?

একদিন রাত্রে হাসপাতালে নিজের ঘরে সেমেলভিস বসে আছেন, এমন সময় বারান্দায় ঘণ্টার শব্দ তাঁর কানে এল। প্রথমে দূর থেকে মৃদু শব্দ। ক্রমশঃ জোরে এই ঘণ্টা ধ্বনি তাঁর কাছে আসতে লাগল। সেমেলভিস বুঝলেন, পুরোহিতের প্রবেশ সঙ্কেত। এই নিয়ে আজ চারবার পুরোহিত এলেন। অর্থাৎ আজ এই ওয়ার্ডে চারটি হতভাগ্য মায়ের মৃত্যু হল।

হঠাৎ একটা সন্দেহ তাঁর মাথায় জেগে উঠল। মনে হল এই যে ঘণ্টাধ্বনি প্রস্থতিরা সবাই জানে, মৃত্যুর এ অগ্রদূত। তাহলে কি এই জ্বর ভয় থেকে উদ্ভূত? যে-প্রস্থতি যত বেশি ভয় পায়, রোগ কি তাকে তত বেশি আক্রমণ

করে? দু নম্বর ওয়ার্ডে এ-ঘণ্টাধ্বনি হয় না। পুরোহিত ভিন্ন দরজা দিয়ে নিঃশব্দে মৃত্যুমুখী মাতার ঘরে ঢোকেন। তাহলে কি এইজন্যেই এক নম্বরে এত বেশি মৃত্যু হয়?

সেমেলভিস ছুটে পুরোহিতের কাছে গেলেন। বুঝিয়ে এই ঘণ্টা বন্ধ করলেন। ঠিক হল, নিঃশব্দে ভিন্ন দরজা দিয়ে তিনি এবার রোগীর ঘরে ঢুকবেন। অন্য প্রসূতিরা কেউ কিছু জানবে না।

কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হল না। এক নম্বর ওয়ার্ডে আগের মতই মায়েদের মৃত্যু হতে লাগল।

এই সময় একদিন সেমেলভিসের চাকরি গেল। সেমেলভিসের আগে যিনি এই সহকারীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি আবার এসে এই কাজ দাবি করলেন। প্রফেসর ক্লাইন সেমেলভিসকে ছাড়িয়ে পুরনো এই সহকারীকে কাজে নিযুক্ত করলেন।

সেমেলভিস ভাবলেন, এইবার তিনি ইংরেজি শিখবেন। ইংলণ্ড এবং ডাবলিনে যাবেন। দেখবেন, ওখানকার হাসপাতালে প্রসূতিদের মৃত্যু-হার কেন ভিয়েনার চেয়ে কম।

এই ভেবে শীতকালটা কাটাবার জন্য সেমেলভিস ভেনিসে এলেন। ভেনিসে কিছুদিন কাটাবার পর হঠাৎ খবর এল তাঁর পুরনো চাকরি আবার খালি হয়েছে। যিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি অন্য এক কলেজের প্রফেসর হয়ে কাজ ছেড়ে চলে গেছেন। কাজেই আবার সেমেলভিস ঐ এক নম্বর ওয়ার্ডের সহকারী নিযুক্ত হলেন।

এইবার কাজে লাগবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক ঘটনা ঘটল। সেমেলভিস বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

শুনলেন, তাঁর বন্ধু কোলেটস্কার মৃত্যু হয়েছে। কোলেটস্কা ছিলেন প্যাথলজিস্ট। দুজনে একই সঙ্গে কাজ করতেন। শব-ব্যবচ্ছেদ করতেন। ছাত্রদের শেখাবার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ করবার সময় কোলেটস্কার আঙুল একদিন কেটে যায়। তারপর জ্বর হয়। রক্ত দূষিত হয়ে শেষে মৃত্যু হয়। এই কোলেটস্কারের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ হবে ঐ যমঘরে।

শুনে সেমেলভিস মর্মাহত হলেন। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যমঘরে যখন তাঁর বন্ধুর শব-ব্যবচ্ছেদ হয়, তখন তিনি পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

দেখলেন, যে-আঙুলে তাঁর বন্ধু কোলেটস্কারের ক্ষত হয়েছিল, সেখান

থেকে সমস্ত হাতটাই ফুলে গেছে। মাংসের ভেতরে স্তরে স্তরে রক্তাধিক্য হয়েছে। রক্ত দূষিত হয়ে অন্ত্রে পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। ঠিক যেমনটি তিনি দেখে আসছেন ঐ হতভাগ্য গরীব যুবতীদের। এই এক নম্বর ওয়ার্ডে। প্রসবের পর শবদেহে। এই দু বছর ধরে। কোলেটস্কারের কাটা আঙুলে শবদেহ থেকে বিষ প্রবেশ করেছে। তাহলে কি এই অনাথা তরুণীদের দেহেও এই মৃতদেহের বিষ প্রবেশ করে ?

বিদ্যুৎ চমকের মত সেমেলভিসের মাথায় খেলে গেল, মাতৃদেহে প্রসবজনিত ক্ষতের মধ্য দিয়েই মৃতদেহের এই সাংঘাতিক বিষ রক্তে প্রবেশ করে। রক্ত দূষিত করে। মৃত্যু ঘটায়।

সেমেলভিসের মাথা থেকে পা পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠল। তিনি বুঝে ফেলেছেন। মনে আর কোনো সংশয় নেই। কিন্তু কি নিদারুণ সাংঘাতিক এই উপলব্ধি। সত্যের কি নির্মম এই প্রকাশ। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সেমেলভিস স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

মৃতদেহ থেকে এই সাংঘাতিক বিষ মাতৃদেহে যায় কি করে ? সেমেলভিস বুঝেছেন, এ-বিষ বহন করে নিয়ে যান তিনি নিজে এবং তাঁর ছাত্ররা। নিজের হাতে এবং আঙুলে।

ভোরে উঠে তিনি রোজ যখন যমঘরে গিয়ে শব-ব্যবচ্ছেদ করেন, তখন তার সে কি গর্ব। তিনি কাজে ফাঁকি দেন না। ছাত্রদের নিজে হাতে শব-ব্যবচ্ছেদ শেখান। সেখান থেকে কাজ শেষ করেই ঢোকেন এক নম্বর ওয়ার্ডে। প্রসূতিদের পরীক্ষা করেন। যে-হাতে তিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করে এসেছেন, সেই শবের গন্ধ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। হাতে, আঙুলে, জামায়। এই গন্ধ সেই বিষেরই গন্ধ যা মাতৃদেহে ঢুকে মৃত্যু ঘটায়। অতএব হত্যাকারী কে ? নিশ্চয়ই তিনি নিজে এবং তাঁর ছাত্ররা।

এইবার সেমেলভিস বুঝলেন, কেন দু নম্বর প্রসূতি ওয়ার্ডে মৃত্যু এত কম। ওখানে ধাত্রীরা প্রসব করায়। ধাত্রীরা কেউ শব-ব্যবচ্ছেদ করে না। কাজেই তাদের হাতে মৃতদেহের বিষও থাকে না।

যে-হতভাগ্য যুবতীর প্রসবকাল যত বেশি দীর্ঘ হয়, তত বেশি বার তাকে পরীক্ষা করা হয়। তত তার দেহে বিষ প্রবেশ করে। যার প্রসব নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হয়ে যায়, সে ভাগ্যবতী বেঁচে যায়। কারণ তাকে আর আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করার কোনো প্রয়োজন হয় না। এতদিনে

সেমেলভিস এই কঠিন সত্য উপলব্ধি করলেন। বুঝলেন, তাঁরই ভুলে হাজারে হাজারে এই অসহায় গরীব যুবতীরা কেমন করে এতদিন গলা শুকিয়ে মারা গেছে এই সর্বনাশা এক নম্বর ওয়ার্ডে।

তখন মে মাস, ১৮৪৭ সাল। আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে ধাত্রীবিদ্যায় ইথার ব্যবহার শুরু হয়েছে। কিন্তু সংক্রামক রোগ যে জীবাণুঘটিত, তা আবিষ্কার হয়নি। সেমেলভিস রোজকার মত যমঘরে এলেন। শব-ব্যবচ্ছেদের পর ভাল

মৃত্যু ও পুরোহিত

করে সাবান দিয়ে হাত ধুলেন। একবার, দুবার, তিনবার, বার বার। একবার করে হাত ধোন আর শুঁকে দেখেন, হাতে কি আঙুলে শবদেহের গন্ধ আছে কি নেই। নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি এইবার তাঁর দু-হাত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের জলভরা এক গামলায় ডুবিয়ে রাখলেন। পিচ্ছিল না হওয়া পর্যন্ত গামলা থেকে হাত ওঠালেন না। তারপর হাত তুলে আবার শুঁকে দেখলেন। ছাত্ররা সেমেলভিসের এই অবাক কাণ্ড দেখে গুঞ্জন শুরু করল।

মাস্টারমশাইর মাথাটি যে বিলকুল খারাপ হয়ে গেছে তা দেখে মুখ টিপে সবাই হাসতে লাগল ; তারপর ফিসফাস টিকা-টিপ্পনি ছাড়ল।

সেমেলভিস কিন্তু ছাত্রদের ছাড়লেন না। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিটি ছাত্রের হাত ঠিক অমনি করে ধোয়ালেন ; তারপর গামলায় লোশনে ডুবিয়ে রাখতে বাধ্য করালেন।

এইবার ছাত্রদের নিয়ে সার বেঁধে তিনি সেই এক নম্বর প্রসূতি ওয়ার্ডে ঢুকলেন। রোজকার মত প্রসব ব্যথায় কাতর হয়ে ভয় ব্যাকুল চক্ষু মেলে ঐ হতভাগ্য যুবতীরা সেমেলভিসের দিকে তাকিয়ে রইল।

এক মাস আগে অর্থাৎ এপ্রিল মাসে শতকরা আঠারো জন যুবতী-মাতা এই প্রসবজনিত জ্বরে মারা গেছে। মে, জুন—এই দু মাসে শতকরা মাত্র দুটি মাতার মৃত্যু হল। জুলাই মাসে হল একটির। নিরাপদ দুই নম্বর ওয়ার্ডের চেয়ে এক নম্বরে এখন মৃত্যু-হার অনেক কমে গেল।

আজকের দিন হলে সেমেলভিসের এই কৃতিত্বে জয়-জয়কার পড়ে যেত। সারা পৃথিবীতে সেমেলভিসের নাম ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু তখনকার দিন ছিল অন্য। ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপকরা প্রসূতিকে পরীক্ষা করার আগে ভাল করে হাত ধোয়া এবং লোশনে ডুবিয়ে প্রসবজনিত জ্বর প্রতিরোধ করা বিশ্বাস করলেন না। মৃত্যুহার কমে গেছে ঠিক, কিন্তু তার কৃতিত্ব সেমেলভিসের কিছু নয়, এই তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন। হয়ত তখন প্রসূতিদের ভিড় এত বেশি ছিল না কিংবা হাওয়াতে সেই সময় বিষ কম ছিল ; এমনিধারা অনেক আজগুবি কারণ নির্ণয় করা হল। সেমেলভিসের ওপর তাঁর বড়কর্তা বৃদ্ধ অধ্যাপক ক্লাইন বিরক্ত হলেন। অসন্তুষ্ট হলেন। শুধু তাই নয়, কি করে তাঁকে এই কাজ থেকে সরানো যায়, তার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, উনত্রিশ বৎসর বয়সের এই ছোকরা ডাক্তার বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। অতএব তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

সেই সুযোগ একদিন এসে গেল। মাত্র কয়েক মাস পরেই। তখন সেমেলভিসের বন্ধু, তিনজন নামকরা অধ্যাপক, সেমেলভিসের এই কাজের খুব সুখ্যাতি করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু এঁরা কেউ ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ নন। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হেবরা, বুক ও পেট আঙুল দিয়ে বাজিয়ে দেহের ভেতরকার অন্ত্রের যন্ত্রের রোগ নির্ণয়ের আবিষ্কারক স্কোডা এবং প্যাথলজিস্ট রকিটানস্কি সেমেলভিসের এই কাজ নিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন। তাতে সেমেলভিসকে বসন্তের

টিকা আবিষ্কারক জেনারের সঙ্গে তুলনা করা হল। সেই সময় হঠাৎ একদিন এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল ; ঐ এক নম্বর ওয়ার্ডে।

এক নম্বর ওয়ার্ডে মৃত্যুহার ক্রমশঃ যখন বেশ কমে আসছে, এমনি সময় অক্টোবর মাসে এগারটি যুবতীর হঠাৎ একসঙ্গে এই প্রসবজনিত জ্বরে মৃত্যু হল। সেমেলভিস হাত ধোয়ার কোনো পরিবর্তন করেন নি, তবু কেমন করে এই কাণ্ড হল ? বৃদ্ধ অধ্যাপক মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন, এইবার ছোকরা জব্দ হবে।

সেমেলভিস অনুসন্ধান করে দেখলেন, যমঘর থেকে শব-ব্যবচ্ছেদ করে ফেরার পর তিনি এবং তাঁর ছাত্ররা ভাল করে হাত ধুয়ে প্রথমে সেদিন যে প্রসূতিকে পরীক্ষা করেন, তার ছিল ক্যানসার এবং সেই সঙ্গে দুষ্ট স্রাব। সেই থেকে শুরু করে পর পর দশটি প্রসূতিকে তাঁরা সেদিন পরীক্ষা করেন। সেই দশটিরই মৃত্যু হয়। কাজেই প্রথমটির থেকেই এই বিষ বাকি দশটি প্রসূতির দেহে সংক্রামিত হয়েছে। কাজেই তিনি বুঝলেন, জীবন্ত দেহের দুষ্ট ক্ষত থেকেও তাহলে এই সাংঘাতিক ব্যাধি সংক্রামিত হয়।

নতুন আর একটি তথ্য সেমেলভিস শিখলেন। শুধু মৃতদেহ থেকেই এই বিষ আসে না। জীবন্ত, অসুস্থ দেহেও এই বিষ থাকে ; কিংবা থাকতে পারে। সেমেলভিস নিয়ম করলেন, প্রতিটি প্রসূতি পরীক্ষা করার আগে হাত ভাল করে ধুয়ে লোশনে ডোবাতে হবে। হাত ভাল করে না ধুয়ে আর কোন প্রসূতিকেই পরীক্ষা করা চলবে না।

মৃত্যুহার আবার কমে গেল। বৃদ্ধ অধ্যাপক ক্লাইন সেমেলভিসকে জব্দ করবার অন্য উপায় খুঁজতে লাগলেন।

১৮৪৬ সালে এই এক নম্বর ওয়ার্ডে চারশ উনষাটটি মাতার মৃত্যু হয়। এখন ১৮৪৮ সালের শেষে তিন হাজার তিনশ ছাপ্পান্নটি প্রসূতির মধ্যে মাত্র ৪৫টির মৃত্যু হল।

অবশেষে একদিন বড়কর্তার উদ্দেশ্য সফল হল। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সুযোগে সেমেলভিসকে বিপ্লবী বলে ঘোষণা করা সম্ভব হল। অধ্যাপক ক্লাইন সেমেলভিসের বদলে তাঁর পেটোয়া ব্রনকে এই কাজে নিযুক্ত করলেন। ছাত্রদের পড়াবার জন্য এবং শুধু পুতুল দিয়ে ধাত্রীবিদ্যা শেখাবার জন্য সেমেলভিসকে রাখা হল।

ক্ষোভে দুঃখে অপমানে সেমেলভিস্ চাকরি ছেড়ে নিজের দেশ বুডাপেস্টে

ফিরে এলেন। তাঁর ভিয়েনা ছাড়ার এক মাসের মধ্যে আবার ঐ এক নম্বর ওয়ার্ডে কুড়িটি যুবতীর মৃত্যু হল। কিন্তু ক্লাইন তা গ্রাহ্য করলেন না।

বুডাপেস্টে এসে সেমেলভিস সেণ্ট রকাস হাসপাতালে বিনা পয়সার এক কাজ পেলেন। অতিশয় নোংরা হাসপাতাল। খুপরির মতো ঘর। অন্ধকার, দুর্গন্ধ-ভরা।

এমনি একটি ঘরে ছটি মাতার প্রসব হয়েছে। সেমেলভিস দেখলেন, তার মধ্যে একটি মৃত, আর একটি মরণাপন্ন। বাকি চারটির সেই সাংঘাতিক প্রসবজনিত জ্বর।

এদের যিনি চিকিৎসক, তিনিও একজন সার্জন। পচা গলা ঘা ঘেঁটে তিনি এসে প্রসব করান। কাজেই সেমেলভিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং হাত ধোয়ার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিলেন। ফলে এই খুপরির মত অন্ধকার হাসপাতালে প্রসব হতে এসে এক হাজার মায়ের মধ্যে মাত্র আটটি মাতার মৃত্যু হল, ছ-বছরে।

সেমলভিস বুডাপেস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন, ১৮৫৫ সালে। এইখান থেকেই তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'প্রসবজনিত জ্বরেব কারণ এবং প্রতিকার' প্রকাশিত হল ১৮৬১ সালে। আর একটি বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গ রচনা তিনি প্রকাশ করলেন ঐ একই সালে। এইবার চিকিৎসক মহলে সাংঘাতিক হুলস্থুল পড়ে গেল। এই রচনার নাম "হরেক রকম ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপকদের কাছে খোলা চিঠি"।

সেমেলভিস দেখলেন, সামান্য একটু পরিষ্কার থাকা এবং প্রসূতিকে পরীক্ষা করার আগে হাত ভাল করে ধুয়ে এই লোশনে ডুবিয়ে রাখা যেখানে মাতাকে ঐ সাংঘাতিক প্রসবজনিত জ্বরে মৃত্যু থেকে রক্ষা করে, তাই ইউরোপের চিকিৎসকেরা কেউ মানলেন না। উল্টে সবাই তাঁকে ঠাট্টা করলেন, ব্যঙ্গ করলেন। এদিকে হাসপাতালে হাজারে হাজারে মাতার মৃত্যু হল। অথচ তাঁর নিজের বুডাপেস্ট ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে এই প্রথা প্রবর্তন করে প্রসবজনিত জ্বরের মৃত্যু তিনি শূন্যে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এই হাসপাতালে এই রোগে আর কোনো মাতার এখন মৃত্যু হয় না। তাহলে এই হোমরা-চোমরা ধাত্রীবিদ্যাবিশারদরা সব কি? নিশ্চয়ই মাতৃহন্তা।

সেমেলভিস ক্ষেপে গেলেন এবং এই সব বিশেষজ্ঞদের নামে নামে খোলা চিঠি ছাড়তে লাগলেন। লিখলেন, এই হতভাগ্য প্রসূতিদের এমন

অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী আপনি নিজে। কাজেই আপনি একটি মাতৃহন্তা এবং খুনী।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এই চিঠির কোনো জবাব দিলেন না। এই উপেক্ষায় সেমেলভিস আরও বেশী ক্ষেপে গেলেন। এইবার তিনি সাংঘাতিক এক কাণ্ড করে বসলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এক সাময়িক পত্রিকায় সর্বসাধারণের কাছে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে নিজের মনের বিষ ছড়িয়ে দিলেন। লিখলেন, আপনি যদি সন্তানের জন্মদাতা পিতা হন, তাহলে স্ত্রীর প্রসবের সময় ডাক্তার অথবা ধাত্রী ডাকার মানে কি জানেন? তার মানে, আপনার স্ত্রীর জীবন বিপন্ন করা। যদি আপনি বিপত্নীক না হতে চান, আপনার সন্তানদের মাতৃহারা না দেখতে চান, তাহলে দোহাই আপনার নিজে গিয়ে সামান্য কয়েক আনা খরচা করে কিছু ব্লিচিং পাউডার কিনে আনুন। একটা গামলায় রেখে তার ওপর জল ঢালুন। ডাক্তার অথবা ধাত্রীকে আপনার সামনে ঐ জলে ভাল করে হাত ডুবিয়ে না রাখা পযন্ত খবরদার তাদের আপনার স্ত্রীকে পরীক্ষা কবতে দেবেন না। নিজে দাঁড়িয়ে দেখবেন, ঐ গামলার জলে ডাক্তাব অথবা ধাত্রীর হাত যতক্ষণ না পিচ্ছিল হয়, ততক্ষণ তাদের ছাড়বেন না। এখন থেকে সেমেলভিসের সব কাজে এবং কথায় শুধু একটি শ্লোগান ঘোষিত হল, "খুন বন্ধ করা চাই"।

এইবার চিকিৎসক মহলে আন্দোলন শুরু হল। জার্মানীতে ভিয়েনায় সেমেলভিসের হুমকিতে কাজ হল। বিশেষজ্ঞদের টনক নড়ল। যখন সবাই তাঁর নির্দেশ মানতে শুরু করলেন, তখনও সেমেলভিস রাস্তায় কোনো তরুণ-তরুণীকে একত্র দেখলে এগিয়ে যেতেন। তাদের দাঁড় করিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় সন্তান প্রসবের আগে ব্লিচিং পাউডার জলে ফেলে ডাক্তারদের হাত ধোয়াবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। অপরিচিত, অজানা এই তরুণ-তরুণী একথায় কি ভাবতে পারে, সে খেয়াল তাঁর থাকত না।

সেমেলভিসের যুবতী স্ত্রী মেরী স্বামীর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে উদ্বিগ্না হলেন। তিনি দেখলেন সেমেলভিস কেমন যেন ছটফটে এবং অস্থির পায়ে চলেন। কথায় কথায় চটে উঠেন। শুধু নিজের সন্তানদের প্রতি কখনও তিনি রাগ করেন না। একদিন সেমেলভিস নিজেই স্ত্রীকে বললেন, আচ্ছা আমার এ কি হল? মাথাটা কি সত্যি খারাপ হয়ে গেল?

তখন ১৮৬৫ সাল, গ্রীষ্মকাল। মেরী তাঁর কোলের বাচ্চাটিকে নিয়ে

সেমেলভিসকে সঙ্গে করে ভিয়েনায় এলেন। এখানে এসে তাঁরা সেমেলভিসের বন্ধু প্রফেসর হেবরার বাড়িতে উঠলেন। ডাঃ হেবরা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। মিসেস হেবরার যখন প্রথম সন্তান হয় তখন সেমেলভিসই তাঁর প্রসব করান। সেই সময় প্রাণ খোলা হাসি হেসে তিনি বলেছিলেন ছেলে হবে। আজ সেই সেমেলভিস মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সেই যেন অতি বৃদ্ধ এক স্থবির। মুখে হাসি নেই, কথা নেই।

মিসেস হেবরাকে দেখে সেমেলভিস কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। যেন পুরানো কি কথা হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল। হেসে বললেন, তোমার প্রথম যখন সন্তান হয় আমি বলেছিলাম ছেলে হবে মনে পড়ে সে কথা? কিন্তু সেমেলভিসের এ হাসি আগেকার সেই প্রাণখোলা হাসি নয়। এ যেন নির্জীব মৃতের হাসি।

কয়েক মিনিট তিনি বন্ধু হেবার সঙ্গে বেশ গল্প করলেন তার পরই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। অবশেষে এক বন্ধ গাড়িতে ডাঃ হেবরা সেমেলভিসকে পাগলা গাবদে নিয়ে গেলেন। সেখানে তালা বন্ধ করে তাঁকে রাখা হল।

ভিয়েনায় আসার আগে বুডাপেস্টে শেষ অপারেশন করবার সময় সেমেলভিসের আঙুল ছুরিতে একটু কেটে যায়। সেই ক্ষত থেকে রক্ত দূষিত হয়ে পাগলা গারদে এসে তাঁর মৃত্যু হয়। ক্ষত থেকে রক্ত দূষিত হওয়ার যে রোগ তিনি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন সেই রোগেই তাঁর মৃত্যু হল। আগস্ট মাসে ১৮৬৫ সালে।

ঠিক সেই সময় লুই পাস্তর সংক্রামক রোগেব কারণ আবিষ্কার করলেন। জীবাণুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হল। লর্ড লিস্টার সার্জারিতে জীবাণুনাশক কারবলিক ব্যবহার শুরু করলেন। তখন সবাই বুঝল, সেমেলভিস কত আগে এই তথ্য আবিষ্কার করে প্রসবজনিত জ্বর প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অতএব সেমেলভিসের নিজের দেশ বুডাপেস্টে তাঁর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হল। এই স্মৃতিসৌধে দেখা যায় সেমেলভিস তাঁর বই বগলে করে দাঁড়িয়ে আছেন। পায়ের কাছে একটি যুবতী মাতা বসে। ছেলে কোলে করে ভক্তি গদগদ চোখে তার ত্রাণকর্তা সেমেলভিসের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। এই স্মৃতিসৌধ সত্যি ভারি সুন্দর। বিশেষ একজন প্রহরী সর্বদা এই সৌধ পাহারা দেওয়ার জন্যে নিযুক্ত আছে।

কিন্তু ধাত্রীবিদ্যার ইতিহাসে সেমেলভিসকে নিয়ে ধাত্রীবিদ্যা বিশারদদের যে কুকীর্তি কলঙ্কে কালিমাখা হয়ে আছে তা কোনোদিন মুছবে কি?

লুই পাস্তর

অসুখ হলে ডাক্তাররা আজকাল কথায় কথায় রক্তপরীক্ষা কারন। মলমূত্র, থুতু ইত্যাদিতে জীবাণু খোঁজেন। জীবাণু-তত্ত্ব না জানলে আজকাল আর ডাক্তারি করা যায় না। রোগ নির্ণয়ও হয় না। অথচ এই জীবাণু-তত্ত্বের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, চিকিৎসায় এই তত্ত্বের যিনি প্রথম প্রয়োগকর্তা তিনি কিন্তু নিজে কখনও ডাক্তার ছিলেন না। চিকিৎসা-বিদ্যা তিনি জানতেন না। এই অসাধারণ লোকটির নাম লুই পাস্তর (১৮২২—৯৫)।

পাস্তরের বাবা নেপোলিঅনের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে একসঙ্গে যুদ্ধ করেন। সৈনিক হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য 'ক্রশ অফ দি লিজিঅন অফ অনার'-এর সম্মান তাঁকে দেওয়া হয়। যুদ্ধ শেষে এই সার্জেণ্ট মেজর দেশে ফিরে নিজের জাত ব্যাবসা শুরু করলেন। এই ব্যাবসা চামড়া শুকিয়ে ট্যান করা। চর্মকারের কাজে নেবে এক মালীর মেয়েকে বিবাহ করে তিনি সংসার পাতলেন। পাস্তর তাঁদের তৃতীয় সন্তান ; কিন্তু বড় ছেলে। ফরাসী দেশের দোলে (জুরা পাহাড়ে) তাঁর জন্ম, ১৮২২ সালে।

তখনকার দিনে ফরাসী দেশে চাষাভুষারা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া কখনও শেখাত না। কিন্তু পাস্তরের বাবা ছেলেকে লেখাপড়া শেখালেন। স্কুলে ভরতি করলেন। ছেলেবেলায় পাস্তর পড়াশুনায় বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। শুধু ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে খুব ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর আর একটি নেশা ছিল ছবি আঁকা। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে তাঁর বাবা মার যে প্রতিকৃতি তিনি এঁকে গেছেন, তার আর তুলনা নেই। দেখে মনে হয়, এই ছবি আঁকার দিকে মন দিলে একদিন তিনি হয়ত নামকরা একজন আর্টিস্ট হতে পারতেন।

বিশ বছর বয়সে পাস্তর প্যারিসে এলেন এবং একোলে-নরমালে (নরমাল স্কুলে) ভরতি হলেন। এ যেন অজ পাড়াগেঁয়ে এক ছেলে কলকাতায় এসে

কলেজে ভরতি হল। তফাত শুধু এই, ঐ স্কুলে পড়তে বাপ মায়ের তখন কোনো খরচা হত না। বিনা বেতনে শিক্ষাদান তখনকার ঐ দিনেও ফরাসী দেশেই সম্ভব ছিল। পাস্তর এই স্কুল থেকে গ্রাজুয়েট হলেন, ১৮৪৭ সালে।

তখন পাস্তরের শিক্ষক আঁদ্রে দুমা জৈব রসায়ন (অরগ্যানিক কেমিস্ট্রি) নিয়ে খুব মত্ত। পাস্তরও এই রসায়নের দিকেই ঝুঁকে পড়লেন।

তিনি দেখলেন, মদের পিপের ওপর টারটারিক অ্যাসিডের যে ক্রস্টাল জমে সেই ক্রস্টাল পলকাটা। এই পল কোনোটা ডান-মুখী কোনোটা বা বাঁ-মুখী। জলে ডান-মুখী ঐ ক্রস্টাল গুলে কাঁচের শিশিতে আলোর কাছে ধরলে আলোর রশ্মি ডাইনে বেঁকে যায়। আর বাঁ-মুখী ক্রস্টালের বেলায় বাঁয়ে। এই দুরকম ক্রস্টাল ছাড়া নতুন আর এক রকম ক্রস্টাল পাস্তর আবিষ্কার করলেন। সেই ক্রস্টাল নিউট্রাল। আলোর রশ্মি এর ভেতর সোজা চলে যায়। ডাইনে বাঁয়ে কোনো দিকেই বেঁকে যায় না। মৌলিক গবেষণার এই প্রবন্ধ 'মলিকুলার ডিসসিমেটি' নামে প্রকাশিত হল, ১৮৪৮ সালে।

এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে পাস্তরের নাম ছড়িয়ে পডল। নামের সঙ্গে সঙ্গে খাতির যেমন বাডল, সেই সঙ্গে শত্রুও তেমনি বাড়ল। পাস্তর স্ট্রাসবুর্গ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপর্ক নিযুক্ত হলেন। তারপর একদিন ইউনিভার্সিটির রেকটরের যুবতী কন্যাটিরও হৃদয় জয় করে ফেললেন। সাতাশ বৎসর বয়সে পাস্তর এই মেয়েটিকে বিবাহ করলেন। এই মেয়েটিকে সঙ্গিনী পেয়ে তাঁর কাজে উৎসাহ বেড়ে গেল। মাত্র ছ-বৎসরের মধ্যেই তিনি লিলের ফ্যাকালটি অফ সায়ান্সের ডীনের পদে উন্নীত হলেন।

এইখানে এসে পাস্তরের মন রসায়ন থেকে জীবাণুর দিকে ঝুঁকল। পাস্তরের দু-শ বছর আগে সতেরো শতকে হল্যাণ্ডের সামান্য এক দারোয়ান, অ্যানটনিভ্যান লু এন হক সর্বপ্রথম নিজের চোখে জলে কীটাণু দেখতে পান, নিজের হাতে তৈরী মাইক্রোসকোপে। তারপর দু-শ বছর চলে গেছে, জীবাণুর অস্তিত্ব নিয়ে নানা রকম মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কিছুই প্রমাণ হয় নি।

জীবদেহে প্রাণ কি করে আসে, প্রাণহীন দেহে অথবা উদ্ভিতে পচন কি করে ধরে, এই নিয়ে তখন তুমুল বাদানুবাদ চলত। জার্মানীর জাসটাস ফন লিবিগ তখনকার দিনের নামকঁরা রসায়নবিদ। তিনি কীটাণু মানতেন না। জীবাণুও মানতেন না। মাইক্রোসকোপে দেখা এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থকে

তিনি হিজিবিজি বলেই উড়িয়ে দিতেন। বলতেন, কীটাণুই যদি জীবের পচন ঘটায়, তাহলে ঐ কীটাণু নিজেই বা একদিন পচে কি করে?

তখন একদল বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন, জীবদেহে প্রাণ নিজে থেকেই স্ফুরিত হয় (স্পনটেনিআস জেনারেশন), অপর দল বলতেন তা হয় না।

এই তথ্য প্রমাণের জন্য তখন একটা কাঁচের শিশিতে একটুকরো মাংস জলে ফুটিয়ে ছিপি এঁটে রাখা হত। আগুনে পোড়ালে অথবা জলে সিদ্ধ করলে সব প্রাণীরই যে মৃত্যু হয় সে বিষয়ে সবাই একমত। কাজেই এই মাংস যখন ফোটান হল, তখন সেই মাংসও প্রাণহীন হল। তারপর কয়েকদিন পরে ঐ ছিপি যখন খোলা হত কেউ দেখতেন, ঐ মাংস পচে গেছে। কীটাণুতে ভরে গেছে। আবার কেউ কেউ দেখতেন সিদ্ধ মাংস তেমনি অবিকৃত আছে।

কাজেই একদল বলতেন, ছিপি আঁটা প্রাণহীন বস্তুর মধ্যেও যখন প্রাণসঞ্চার হয়েছে, তখন প্রাণ স্বতঃস্ফূর্ত। আর এক দল বলতেন ছিপি ভাল করে আঁটা হয় নি তাই বাইরে থেকে জীবাণু ঢুকেছে এবং পচন ঘটিয়েছে। এই নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক হত।

পাস্তর এইদিকে মন দিলেন। ছোট্ট একটি ঘরে নিজের যন্ত্রপাতি সাজিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। পাস্তর দেখলেন, ঘরের যে বাতাস তাতে পর্যন্ত ধুলো থাকে। একটা কাঁচের টিউবে পরিষ্কার সাদা একটু তুলো গুঁজে অপর দিকে মুখ লাগিয়ে হাওয়া টেনে পাস্তর তা প্রমাণ করলেন। সাদা তুলো কালো হয়ে গেল।

পাস্তর ভাবলেন, এই বাতাসে যদি এত ধুলো থাকে তাহলে তার মধ্যে জীবাণুই বা থাকবে না কেন? এবং সেই জীবাণু যদি ঐ ছিপির ফাঁক দিয়ে ঐ সিদ্ধ মাংসে ঢোকে তাতেই বা বাধা কি?

পাস্তর নতুন রকমের কাঁচের ফ্লাস্ক তৈরি করালেন। তার গলাটা বকের মত লম্বা। বার বার ওপর নিচ করে আঁকাবাঁকা। এই সরু মুখ দিয়ে হাওয়া ফ্লাস্কে ঢুকবে। কিন্তু বাঁকের মুখে বার বার ধাক্কা খেয়ে ধুলোবালি সব আটকে যাবে। এই ফ্লাস্কে মাংসের সুপ রেখে পাস্তর আগুনের ওপর বসালেন। তারপর ভাল করে ফুটিয়ে এই ফ্লাস্ক রেখে দিলেন। দেখা গেল এই সুপ পচল না। অবিকৃত রইল।

একই পরীক্ষা বার বার পাস্তরের হাতে একই ফল দিল। ঐ সুপ পচল

না। পাস্তর ভাবলেন, ধুলার সঙ্গেই যদি এই জীবাণু থাকে, তাহলে যে আকাশে ধুলো নেই সেখানে গিয়ে একবার পরীক্ষা করা দরকার। কুড়িটি ফ্লাস্ক নিয়ে পাহাড়ে উঠে তিনি ছিপি খুললেন। মাত্র পাঁচটি ফ্লাস্ক খারাপ হল ; বাকি পনেরোটি পরিষ্কার রইল।

পাস্তর ভাবলেন আরও ওপরে উঠে তিনি পরীক্ষা করবেন। এইবার তেত্রিশটি ফ্লাস্ক নিয়ে তিনি আলপস পাহাড়ে উঠলেন। তেরোটির ছিপি খুললেন পাহাড়ের ওপর ; গাইডের ঘরে। তেরোটি সুপই পচে গেল। বাকি কুড়িটা নিয়ে তিনি আরও ওপরে উঠলেন একা ; মানুষের বসবাবাসের বহু উর্ধ্বে। এইখানে এসে ছিপি খুললেন। এই কুড়িটিব মধ্যে একটি মাত্র খারাপ হল।

পাস্তরের নিজের মনে আর কোনো সংশয় রইল না। জীবাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ তিনি পেয়েছেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি ঘরে ফিরলেন।

কিন্তু তাঁর এই পরীক্ষা অনেক বিজ্ঞানীই মানলেন না. জীবাণুব অস্তিত্বে তাঁরা কেউ বিশ্বাস করলেন না। নানাভাবে তাঁর প্রতি গালমন্দ বিদ্রূপের গোলাগুলি ছুঁড়তে লাগলেন।

এমনি সময় তাঁর কলেজের একটি ছাত্র এসে খবর দিল, তার বাবার সুরাশিল্প নষ্ট হতে বসেছে। ভাটিতে আঙুরেব রস টকে যাচ্ছে; কিন্তু সুরাতে পরিণত হচ্ছে না। পাস্তর যদি একবার গিয়ে কোনো প্রতিকার বাতলে দেন।

ফরাসী দেশ চিরকাল নানাবিধ মহামূল্য সুরার জন্য বিখ্যাত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ সোমরস তৈরি করেছে। খেয়েছে, স্ফূর্তি করেছে। নেশা করে বুঁদ হয়েছে। আঙুর পিষে একটা ভাটিতে রাখা হয়েছে। গ্রাম্য মেয়েরা মাথায় ফুল গুঁজে বেণী দুলিয়ে হাত ধরাধরি করে তার চারধারে নৃত্য করেছে। গান গেয়েছে। আর দেবতার অনুগ্রহে ঐ রস ভাটিতে গেঁজে উঠেছে এবং সুরায় পরিণত হয়েছে।

গ্রাম্য লোকের সরল বিশ্বাস, সোমরসের দেবতার দয়ায় আঙুরের রস সুরায় পরিণত হয়। কিন্তু পাস্তরের রাসায়নিক মন এই ব্যাখ্যায় তুষ্ট হল না। তিনি ভাবলেন, বিয়ার ওয়াইন এসব আসলে কি জিনিস? সামান্য কিছু কঠিন অতরল দ্রব্য, জল, কিছু গন্ধ দ্রব্য এবং বাকিটা অ্যালকোহল। কিন্তু ঐ গাঁজানো ব্যাপারটা কি ? আঙুরের রস গেঁজে ওঠে কি করে ?

ছাত্রটির বাবার ভাটিখানায় গিয়ে পাস্তর কিছু নমুনা নিয়ে এলেন।

যে ভাটিতে সুরা হয়েছে এবং যেখানে হয়নি এই তুরকম নমুনা নিয়ে এসে মাইক্রোসকোপে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, যে রসে খামি (ঈস্ট) আছে সেই রসে সুরা হচ্ছে। কিন্তু যে রস টকে গেছে সে রসে খামি নেই। সুরাও নেই।

পাশাপাশি তুটি শিশি তিনি আলোর সামনে ধরলেন। চোখ কাছে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। শিশি ঝাঁকিয়ে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, টকে যাওয়া শিশির গায় দানার মত কি যেন আটকে আছে। রসের ওপরেও কি যেন ভাসছে। লম্বা ছুঁচের ডগায় ঐ জিনিস তুলে তিনি মাইক্রোসকোপে চড়ালেন। দেখলেন, অতি ক্ষুদ্র সরু কাঠির মত সব জীবাণু দলা পাকিয়ে আছে। কতকগুলি আবার নড়ছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পাস্তর বুঝলেন, এই জীবাণুরাই আঙুর রসের খামি নষ্ট করে। তাই আর সুরা তৈরি হয় না। ঠিক তুধের মতো টকে যায়।

পাস্তব বুদ্ধি দিলেন, এই রস গরম করা হোক। গরমে এই জীবাণু মরে যাবে। তারপর ঐ রসে খামি মেশালে সুরা তৈরী হবে।

এই বুদ্ধিতে কাজ হল। দেশের সুরা-শিল্প রক্ষা পেল। গরম করে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর হঠাৎ ঠাণ্ডা করে জীবাণু শূন্য করবার পদ্ধতির নাম হল, পাস্তরিজেশন। সারা পৃথিবীতে এই পদ্ধতিতে এখনও তুধ জীবাণুশূন্য করা হয়।

খামির জন্যই যে সুরা উৎপন্ন হয় তাও পাস্তর প্রমাণ করে দেখালেন। আঙুর যখন পাকে তখন গায়ে সাদা একরকম ছাতা পড়ে। এই ছাতা একরকম উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদই খামি। আঙুরের সঙ্গে এই উদ্ভিদও পেষা হয়। ভাটিতে যায়, তারপর রস গেঁজে ওঠে। যখন যথেষ্ট পরিমাণে সুরা উৎপন্ন হয় তখন এই খামিও ধ্বংস হয়।

এই জিনিস প্রমাণ করবার জন্য পাস্তর নিজের বাড়ির আঙুরলতায় পাকবার আগেই আঙুরের গায় কাপড় জড়িয়ে বেঁধে রাখলেন। আঙুর একদিন পাকল। খেতেও খুব সুমিষ্ট হল। কিন্তু দেখা গেল গায়ে শাদা ছাতা নেই। এই আঙুর পিষে যখন ভাটিতে দেওয়া হল, সেই রস আর গাঁজল না। এতদিনে সুরার সমস্যা সমাধান হল। 'ফারমেনটেশন' সম্বন্ধে পাস্তরের প্রবন্ধ বেরুল ১৮৫৭ সালে। পাঁচ বছর পর ১৮৬২ সনে 'স্পনটেনিআস জেনারেশন'। এবং এক বছর পরে ১৮৬৩-তে 'ডিজিজেস অব বিয়ার'।

তারপর হঠাৎ একদিন পাস্তরকে তাঁর ল্যাবরেটরী ছেড়ে রেশম কীটের গবেষণায় দক্ষিণ ফ্রান্সে যেতে হল। তাঁর শিক্ষক ডুমা এসে বললেন রেশম কীটের কি এক রোগ দেখা দিয়েছে। দেশের রেশম শিল্প ধ্বংস হতে বসেছে। পাস্তর দেশের সুরা-শিল্প বাঁচিয়েছেন, এইবার রেশম-শিল্প না রক্ষা করলে চলবে না। পাস্তর নিজে দেশপ্রেমিক। তাই তক্ষুণি তিনি রাজী হয়ে গেলেন। অথচ রেশম কীট সম্বন্ধে তখন কিছুই তাঁর জানা নেই।

পাস্তর ঐ রেশমকীট সম্বন্ধে কয়েকখানা বই সংগ্রহ করলেন। তারপর দক্ষিণ ফ্রান্সের শিল্প অঞ্চলে এক গ্রামে গিয়ে বসলেন। এইখানে এসেও তাঁর অভ্যাস মতো ঐ কীট মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখতে শুরু করলেন। অসীম অধ্যবসায়ে একদিন ঐ কীটে কি রোগ হয় তা তিনি আবিষ্কার করলেন এবং তার প্রতিবিধান বার করলেন। পাস্তরের জন্য দেশের রেশম-শিল্পও রক্ষা পেল। 'রেশমকীটের রোগ' নামে তাঁর প্রবন্ধ বেরুল, ১৮৬৫ সালে।

পাস্তর আবার প্যারিসে ফিরে এলেন। একদিন অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সে পাস্তর এক প্রবন্ধ পাঠ করছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁর মনে হল দেহের বাঁদিকটা কেমন যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। পাস্তর তবু বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু ঐ রাত্রে সাংঘাতিক এক কাণ্ড হল। পাস্তর সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল। দেহের বাঁদিকে পক্ষাঘাত হল।

সবাই ভাবল, পাস্তর আর বাঁচবেন না। তাঁর জন্য ফ্রান্সের সম্রাট নতুন এক ল্যাবারেটরী তৈরীর আদেশ দিয়েছিলেন। তৈরীও শুরু হয়েছিল। কিন্তু শত্রুদের রটনায় এ কাজ বন্ধ হয়ে রইল। সবাই বলল, পাস্তর নিজেই যদি না থাকেন তাহলে অতগুলি টাকা খরচ করে ঐ বাড়ি তৈরি করে কি হবে?

আড়াই মাস পরে পাস্তরের বাকশক্তি ফিরে এল। পাস্তর চেঞ্জে যেতে সমর্থ হলেন। সেই সময় আবার এক দুর্ঘটনা ঘটল। প্রুসিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করল। প্যারিস দখল করল। পাস্তর তাঁর ফ্রান্সকে ভালবাসতেন। প্রুসিয়ার ওপর তিনি ক্ষেপে গেলেন। বন ইউনিভার্সিটি তাঁকে একদিন এম ডি উপাধি দিয়েছিল। ঘৃণায় অপমানে পাস্তর সেই ডিগ্রি প্রত্যাখ্যান করে গালাগাল দিয়ে এক চিঠি লিখে ফেললেন।

যেদিন থেকে পাস্তর জীবাণুতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন সেইদিন থেকেই চিকিৎসক সমাজ তাঁর শত্রু হয়েছেন। যখন পাস্তর তাঁর প্রামাণিক

তথ্য উপস্থিত করেছেন, তখনও চিকিৎসকরা শ্লেষের সঙ্গে বলেছেন, আপনি কি ডাক্তার? কই আপনার ডিগ্রি দেখি?

কাজেই পাস্তুর অ্যাকাডেমি অফ মেডিসিনের সভ্য হতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধের পর যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল, পাস্তুর এই সুযোগ পেলেন। মাত্র এক ভোটে জিতে পাস্তুর এই অ্যাকাডেমিতে ঢুকলেন, পক্ষাঘাত নিয়ে, ১৮৭১ সালে।

পাস্তুরের বিরোধীরা যখন জীবাণু নিয়ে পাস্তুরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং ব্যঙ্গ করে চলেছেন তখন এডিনবরায় জোসেফ লিস্টার সার্জারিতে পাস্তুরের এই প্রবন্ধ পড়ে হাসপাতালে জীবাণুশূন্য অপারেশনের রীতি প্রবর্তন করেছেন।

পাস্তুরের কাছে একদিন এক চিঠি এল। লিস্টার লিখেছেন, আপনার জীবাণু বিষয়েব গবেষণার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনার ঐ চমৎকার গবেষণার জন্যই আমি বুঝেছি, জীবাণুই দেহে পচন ঘটায়। তাই অপারেশনে জীবাণুশূন্য রীতি এখানে এত বেশী সফল হয়েছে। যদি কখনও আপনি এডিনবরায় আসেন, দেখবেন আপনার ঐ কাজের জন্য কত শত দুঃস্থ মানব উপকৃত হয়েছে।

এই চিঠি পেয়ে পাস্তুর ছোট ছেলের মত যেন লাফিয়ে উঠলেন। যাকে সামনে পেলেন, তাকেই ঐ চিঠি দেখালেন। কাগজে ছাপালেন। ১৮৭১ সালে তাঁর "বিয়ারে জীবাণু" বলে যে প্রবন্ধ বেরুল তারও মুখবন্ধে এই চিঠি তিনি ছাপিয়ে দিলেন।

সেই সময় ফ্রান্সের গোরু ভেড়ার হঠাৎ এক মড়ক লেগে গেল। এক একটা গ্রামে এই রোগ ঢোকে আর শতকরা পঞ্চাশটি করে গোরু ভেড়ার মৃত্যু হয়। প্রাচীনকাল থেকে এই অ্যানথ্রাকস রোগ গবাদি পশু বিনষ্ট করেছে। সাংঘাতিক এই রোগ। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জরেই পালকে পাল গোরু ভেড়ার মৃত্যু হয়েছে। যে রাখাল সুস্থ সবল গোরু ভেড়া নিয়ে মাঠে চরাতে গিয়ে হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে, বাড়ি ফেরবার সময় ঘুম ভেঙে সেই হয়ত দেখেছে, পালে একটা গোরুও বেঁচে নেই। একটা ভেড়াও জীবিত নেই। মাঠ জুড়ে শুধু মৃত পশু। যদি কোনো রাখাল কাটা কিংবা ছড়ে যাওয়া হাতে ঐ মৃত পশু ছুঁয়েছে, তারও অমনি করে মৃত্যু হয়েছে। এমনি ভীষণ এই রোগ।

পাস্তুর এই কঠিন রোগের প্রতিকারে হাত দিলেন। জীবাণু-বিদ্যায় তাঁর

পরবর্তী বিশেষজ্ঞ জার্মানীর রবার্ট কক্ তখন এই অ্যানথ্রাকস রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেছেন; মৃত গোরু ভেড়ার রক্তে। ১৮৭৬ সালে। কক্ আরও দেখিয়েছেন, এই জীবাণু ছোট্ট মটর দানার মতো গুটিতে (স্পোরে) আবদ্ধ থাকে। কক্ এই জীবাণু বিলিতি ইঁদুর, খরগোস এবং ইঁদুরের গায় ইনজেকশন দিয়ে এই রোগ সংক্রামিত করতে সমর্থ হন। তবু তাঁর মনে দ্বিধা, হয়ত ভেড়া গোরুর অ্যানথ্রাকস ভিন্ন।

পাস্তর তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে সব দ্বিধা সব সন্দেহ নিমেষে দূর করে দিলেন।

যে স্যুপে এই জীবাণু ভাল গজায় সেই স্যুপের একশ সি সি তিনি দশটি ফ্লাস্কের প্রতিটি ফ্লাস্কে রাখলেন। এই ফ্লাস্কের প্রথমটিতে অ্যানথ্রাকসের জীবাণু সংক্রামিত করলেন। এই ফ্লাস্কে তাই একশ সি সি অ্যানথ্রাকসের জীবন্ত কালচার তৈরি হল। এই থেকে তিনি মাত্র এক সি সি তুলে দ্বিতীয় ফ্লাস্কে মেশালেন। তাহলে এই দ্বিতীয় ফ্লাস্কে প্রথমটার একশ গুণ কম অ্যানথ্রাকস কালচার রইল। এইবার দ্বিতীয় ফ্লাস্কটি থেকে এক সি সি তুলে তিনি তৃতীয়টিতে মেশালেন। ফলে দশম ফ্লাস্কে দশ কোটি গুণ কম জীবাণু রইল। অথচ এই দশম ফ্লাস্কের এক ফোঁটা যখন ভেড়ার গায় ইনজিকশন দেওয়া হল, ঐ অ্যানথ্রাকস রোগে তাব মৃত্যু হল।

পাস্তর দেখলেন, কোন একটি বিশেষ জায়গায়, বিশেষ এক জমিতে যেন এই রোগের প্রকোপ বেশী। বিশেষ করে যে জমিতে ঐ মরা জন্তু কবর দেওয়া হয়, সেখানে। পাস্তর ঐ মাটি খুঁড়ে কেঁচোর পেটে অ্যানথ্রাকস-এর গুটি পেলেন। এইবার সব রহস্য সমাধান হয়ে গেল। ঐ গুটি সহজে মরে না। ঐ মাটিতে যে ঘাস জন্মে তাতেও ঐ গুটি আটকে থাকে এবং ঐ ঘাস খেয়ে পশুদের রোগ হয়। অতএব এই রোগ থেকে গবাদি পশুকে বাঁচাতে হলে মৃত পশু মাটিতে কবর দেওয়া চলবে না। পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

অ্যানথ্রাকস-এর জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কবতে গিয়ে পাস্তর দেখলেন, সামান্য একটু কারবলিকে এই জীবাণু ম্রিয়মান হয়, কিংবা মরে যায়। সেই জীবাণু কোন জন্তুকে ইনজেকশন দিলে তার এই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মে; ঠিক যে পদ্ধতিতে বসন্তের টিকা দিয়ে বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করা হয়। তাহলে এই উপায়ে গবাদি পশুকে এই রোগ থেকে বাঁচাতে বাধা কি ?

পাস্তুর ঘোষণা করলেন, পঞ্চাশটা ভেড়াকে যদি জীবন্ত ঐ জীবাণু ইনজেকশন দেওয়া হয় তাহলে পঞ্চাশটাই এ রোগে মারা যাবে। কিন্তু যদি এর মধ্যে পঁচিশটাকে ঐ কারবলিক দেওয়া অর্ধমৃত কি স্তিমিত জীবাণু ইনজেকশন করা হয় তাহলে ঐ পঁচিশটা ভেড়াই এই রোগ প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে।

যাঁরা পাস্তুরের ভক্ত তাঁরা ভাবলেন, পাস্তুরের কথা কখনও মিথ্যা হয় না। নিশ্চয়ই তাই হবে। আবার একটা বিরাট প্রমাণ তিনি খাড়া করতে সমর্থ হবেন ভেবে তাঁরা খুশী হলেন।

পাস্তুরের যাঁরা শত্রু তাঁরাও খুব খুশী হলেন। উল্লসিত হলেন। ভাবলেন, এই বুড়ো বয়সে মূর্খটার পতন এবার সুনিশ্চিত।

বন্ধুরা কিন্তু শঙ্কিত হলেন। ভাবলেন, এই বয়সে এরকম অনাবশ্যক ঝুঁকি নেওয়া পাস্তুরের ঠিক হল না।

কিন্তু এই ঘোষণায় মিলুনের এগ্রিকালচারাল সোসাইটি পঞ্চাশটি ভেড়ার ওপর এই পরীক্ষায় রাজী হলেন। ইনজেকশন দেওয়া হয়ে গেল। তারপর নানারকম গুজব শোনা গেল। কেউ বলল, পাস্তুর এবার ডুবল। একটা ভেড়া মরেছে। পাস্তুরের শিষ্যরা ছোটাছুটি শুরু করল। রাত্রিতে পাস্তুর খবর পেলেন, সত্যি একটা ভেড়া মর-মর। সারারাত আজ আর তাঁর নিদ্রা নেই। শিষ্যরা এই প্রথম দেখল, পাস্তুর বিচলিত। গম্ভীর মুখ। উদ্বেগে সন্দেহে সংশয়াকুল। বিষাদে বিষণ্ণ চোখ। কুঞ্চিত ভ্রূ।

রাত্রি প্রভাত হল। দলে দলে লোক ঐ ফার্মে ছুটল। দেখা গেল, যে পঁচিশটা ভেড়া শুধু জীবন্ত অ্যানথ্রাকস ইনজেকশন পেয়েছিল তারা সব মৃত। আর যে পঁচিশটি ঐ ভ্যাকসিন পেয়েছে তারা সব জীবিত। একটিরও মৃত্যু হয় নি। পাস্তুর যখন লাঠি ভর দিয়ে পক্ষাঘাতে পঙ্গু বাঁ পা টেনে টেনে ঐ ফার্মে এলেন, জনতা বিরাট এক জয়ধ্বনি তুলল। কিন্তু পাস্তুরের কানে এ জয়ধ্বনি পৌঁছল না। জীবন্ত ঐ পঁচিশটি ভেড়ার দিকে তাকিয়ে তিনি যেন দেখলেন, মানুষ সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে। রোগ জয় করেছে। কিন্তু যেই তাঁর হুঁশ হল, অমনি লাঠি তুলে উল্লসিত জনতার দিকে তেড়ে গিয়ে বললেন, তবে রে অবিশ্বাসীর দল—। তাতেও জনতা খুশী হল। আরও জোরে জয়ধ্বনি দিল।

দু বৎসরের মধ্যেই আশি হাজার গবাদি পশুকে এই ভ্যাকসিন দেওয়া

হল। মৃত্যুহার শতকরা একটিতে নেমে গেল। এতদিনে জীবাণু-তত্ত্ব জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

৫৮ বৎসর বয়সে পাস্তুর রোগ প্রতিরোধ সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধ 'প্রিভেনটিভ ভ্যাকসিনেশন' প্রকাশ করলেন। ১৮৮০ সালে। কিন্তু এখনও তাঁর আসল কাজ বাকি।

সেই কাজ এইবার শুরু হল। পাগলা কুকুর কামড়ালে যে রোগ হয় তার নাম জলাতঙ্ক। পাগলা কুকুরের মুখ, যেন ভয়ে আতঙ্কে বীভৎস এক হিংস্র মুখ। চোখ দুটি লাল। দাঁত বার করা হাঁ করা মুখ। কশ বেয়ে লালা ঝরছে। এই কুকুর সামনে যাকে পায় তাকেই দংশন করে। বন্ধু শত্রু জ্ঞান থাকে না। যাকে কামড়ায় তারও এই রোগ হয়। তফাত এই, মানুষ মানুষকে কামড়ায় না। পিপাসায় তার ছাতি ফেটে যায়। কিন্তু এক ফোঁটা জলও সে গিলতে পারে না। চোয়াল এবং গলার মাংসপেশী কুঞ্চিত হয়ে নিদারুণ ব্যথায় তাই মানুষ অত কষ্ট পায় এবং যন্ত্রণা ভোগ করে।

পাস্তুরের ছেলেবেলার এক ঘটনা মনে পড়ে। একটা পাগলা নেকড়ে বেরিয়েছে। যাকে কাছে পেয়েছে তাকেই সে কামড়েছে। তখন সেই দংশনের কি সাংঘাতিক চিকিৎসা। যাকে কামড়েছে তার ঐ ক্ষত তপ্ত লোহা দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মনে পড়লে এখনও পাস্তুরের দেহ শিউরে ওঠে।

পাস্তুর এই পাগলা কুকুরের লালায় এই রোগের জীবাণু খুঁজলেন। এই লালা সংগ্রহ করাও এক সাংঘাতিক ব্যাপার। একটা ক্ষিপ্ত হিংস্র জন্তুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে হাতে পুরু চামড়ার দস্তানা পরে তার মুখ হাঁ করে রাখতে হত। একটা সরু কাঁচের নল ঐ কুকুরের মুখে ঢুকিয়ে নিজের মুখ ঐ নলে লাগিয়ে পাস্তুর ঐ ক্ষিপ্ত কুকুরের লালা টেনে নিতেন। তারপর ঐ বিষাক্ত লালার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হত।

এই বিষাক্ত লালা পাস্তুর সুস্থ এক কুকুরের মাথায় ইনজেকশন দিতেন। দু-সপ্তাহের মধ্যেই তার এই রোগ হত। তারপর যথাসময়ে তার মৃত্যু হলে মগজের যে অংশে এই জীবাণু বেশী ক্ষতি করেছে দেখা যেত, এই অংশ (মেডালা) বার করে গুলে এই রোগ প্রতিরোধের জন্য সুস্থ কুকুরকে ইনজেকশন দেওয়া হত।

এইভাবে ইনজেকশন দিয়ে পাস্তুর সুস্থ কুকুরকে একদিন ঐ রোগ প্রতিরোধ করাতে সমর্থ হলেন। কিন্তু মানুষকেও কি এই উপায়ে বাঁচানো যাবে?

মানুষের ওপর এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করবার কোনো সুযোগ পাস্তর পেলেন না। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোনো অপরাধী যদি রাজী হয় তাহলে অবশ্য পাস্তর তার ওপর পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কিন্তু ইওরোপের কোন রাজ্য পাস্তরের এ প্রস্তাবে রাজী হল না। পাস্তর ব্রেজিলের সম্রাটকে চিঠি লিখলেন। তাতেও কোন সুফল হল না।

অবশেষে একদিন ফ্রান্সেরই একটি স্ত্রীলোক তার নয় বৎসর বয়সের ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে পাস্তরের কাছে এল। ছেলেটির নাম জোসেফ মাইস্টার। স্কুলে যাবার পথে পাগলা এক কুকুর তাকে মাটিতে ফেলে দেহের চোদ্দ জায়গায় দংশন করেছে। ছেলেটা হয়ত মরেই যেত। কিন্তু কাছেই ইটের এক রাজমিস্ত্রী কোনোরকমে ঐ কুকুরটাকে মেরে তাড়িয়েছে।

পাস্তর ছেলেটির ক্ষত পরীক্ষা করলেন। তারপর সহকারীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সবাই ইনজেকশন দেবার পক্ষপাতী; শুধু প্রধান সহকারী এমিল রাউ ছাড়া। ইনজেকশন দেওয়াই যখন স্থির হল তখন রাউল হঠাৎ ল্যাবরেটরী ছেড়ে চলে গেলেন।

ইনজেকশন শুরু হল। পাগলা কুকুরের মগজের অংশের (মেডালা) তেজ ক্রমশঃ যত বাড়ানো হল পাস্তর ভয়ে তত বেশী কেঁপে উঠলেন। শেষে যখন এমন তেজস্কর ইনজেকশন দেওয়া হল যাতে সাতদিনের মধ্যেই দেহে এই রোগ সংক্রামিত হয়, তখন পাস্তর রাত্রে আর ঘুমুতে পারলেন না। তাঁর চোখের সামনে বারবার ছেলেটির ঐ ভীত আতঙ্কিত মুখখানি ভেসে উঠল। পাস্তর দেখলেন ঢোঁক গেলবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ছেলেটির মাংশপেশীতে কি নিদারুণ কুঞ্চন হচ্ছে। যন্ত্রণায় বেচারা কি সাংঘাতিক কষ্ট পাচ্ছে। পাস্তর উঠে বসলেন। দেখলেন, ভোর হতে তখনও অনেক দেরী। তাঁর মনে হল, এই রাত্রি কি আর শেষ হবে না?

অবশেষে ভোর হল। পাস্তরের মনে হল তিনি এখন বৃদ্ধ। পঙ্গু। অসুস্থ। রুগ্ন এই দেহে আর তার চেয়েও শ্রান্ত ক্লান্ত এবং উদ্বিগ্ন এই মনে ছেলেটির মৃত্যু বুঝি তিনি সইতে পারবেন না। তাই সেদিন ভোরে নিজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ল্যাবরেটরী ছেড়ে গ্রামে পালিয়ে গেলেন। আর জোসেফ মাইস্টারকে দিয়ে গেলেন তাঁর শিষ্য গ্রানচারের হাতে। পাস্তর প্রথমে গেলেন বারগাণ্ডি, তারপর আরবয়। কিন্তু কোথাও তিনি শান্তি

পেলেন না। কেবলি তাঁর মনে হতে লাগল, এই বুঝি টেলিগ্রাম আসে, ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে।

মাইস্টার এদিকে কিন্তু বেশ স্ফূর্তিতে দিন কাটাচ্ছে। গায়ের ক্ষত তার শুকিয়ে গেছে। ইনজেকশন নেওয়াও শেষ হয়েছে। সে এখন ল্যাবরেটরীতেই থাকে। আর ল্যাবরেটরীর পোষা জন্তু জানোয়ার নিয়ে খেলা করে। দেখতে দেখতে একটি মাস কেটে গেল। জোসেফের কোনো রোগ হল না। তারপর বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে এসে জোসেফ আবার এই ল্যাবরেটরীতে বেয়ারার এক কাজ নিল। পাস্তুরের প্রথম পরীক্ষা সফল হল।

কয়েক মাস পরে পাস্তুরের নিজের দেশে জুরাপাহাড়ে ছ'টি বাচ্চা রাখাল ছেলে ভেড়া চরিয়ে বেড়াচ্ছে এমন সময় হঠাৎ এক বিরাট পাগলা কুকুর তাদের তাড়া করল। ছেলেরা ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল এবং অনেকেই চেষ্টা করল পালাতে। এদের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় তার নাম জাঁ ব্যাপটিসতে জুপিলএ। বয়েস চোদ্দ বৎসর। সে কিন্তু পালাল না। চাবুক হাতে সে কুকুরটার দিকে এগুলো। প্রথমে সে চাইল কুকুরটাকে তাড়াতে। শেষে না পেরে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে চাবুক দিয়ে তার মুখ বাঁধল। তারপর কাঠের জুতো দিয়ে মাথায় মেরে কুকুরটাকে সে ঘায়েল করল। কিন্তু নিজে ঐ কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হল।

তুজন পশুচিকিৎসক মৃত কুকুরটাকে পরীক্ষা করে বললেন, ওটা পাগলা। ছেলেটিকে পাস্তুরের কাছে পাঠানো হল। কিন্তু পাস্তুর দেখলেন কামড় খাবার ছ' দিন পরে এই ছেলেটা এসেছে। অথচ জোসেফ মাইস্টার এসেছিল তিনদিনের মধ্যে। এর বেলায় তাঁর চিকিৎসায় কাজ হবে কি? তবু ইনজেকশন দেওয়া হল। ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠল।

পাস্তুর অনেকদিন পর্যন্ত এই ছেলেটির সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন। একটা চিঠিতে দেখা যায় পাস্তুর লিখছেন, তোমার হাতের লেখা অনেক ভাল হয়েছে। কিন্তু এত বানান ভুল কেন? তুমি কোন স্কুলে পড? কে তোমাকে শেখায়? বাড়িতে যে পরিমাণ কাজ করা উচিত তা তুমি কর কি? তুমি নিশ্চয় জান জোসেফ মাইস্টার যে প্রথম আমার কাছে এই ইনজেকশন নিয়েছিল সেও আমাকে চিঠি লেখে। আমার মনে হয়, সে তোমার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি উন্নতি দেখাচ্ছে। অথচ দেখ, সে তোমার চেয়ে কত ছোট। মাত্র দশ বছর তার বয়েস। কাজেই একটু কষ্ট সহ্য কর।

অন্ত ছেলেদের সঙ্গে বাজে গল্প করে সময় নষ্ট না করে তোমার শিক্ষকদের কথা শুনো। বাবা মার কথা শুনো।

তবু পাস্তরের শত্রুদের মুখ চাপা পড়ল না। বরং আক্রোশ যেন আরও বেড়ে গেল। অ্যাকাডেমি অফ মেডিসিন পাস্তরের নিন্দে করল। বলল, কাজটা পাস্তরের ঠিক হচ্ছে না। পাগলা কুকুরের বিষ খামোখা পাস্তর সুস্থ লোকের গায়ে ঢোকাচ্ছেন। কাগজে কাগজে তাই পাস্তরের নামে অনেক গালাগাল বেরুল।

কিন্তু দেশ বিদেশ থেকে পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রুগীরা পাস্তরের দরজায় এসে জড়ো হল। উনিশজন রাশিয়ান কৃষক পাগলা নেকড়ের কামড়ে মৃতপ্রায় হয়ে একদিন এসে পাস্তরের কাছে উপস্থিত হল এবং এই ইনজেকশন নিয়ে হাসি মুখে ষোলজন দেশে ফিরে গেল। জার হীরকখচিত এক স্মারক পাস্তরকে উপহার দিলেন এবং পাস্তর ইনষ্টিটিউট-এ মোটা টাকা চাঁদা দিলেন। পাস্তরের প্রবন্ধ 'হাইড্রোফোবিয়া' প্রকাশিত হল ১৮৮৫ সালে।

সুদূর আমেরিকা থেকে চারজন ছেলে এসে এই ইনজেকশন নিয়ে গেল। ইংলণ্ড থেকে এক কমিটি জোসেফ লিস্টারকে সঙ্গে নিয়ে এসে পাস্তরের কাজ দেখে খুশী হয়ে দেশে ফিরে গেল, ১৮৮৮ সালে।

এতদিন পরে পাস্তর তাঁর নিজের দেশে সম্মান পেলেন। খুব ঘটা করে তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসব পালন করা হল। ছাত্ররা, দেশ বিদেশ থেকে তাঁর ভক্তরা এবং ফরাসী দেশের অভিজাতরা সবাই তাঁর গুণ গান করল। ইংলণ্ড থেকে লর্ড লিস্টার এসে প্রকাশ্য সভায় তাকে জড়িয়ে ধরলেন। পাস্তর অভিভূত হয়ে গেলেন।

তিন বৎসর পরে তাঁর মৃত্যু হল। তেয়াত্তর বৎসর বয়সে। ১৮৯৫ সালে। পাস্তরের সন্ন্যাস রোগে পক্ষাঘাত হয় পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে। তারপর আরও আটাশ বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন। যে বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয় সেই বাড়িতে এখন ডিপথেরিয়া অ্যান্টিটক্সিন তৈরীর জন্য ঘোড়া রাখা হয়। আর পাগলা কুকুরের বিষ ইনঅকুলেশন করা কুকুর রাখা হয়।

প্যারিসে পাস্তর ইনষ্টিটিউটের ভিতর সুন্দর একটি গির্জায় পাস্তরের সমাধি নির্মিত হয়েছিল। দেয়ালে মার্বেলের গায়ে কবে কি গবেষণা পাস্তর করে গেছেন তাও লিপিবদ্ধ ছিল।

পাস্তুরের মৃত্যুর পর পঁয়তাল্লিশ বৎসর পার হয়েছে। তখন ১৯৪০ সাল। জার্মান সৈন্য প্যারিস দখল করেছে। সৈন্যরা এসে এই পাস্তুর ইনস্টিটিউটে ঢুকল। যে পাস্তুরের স্মৃতি দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ সম্মান করেছে তাই আজ হঠাৎ শত্রুর পায়ে অবমানিত হতে দেখে বৃদ্ধ দারোয়ান বাধা দিল। ফলে বন্দুকের গুলিতে তার মৃত্যু হল এবং ঐ স্মৃতিসৌধের দরজায় তার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল। এই বৃদ্ধ দারোয়ান, সেই জোসেফ মাইস্টার। নয় বৎসর বয়সে পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে পাস্তুরের হাতে যার জীবন রক্ষা হয়েছিল।

লর্ড লিস্টার

মাত্র একশ বছর আগেকার কথা। বিলেতের হাসপাতালে অপারেশনের আগে ক্লোরোফরম করবার রীতি সবে তখন চালু হয়েছে। সার্জনরা বড় বড় অপারেশন নির্ঝঞ্ঝাটে করবার সুযোগ পেয়েছেন। রুগীকে এখন আর টেবিলে বেঁধে রাখতে হয় না। জোর করে ধরে রাখতেও হয় না। অপারেশনের সময় রুগী এখন বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। কোন ব্যথা টের পায় না।

রুগীর এখন যা কিছু কষ্ট সব ঐ অপারেশনের পর। যখন জ্ঞান হয় তখন রুগী ছটফট করে। চীৎকার করে। যন্ত্রণায় কাতর হয়। কষ্ট আরও বেশী বাড়ে যখন ঐ ক্ষতে পুঁজ হয় এবং জ্বর আসে। তারপর একদিন যখন তার মৃত্যু হয়, তখন সব কষ্টের অবসান ঘটে।

অপারেশনের সময় রক্তপাত যেমন অনিবার্য, অপারেশনের পর সেই ক্ষতে পুঁজ হওয়াও তাই। দিনের পর দিন এই ক্ষত দিয়ে তখন পুঁজ ঝরত। ব্যাণ্ডেজ ভিজে যেত। বিছানা নষ্ট হত। দুর্গন্ধে ঘর ভরে যেত। তবু বলা হত, এই পুঁজ কল্যাণকর। প্রশংসনীয়। লড এবল্ পাস্। এ না হলে ঘা শুকোয় না।

সার্জিকাল সব কিছুর মানেই তখন নোংরা এবং দুর্গন্ধময়। সার্জনের অপারেশন কোট তখন সর্বদাই পুঁজ রক্ত ভরা। এই নোংরা কোট সার্জনরা কখনও পরিষ্কার করতেন না। এমন কি ছিঁড়ে না যাওয়া পর্যন্ত বদলাতেন না। বরং পরে বেশ গর্ব বোধ করতেন। কোটে এই নোংরা দাগ থেকে প্রমাণ হত কে কত বেশী অপারেশন করেছেন এবং কার অভিজ্ঞতা কত বেশী।

ষোল শতকে আঁব্রোজ পারী যখন প্যারিসের হোটেল দিউ হাসপাতালে কাজ শেখেন তখন যেমন রুগীর বিছানা এবং রুগীর ঘর নোংরা থাকত;

তিনশ বছর পরে উনিশ শতকের প্রথমেও ইউরোপের সব হাসপাতালে প্রায় ঐ একই অবস্থা। তখন একটি বিছানায় দুটি করে রুগী থাকত। একটির মৃত্যু হলে অপরটিকেও ঐ শবের সঙ্গে একই বিছানায় পড়ে থাকতে হত।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত হাসপাতালগুলি কি ছিল, র‍্যাডক্লিফ ইনফারমারীর পরিদর্শকের খাতায় সুপারিশের নমুনা থেকেই তা বোঝা যায়। দেখা যায় পরিদর্শকরা লিখছেন, রুগীদের বিছানার চাদর মাসে অন্তত একবার করে বদলানোর কড়া নিয়ম থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

ক্লোরোফরম চালু হওয়ার প্রথম যুগে অপারেশন যত বাড়তে লাগল, হাসপাতালে মৃত্যু সংখ্যাও ততই চড়তে লাগল। তাই অপারেশন বেশ ভালই হয়েছে, কিন্তু রুগী আর বেঁচে নেই এই পরিহাসের সৃষ্টি হল। (অপারেশন ওয়াজ সাকসেসফুল, বাট দি পেশেণ্ট ডায়েড)।

ক্লোরোফরমের প্রবর্তক স্যার জেমস ইয়ং সিমসন শেষ বয়সে এর প্রতিকার অনুসন্ধানের দিকে ঝুঁকলেন। হাসপাতালে অপারেশন হলেই কেন রুগীর মৃত্যু হয়, অথচ রুগীর বাড়িতে হলে হয় না, তার কারণ খুঁজতে শুরু করলেন। নিজের চেষ্টায় তিনি একা এডিনবরা, গ্লাসগো এবং লণ্ডনের সব হাসপাতালের মৃত্যু সংখ্যা জোগাড় করলেন। গ্রামে গ্রামে ডাক্তারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করলেন। দেখা গেল, হাসপাতালগুলিতে মৃত্যু হার শতকরা চল্লিশের ওপর। অথচ গ্রামে মাত্র এগার। সিমসন বুঝলেন এই মৃত্যুর জন্য দায়ী নিশ্চয়ই ঐ হাসপাতাল। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ সৈন্যের প্রাণনাশের যত বেশী আশঙ্কা, অপারেশন থিয়েটারে রুগীর মৃত্যু সম্ভাবনা তার চেয়েও অনেক গুণ বেশী।

এই মারাত্মক ব্যাধিকে তিনি বলতেন, হসপিটালইজম্। এই ব্যাধি সমূলে বিনষ্ট করার জন্য সিমসন বুদ্ধি দিলেন, বড় বড় সব হাসপাতাল ভেঙ্গে ফেলা হোক। লোহা দিয়ে তৈরী ছোট ছোট ঘরে রুগী রেখে কিছুদিন পর সেই ঘর আগুনে পুড়িয়ে অথবা ভেঙ্গে নতুন কোন এক স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। বহু লোক সিমসনের মত মেনে নিলেন এবং তাই নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হল।

সেই সময় লুই পাস্তুরের জীবাণুতত্ত্ব সার্জারীতে প্রয়োগ করে যিনি এই সাংঘাতিক ব্যাধি সমূলে ধ্বংস করবার সহজ এক উপায় আবিষ্কার করলেন, তাঁর নাম জোসেফ লিস্টার। (১৮২৭-১৯১২)।

জোসেফ লিস্টার ছিলেন কোএকার সম্প্রদায়ের লোক। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বহুদিন ইহুদীদের মত নির্যাতিত হয়েছে; তবু নিজেদের বিশ্বাস কখনও ছাড়েনি। এরা রাজার অথবা গির্জার নামে কোনো শপথ নেয় না। তাই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগও এরা পায় না। নিজেদের সম্প্রদায়ের স্কুলে এরা লেখাপড়া শেখে। পরে ব্যবসা করে জীবিকা অর্জন করে। পয়সা হলে দুঃখীদের জন্য সমাজহিতকর কাজে প্রবৃত্ত হয়। এরা নামের আগে মিস্টার কিংবা নামের পরে কোন পদবী ব্যবহার করে না। নিজেদের সম্প্রদায়ের বাইরে কেউ বিবাহ করে না। স্ত্রী-পুরুষ সবাই খুব সাদাসিধে

এক বিছানায় রুগীর সঙ্গে মৃতদেহ

পোশাক পরে এবং কোনো অলঙ্কার ব্যবহার করে না; আর পরস্পরকে বলে বন্ধু।

জোসেফ লিস্টারের বাবা ছিলেন লণ্ডন শহরের একজন মস্ত বড় সুরা ব্যবসায়ী। কিন্তু তাঁর শখ ছিল, মাইক্রোসকোপ নিয়ে পরীক্ষা করা। তখন মাইক্রোসকোপের লেনস আজকালকার মত এত বেশী উন্নত ও শক্তিশালী ছিল না। আলো ঠিকমত আসত না; তাই ঝাপসা দেখাত। জোসেফের বাবা সর্বপ্রথম আধুনিক অ্যাক্রোমাটিক লেনসের প্রবর্তন করেন। সেইজন্য তাঁকে রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত করা হয়; ১৮৩০ সালে।

জোসেফ লিস্টার বাপ মায়ের চতুর্থ সন্তান। লণ্ডনের কাছে এসেকস-এর আপটন গ্রামে তাঁর জন্ম; ৫ই এপ্রিল ১৮২৭ সালে। কোএকার সম্প্রদায়ের স্কুলে সতের বৎসর বয়সে লেখাপড়া শেষ করে তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে

ভরতি হন ; ১৮৪৪ সালে। এই বিশ্ববিস্তালয়ে সব ধর্ম এবং সব সমাজের ছাত্ররাই তখন ভরতি হবার সুযোগ পেত। ঠাট্টা করে তাই সবাই বলত এই কলেজে ভগবান নেই। এটা নাস্তিকের শিক্ষায়তন।

জোসেফ লিস্টার এই কলেজ থেকে বি এ পাশ করলেন। তারপব ডাক্তারীতে ভরতি হলেন, ১৮৪৭ সালে।

ডাক্তারী পডতে গিয়ে লিস্টার বুঝলেন, কেন এক যুগ আগে জন হাণ্টার বলে গেছেন, বই পড়ে কিছু হয় না। নিজের হাতে কাজ করা চাই। লিস্টারের প্রাণীবিস্তা, জীব-বিস্তার দিকে বরাবরই ঝোঁক ছিল। নিজের হাতে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ তিনি ছাডতেন না। এই কলেজ থেকে ১৮৫২ সালে তিনি ডাক্তারী ডিগ্রি পেলেন। তাঁকে ইংলণ্ডের এফ আর সি এস করা হল।

সবাই তখন বুদ্ধি দিলেন, প্র্যাকটিসে বসবার আগে লিস্টারের উচিত একবার কন্টিনেণ্টে যাওয়া। প্যাবিস তখনও ইওরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র। কেউ বললেন, প্যারিসে যেতে। কেউ বা যেতে বললেন, জার্মানীতে। কিন্তু লিস্টারেব শিক্ষক প্রফেসর শারপি বললেন, লিস্টারের যাওয়া উচিত এডিনববায়। জেমস সাইমের কাছে।

জেমস সাইম তখন এডিনবরা ইউনিভার্সিটিব ক্লিনিক্যাল সার্জারীব অধ্যাপক এবং সার্জারীর নেপোলিঅন নামে বিখ্যাত।

সাইম যেমন সার্জারীতে নেপোলিঅন নামে বিখ্যাত, তেমনি আবার সাংঘাতিক ঝগডাটে বলেও কুখ্যাত। রবার্ট লিস্টন ছিলেন তাঁর দূর সম্পর্কের এক ভাই। এক সঙ্গে ডাক্তারী পাশ করেন। এক সঙ্গে দুজনে ছাত্র পডাতেন। তারপর দুজনের মধ্যে এমন ঝগডা হল যে, দুজন দুজনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের নিয়ে দল পাকালেন। হাসপাতালের চাকরি নিয়ে একজন আর একজনের বিপক্ষে লাগলেন। রবার্ট লিস্টন যখন এডিনবরা ছেড়ে লণ্ডন হাসপাতালে কাজ নিযে চলে গেলেন, তখনই সাইম এডিনববায় লিস্টনের জায়গায় ক্লিনিকাল সার্জারীর অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। পনেরো বছর ধরে ঝগড়ার পর দুজনের আবার পরে ভাব হয়।

রবার্ট লিস্টন ছিলেন তখনকার দিনের সবচেয়ে দ্রুত সার্জন। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তাঁর অপারেশন শেষ হত। কিন্তু সাইম ছিলেন ধীর স্থির এবং সবচেয়ে পরিষ্কার সার্জন। হাত ভাল করে না ধুয়ে কখনও তিনি

অপারেশন করতেন না। তোয়ালে ধবধবে সাদা ছাড়া ব্যবহার করতেন না। রোগ নির্ণয়ে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাই সাইমের হাতে রুগীর যদি শুধু পায়ের পাতাটি মাত্র কাটা যেত, লিস্টনের হাতে সেখানে নির্ঘাত হাঁটু পর্যন্ত বাদ যেত। তবু লিস্টনের প্রতি সাইমের সাংঘাতিক ঈর্ষা ছিল। সাইমের বন্ধু ডাঃ ব্রাউন লিখে গেছেন, সাইম কখনও একটি কথা বেশী বলতেন না, এক ফোঁটা কালি, কি এক ফোঁটা রক্ত কখনও তিনি অযথা ফেলে নষ্ট করতেন না।

সাইমের আর একটি বড শত্রু ছিলেন, ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক জেমস ইয়ং সিমসন। সারাজীবন দুজনে দুজনের সঙ্গে ঝগডা করে গেছেন। এইজন্যই সিমসনের প্রবর্তিত ক্লোরোফরম অনেকদিন পর্যন্ত সাইম ব্যবহার করেননি।

সহকর্মীদের সঙ্গে ঝগডা বিবাদ, গালাগালি, কাগজে কাগজে নিজের নামে অথবা বেনামীতে পত্র ছাপানো এবং শেষে মানহানির মামলা করায় সাইম জীবনে কখনও ক্লান্তি বোধ করেননি।

এহেন জবরদস্ত সাংঘাতিক লোকের কাছে সার্জারী শিখতে ভয়ে ভয়ে লিস্টার এডিনবরায় এলেন। অথচ কি আশ্চর্য, প্রথম আলাপেই সাইম লিস্টারকে পছন্দ করে ফেললেন। লিস্টার নিজেও সাইমের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

লিস্টার মাত্র এক মাস থাকবেন বলে এডিনবরায় এসেছিলেন। কিন্তু যেই সাইম তাঁকে অপারেশনের সহকারী এবং হাউস সার্জনের কাজ দিতে রাজী হলেন,—অমনি লিস্টার সেই কাজ যেন লুফে নিলেন। পরে সাইমের রেসিডেণ্ট হাউস সার্জন যখন অন্য কাজ নিয়ে চলে গেলেন, তখন লিস্টার এই কাজ সামান্য কযেকদিন করবেন বলে ঠিক করে পুরো একটি বছর অনায়াসে সেখানে কাটিয়ে দিলেন। কারণ সাইম লিস্টারের সঙ্গে যে ব্যবহার করতেন তা যেন দুজন সমান সমান সার্জনের মত। অধ্যাপক এবং তার সহকারীর মত ঠিক নয়। লিস্টার যেন একজন স্বাধীন সার্জন ; আর সাইম শুধু তাঁর পরামর্শদাতা অভিজ্ঞ এক কনসালট্যাণ্ট। ছাত্ররা সাইমকে 'মাস্টার' এবং লিস্টারকে 'চীফ' বলে ডাকতে শুরু করল। এই ডাক নাম লিস্টারের সঙ্গে সারা জীবন যেন আঠার মত সেঁটে গেল।

লিস্টারের শুধু এই কাজটিই যে খুব ভাল লাগত তা কিন্তু নয়। লিস্টার যখন মিলব্যাঙ্কে সাইমের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন তখনও তাঁর খুব ভাল

লাগত। মনে হত এ যেন তাঁর নিজেরই বাড়ি ; এ যেন ঠিক সেই এসেকসের আপটন হাউস ; ছেলেবেলা থেকে যেখানে তিনি মানুষ হয়েছেন।

কিছু দিন পরে লিস্টার বুঝলেন, কেন এই বাড়িতে তাঁর মনটি সর্বক্ষণ এমন করে পড়ে থাকে। কিসের টানে তিনি ফাঁক পেলেই এখানে ছুটে আসেন। লিস্টার বুঝলেন, এই বাড়ির আসল টান, সাইমের বড় মেয়ে অ্যাগনেস। লিস্টার মুখচোরা লাজুক মানুষ। কলেজে অন্য সব ছেলেদের মত চট করে মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাতে কোনদিন তিনি পারেননি। কিন্তু এই বাড়িতে পা দিয়েই তাঁর মনে হয়েছে, অ্যাগনেস তাঁর বন্ধু। নিঃসঙ্কোচে অ্যাগনেসের সঙ্গে তিনি আলাপ করেছেন। এক সঙ্গে বেড়িয়েছেন। মনের কথা খুলে বলেছেন। হাসি ঠাট্টা করেছেন।

অবশেষে একদিন যখন লিস্টারের এডিনবরা ছাড়বার দিন ঘনিয়ে এল, তখন এডিনবরার রয়াল ইনফারমারীর অ্যাসিসট্যাণ্ট সার্জনের কাজটি হঠাৎ খালি হল। সাইমের সঙ্গে পরামর্শ করে লিস্টার এই কাজের জন্য দরখাস্ত করলেন। একাজ পেলে তাঁর কি সুবিধা তাই নিয়ে দশ পাতা চিঠি লিখে তিনি বাবাকে বোঝালেন। কিন্তু কোথাও অ্যাগনেস সাইমের নাম পর্যন্ত উল্লেখ থাকল না। পরে যখন তিনি এই চাকরি পেলেন তখন কয়েকদিনের জন্য প্যারিসে এক অপারেশন দেখতে গিয়ে বুঝলেন অ্যাগনেসকে তিনি কত ভালবাসেন। এখানে অ্যাগনেস নেই, তাই কিছুই তাঁর ভাল লাগে না। এডিনবরা ফিরে তাই তিনি আর দেরি না করে সাইমের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে অ্যাগনেসের কাছে একদিন বিয়ের প্রস্তাব করে বসলেন।

অ্যাগনেস সাইমও এই মুহূর্তটির জন্যই যেন বসে ছিলেন। তক্ষুণি তিনি রাজী হয়ে গেলেন। অ্যাগনেসের মনে শুধু একটুখানি খুঁত থেকে গেল। লিস্টার কোএকার সম্প্রদায়ের লোক। লিস্টারের আত্মীয়স্বজন এ বিয়েতে কখনও খুশি হবেন না কিংবা হয়ত মনে খুব দুঃখ পাবেন।

লিস্টারের বাবা খুশি হননি ঠিক। কিন্তু বাধাও কিছু দেননি। কোএকারের আদর্শমত ছেলের স্বাধীন মত তিনি উদারতার সঙ্গেই মেনে নিয়েছেন।

পরের বৎসর বসন্তকালে লিস্টারের সঙ্গে অ্যাগনেসের বিয়ে হয়ে গেল। ১৮৫৬ সালে। বিয়ের পরে দুজনে মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে চার মাসের জন্যে ইওরোপ ঘুরে বেড়ালেন। লিস্টারের এই হনিমুন মানে ইওরোপের বড় বড়

সব চিকিৎসা কেন্দ্র দেখা ; আর চিকিৎসকদের সঙ্গে আলাপ করা। তাইতেই অ্যাগনেসের কী উৎসাহ। কী অদ্ভুত আনন্দ। লিস্টারের কাজে মেতে অ্যাগনেস যেন লিস্টারের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। অক্টোবর মাসে এডিনবরায় ফিরে সাইমের বাড়ির কাছে রাটল্যাণ্ড স্ট্রীটে একটা বাসা নিয়ে দুজনে ঘর-সংসার পাতলেন।

লিস্টারের এখন কাজ সাইমের হাসপাতালের সব রুগী দেখা। অপারেশন করা। ছাত্রদের শেখানো। তারপর ইনফারমারীর সার্জনের কাজ। এত কাজের পরেও লিস্টার বাড়িতে এসে মাইক্রোসকোপ নিয়ে বসতেন।

আঠারো শতকে প্যারিসের হোটেল দিউ হাসপাতাল

ব্যাঙ-এর ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। আর অ্যাগনেসের কাজ লিস্টারের সাহায্য করা। নোট রাখা। বক্তৃতার খসড়া তৈরী করা।

সাত বৎসর সাইমের সহকারী হিসেবে কাজ করবার পর লিস্টার গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির সার্জারীর রিজিআস প্রফেসর নিযুক্ত হলেন, ১৮৬০ সালে।

এইখানে এসে লিস্টার দেখলেন, হাসপাতালটি যদিও নতুন, কিন্তু একেবারে কবরখানার ওপর। কমপক্ষে পাঁচ হাজার মৃতদেহ সেখানে কবর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এই সার্জিকাল ওয়ার্ড জ্বরের ওয়ার্ডের গা-ঘেঁষা। তাই কি মৃত্যুহার এত বেশী ?

লিস্টার যখন এডিনবরায় সাইমের সঙ্গে অপারেশন করতেন তখন দশটি রুগীর অ্যামপুটেশন (পা কাটা) হলে মাত্র দুটির হয়ত মৃত্যু হত। কিন্তু

এখানে দেখলেন, দশটির মধ্যে আটটিরই মৃত্যু হয়। হাসপাতালের যাঁরা কর্তা, তাঁরা ভাবতেন গরীব দুঃখীরা এমনিতেই নোংরা। কাজেই হাসপাতালে এলেই তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে সেই বা কেমন কথা? মিছিমিছি শুধু খরচ বাড়ানো। লিস্টারকে তাই প্রথমেই বলে দেওয়া হল, যেন বাজে খরচ না বাড়ে।

লিস্টার বুঝলেন, বাজে খরচ মানে ঐ সাবান তোয়ালের খরচ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার খরচ।

লিস্টার নিজে খুঁতখুঁতে লোক। তখনকার দিনের সার্জনদের মত নোংরা কোট পরে অপারেশন তিনি করতেন না। পরিষ্কার যন্ত্রপাতি ছাড়া ব্যবহার করতেন না। সাইমের মত পরিষ্কার ধোয়া তোয়ালে সর্বদা তিনি ব্যবহার করতেন এবং সাবান দিয়ে অপারেশনের আগে হাত ধুতেন।

এইখানে এসে কর্তাদের বরাদ্দ মত সাবান তোয়ালে দিয়েই তাঁকে কাজ শুরু করতে হল।

তখনকার দিনে হাসপাতালে অপারেশন হলে অথবা দেহের কোথাও কোন ক্ষত হলে সেই ক্ষত দূষিত হত। পুঁজ হত। জ্বর হত। শেষে মৃত্যু হত। তাই সিমসন বলতেন, এটা হাসপাতালের রোগ। হসপিটালইজম।

লিস্টার দেখতেন, পায়ের হাড় ভেঙে রুগী হাসপাতালে ভরতি হলে যার ভাঙা হাড় চামড়া ফুঁড়ে বেরোয়নি সে বেশ ভাল হয়ে হেঁটে একদিন বাড়ি যেত। কিন্তু যে দুর্ভাগার সামান্য একটু ভাঙা হাড় চামড়া ফুঁড়ে বেরুত (কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার) তার ক্ষত দূষিত হত। শেষে একদিন পা কেটে বাদ দিতে হত। কি করে এই সামান্য ক্ষত এত মারাত্মক হয় লিস্টার তা ভেবে পেতেন না।

বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে লিস্টার বলতেন, মৃত্যু নিশ্চয়ই ঐ ফুটো চামড়া দিয়ে দেহে প্রবেশ করে। ক্ষত দূষিত হয়। না হলে যেখানে দেহের ওপর কোন ক্ষত নেই সেখানে পাঁজরার হাড় ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেলেও তো কই এরকম কখনও হয় না?

অ্যাগনেস লিস্টারকে সান্ত্বনা দিতেন। বলতেন, আমি জানি তুমিই একদিন এর কারণ খুঁজে বার করবে। এখন খাবে চল। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ভিয়েনাতে তখন ইগনাজ ফিলিপ সেমেলভিস প্রভৃতিদের পরীক্ষা করবার

আগে হাত ধুয়ে লোশনে ডুবিয়ে প্রসবজনিত জ্বরের মৃত্যুহার কমিয়ে তাঁর ওপরওয়ালা চিকিৎসকদের বিরাগভাজন হয়েছেন এবং চাকরি ছেড়ে বুডাপেস্টে চলে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত বই 'প্রসবজনিত জ্বরের কারণ এবং প্রতিকার' প্রকাশিত হয়েছে; জার্মান ভাষায় ১৮৬১ সালে। কিন্তু লিস্টার তা পড়েননি। অ্যাগনেসকে নিয়ে তিনি যখন ভিয়েনায় যান তখনও কেউ সেমেলভিসের নাম তাঁর কাছে করেনি। এমনকি, সেমেলভিসের নিজের দেশ বুডাপেস্টে গিয়েও লিস্টার তাঁর নাম শোনেননি।

সেই সময় একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরবার পথে রসায়নের অধ্যাপক টমাস অ্যানডারসন লিস্টারকে বললেন, লুই পাস্তুর প্যারিসের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিতে কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। বলেছেন, জীবাণুরাই উদ্ভিদ এবং জীবে পচন ঘটায়। অ্যাকাডেমির জার্নালে সব প্রবন্ধ বেরিয়েছে; ফরাসী ভাষায়। রাত্রে ডিনারের পর পড়ে দেখবেন। হয়ত আপনার কাজে লাগবে।

তখন ১৮৬৪ সাল। গ্লাসগোতে লিস্টার চার বছর কাজ করেছেন। তিনি যতটুকু ফরাসী ভাষা জানতেন, তাতেই দেখলেন পাস্তুরের প্রবন্ধ বেশ বোঝা যায়। পড়তে পড়তে লিস্টার তন্ময় হয়ে গেলেন। ডিনারের আগে এ লেখা হাতে পড়লে কারু সাধ্য ছিল না তাঁকে পড়া ছেড়ে খেতে নিয়ে যায়। এমনকি তাঁর স্ত্রী অ্যাগনেসেরও না।

লিস্টার দেখলেন, এই দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে কাজ করে ক্ষতে পুঁজ হওয়ার যে কারণ তিনি ভেবে ভেবে কখনও নির্ণয় করতে পারেননি পাস্তুর তা বার করেছেন। কত সহজে। সামান্য কয়েকটা ফ্লাস্কে মাংসের স্যুপ রেখে। নিজে ডাক্তারী না জেনে।

রক্ত যখন পচে তখনই পুঁজ হয়। ক্ষতে জীবাণু প্রবেশ করে বলেই ক্ষত দূষিত হয়। পেকে ওঠে, পুঁজ হয়। তাহলে এই জীবাণু কি করে বিনষ্ট করা যায়?

আগুনে পোড়ালে জীবাণু অবশ্য ধ্বংস হয়। কিন্তু ক্ষতে তপ্ত তেল দিলে কি ক্ষতি হয় ষোল শতকে আঁব্রোজ পারী তা দেখিয়েছেন। তাহলে?

এমন কোন জিনিস কি নেই যা জীবাণু ধ্বংস করে অথচ ক্ষতের কোন অনিষ্ট করে না?

লিস্টার প্রথমে জিনক ক্লোরাইড তারপর জিনক সালফাইট ব্যবহার করে দেখলেন। কোন সুবিধে হল না।

তখন কারলাইল শহরে নর্দমার দুর্গন্ধ দূর করার জন্য খুব কড়া বাদামী রং-এর ঘন এক তরল জিনিস ব্যবহার করা হত। তার নাম ছিল জার্মান ক্রিওজোট। এই জিনিসের উগ্র গন্ধে যেমন দুর্গন্ধ দূর হত তেমনি কীট পতঙ্গও বিনষ্ট হত। যে পাম্পিং স্টেশনে নর্দমার জলের সঙ্গে এই ক্রিওজোট মেশান হত সেখানে একদিন লিস্টার নিজে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং এই ক্রিওজোটের কিছু নমুনা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

লিস্টার এই জিনিস জলে গুলে কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচারে লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন স্থির করলেন। ভাবলেন, পাস্তরের ছিপি আঁটা ফ্লাস্কে সেদ্ধ মাংস যেমন পচে না; তেমনি হাসপাতালে রুগীর ভাঙা হাড় চামড়া ফুটো করে না বেরুলে পচে না। কাজেই ফুটো চামড়ার ওপর এই ক্রিওজোট লাগিয়ে যদি ভাঙা হাড়ের পচন বন্ধ করা যায় তাহলেই তাঁর থিওরি প্রমাণ হবে এবং জীবাণুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হবে।

তখন ১৮৬৫ সাল, মার্চ মাস। হাসপাতালে চামড়া ফুটো করা হাড় ভাঙা এক মৃতপ্রায় রুগীর ওপব লিস্টার এই অষুধ প্রয়োগ করলেন।

লিস্টার নতুন এক তথ্য আবিষ্কার করেছেন তাই অ্যাগনেস খুব খুশি। রোজ যখন লিস্টার বাড়ি ফেরেন, অ্যাগনেস তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, রুগীর অবস্থা কি রকম। অষুধে কি কাজ হল।

একদিন লিস্টার যখন হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন, অ্যাগনেস লিস্টারের মুখ দেখে কিছুই আর জানতে চাইলেন না। শুধু ছুটে গিয়ে লিস্টারের কোট আর টুপি খুলে লিস্টারকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, বুঝেচি ও বেচারা আর বাঁচল না। কিন্তু তুমি আর কী-ই বা করতে বল? চেষ্টার কোন ত্রুটিই তো তুমি করনি।

কিছুদিন পরে ম্যানচেস্টারের এক ওষুধের কারখানা এই জার্মান ক্রিওজোট পরিশ্রুত করে কারবালিক অ্যাসিড নামে বাজারে ছাড়ল। লিস্টার এই কারবলিক নিয়ে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় নাবলেন। প্রথম বিফলতার পাঁচ মাস পর। ১২ই আগস্ট, ১৮৬৫ সালে। তখন প্রসব-জনিত জ্বরের কারণ ও প্রতিরোধের আবিষ্কর্তা অখ্যাত লাঞ্ছিত ইগনাজ ফিলিপ সেমেলভিস

ভিয়েনার পাগলা গারদে বন্দী। আঙুলের ক্ষত দূষিত হয়ে মৃত্যুজ্বরে তখন তিনি উন্মাদ।

সেইদিন বারো বছরের একটি ছেলে পা ভেঙে হাসপাতালে এল। বাঁ পায়ের দুটি হাড়ই তার ভাঙা। ভাঙা হাড় যদিও চামড়া ফুড়ে বার হয়নি তবু ঐ ভাঙা জায়গার কাছেই বেশ বড় একটি ক্ষত। চামড়া মাংস সব ছিঁড়ে ঐ ক্ষত হয়েছে। হাসপাতালে এসে আগে এই ক্ষতও দূষিত হত। পূঁজ হত। শেষে হাড় পর্যন্ত পৌছে বিপত্তি ঘটাত। পা কেটেও অনেক সময় রুগীর প্রাণ বাঁচানো যেত না।

লিস্টার কারবলিকে ভেজানো বড এক টুকরো তুলোট কাপড় (লিণ্ট) দিয়ে ঐ ক্ষত ঢেকে দিলেন। ক্ষতের বাইরে এই কাপড় বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বসল। তারপর তুলো চাপা দিয়ে ভাঙা পা কাঠের তক্তা (স্প্লিণ্ট) দিয়ে বেঁধে দিলেন।

তিন দিন চলে গেল। কোন বিপত্তি ঘটল না। সাধারণত সব রুগীই প্রথম তিন দিন ভাল থাকে। ক্ষত দূষিত হলে চতুর্থ দিনে জ্বর হয়। ব্যথা বাড়ে। পূঁজ হয়।

চতুর্থ দিনে লিস্টার রুগীর খাটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। অনুসন্ধানী দৃষ্টি হেনে ছেলেটার চোখ মুখ দেখলেন। নাড়ী টিপে জিভ দেখলেন। সবই স্বাভাবিক বলে মনে হল। জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কেমন আছ জেইমি ?

জেইমি উত্তর দিল, পায়ে বড্ড ব্যথা। ঘা যখন শুকোয় তখন তো ব্যথা হবেই, তাই না ?

লিস্টারের বুকের স্পন্দন যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে কি এবারেও এই পরীক্ষা নিষ্ফল হল ? এবারেও কি ক্ষতে জীবাণু ঢুকে রক্ত দূষিত করল ? কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব ? ছেলেটার মুখ চোখে তো অসুখের কোন লক্ষণ ফুটে ওঠেনি। খাওয়া-দাওয়াও ভালই করেছে। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক। জিভ পরিষ্কার। তাহলে ?

ধীরে ধীরে লিস্টার ক্ষতের ব্যাণ্ডেজ খুললেন। তুলো ওঠালেন। পূঁজের দুর্গন্ধ তো কৈ নাকে এলো না ? ব্যাণ্ডেজও বেশ শুকনো। লিস্টার সেই কারবলিক লাগানো তুলোট কাপড় (লিণ্ট) এইবার টেনে তুললেন। কি আশ্চর্য, এক ফোঁটা পূঁজ নেই, দুর্গন্ধ নেই। পরিষ্কার শুকনো ক্ষত। তাহলে ছেলেটা ব্যথা পাচ্ছে কেন ?

লিস্টার দেখলেন, ক্ষতের চারিদিকের চামড়া লাল হয়ে উঠেছে। আগুনে ঝলসে গেলে ঠিক যেমন হয়।

লিস্টার বুঝলেন, কারবলিক ভেজানো লিণ্ট ছেলেটার নরম চামড়ায় লেগে ওপরের পর্দা পুড়িয়ে ফেলেছে। তাই ওর ব্যথা হয়েছে। তাহলে উপায়? কি দিয়ে তিনি এখন ড্রেস করবেন?

ছেলেটা এতক্ষণ একবার নিজের পায়ের ক্ষত আর একবার লিস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। লিস্টারকে চিন্তামগ্ন দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ঘাটা খুব কি খারাপ হয়েছে? আপনি কি পা-টা কেটে ফেলবেন? না না পা-টা কাটবেন না ডাক্তারবাবু।

লিস্টার চমকে উঠলেন। ছেলেটার ঐ ভয়াতুর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কোন ভয় নেই। পা তোমার খুব ভাল আছে জেইমি। কিন্তু ওষুধটা খুব কড়া কিনা তাই চামড়া একটু জ্বলে গেছে। এবার থেকে ওষুধটা কম করে দেব। পাতলা করে দেব। তাহলেই দেখবে আর জ্বালা করবে না।

ছেলেটা কেঁদে ফেলল। দু-চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। বলল, না না, ওষুধ আপনি কমাবেন না। আমি বেশ সইতে পারব। ওষুধ বরং আরও একটু কড়া করে দিন। আমি তাড়াতাড়ি সেরে উঠি। আমার পা-টাকে যে বাঁচাতেই হবে বাবা! পা না থাকলে আমাকে কাজ দেবে কে? আর কাজ না পেলে আমার মা আর ছোট বাচ্চা ভাইটা খাবে কি?

লিস্টার ছেলেটির মাথায় হাত দিলেন। এলোমেলো লম্বা লম্বা চুল নাড়িয়ে বলিলেন, কিচ্ছু ভেবো না বাবা। পা তোমার ঠিক থাকবে।

ক্রমে এই ছেলেটি সেরে উঠল। মাত্র দেড় মাস হাসপাতালে থেকে একদিন সুস্থ হয়ে হেঁটে বাড়ি গেল। লিস্টারের পরীক্ষা সফল হল। অ্যাগনেস উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আমি জানতাম তোমার চেষ্টা সফল হবে। হাসপাতালের এই সাংঘাতিক ব্যাধি তুমিই একদিন দূর করতে পারবে। কিন্তু কখনও ভাবিনি, এত তাড়াতাড়ি তা সম্ভব হবে।

লিস্টারের মনে জোর এল। তিনি নতুন উদ্যমে এই জীবাণু ধ্বংসের রীতি অপারেশনে প্রয়োগ করলেন। দেখতে দেখতে মৃত্যু হার কমে গেল। পূতিগন্ধময় সার্জিকাল ওয়ার্ড জীবাণুধ্বংসক কারবালিকের উগ্র গন্ধে ভরে

উঠল। এতদিনে সিমসনের হসপিটালইজম ব্যাধি সমূলে বিনষ্ট হল। তাই হাসপাতালগুলি ভেঙে নতুন করে লোহার ঘর তৈরি করবার আর কোন দরকার থাকল না।

জীবাণুধ্বংসক কারবলিকের সাহায্যে লিস্টার কম্পাউণ্ড ফ্রাকচার পা কেটে বাদ না দিয়ে এখন সারাতে পারেন। ক্ষত এখন আর দুষ্ট হয়ে পেকে ওঠে না। অপারেশনের পরে ক্ষতে পুঁজ হয় না। জ্বর হয়ে রুগীর মৃত্যু হয় না। সাহস করে তাই তিনি হাঁটুর জয়েন্টের (সন্ধি) অপারেশন পর্যন্ত করতে পারেন।

দু বৎসর ধরে এই জীবাণুধ্বংসক প্রথা প্রবর্তন করে যে তথ্য তিনি সংগ্রহ করলেন, তা এখন প্রকাশ করার সময় এল। প্রথমে লিস্টার ভেবেছিলেন, গোটাকয়েক প্রবন্ধ লিখবেন। পরে তথ্য যত বাড়তে লাগল, মনে হল, এই নিয়ে বড় একটা বই লেখা উচিত। ভাগ্যিস তিনি এই বই লেখার দিকে ঝোঁকেন নি, তাহলে হয়ত কোন লেখাই তাঁর আর হত না।

সার্জারীতে জীবাণুধ্বংসক রীতি নিয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ ল্যানসেট কাগজে বেরুল মার্চ মাসে, ১৮৬৭ সালে। তাঁর অভিজ্ঞতা তিনি প্রকাশ করলেন। ধারাবাহিকভাবে। জুলাই মাস পর্যন্ত।

এইসব প্রবন্ধ তৈরি করতে তাঁর স্ত্রী অ্যাগনেসকে তখন দিনরাত খাটতে হত। রোজ আট দশ ঘণ্টা।

এই প্রবন্ধ পড়ে অ্যাগনেসের বাবা জেমস সাইম লিখলেন, এবার ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভা ডাবলিনে বসবে। লিস্টার যেন তার আবিষ্কার তখন সভায় উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দিয়ে বোঝান।

লিস্টার রাজী হলেন। কিন্তু অ্যাগনেস জানেন, লিস্টারের বক্তৃতা মানেই অ্যাগনেসের প্রাণান্ত। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লিস্টার কাটাকুটি করবেন এবং নিজের বক্তব্য গুছিয়ে কখনও বলতে পারবেন না।

যাই হোক, লিস্টার অবশেষে বক্তৃতা দিলেন। সার্জারীতে কি করে তিনি জীবাণুধ্বংসক প্রথা প্রবর্তন করেছেন এবং তার কি সুফল পেয়েছেন সব বিশদভাবে আলোচনা করলেন কিন্তু সভ্যরা অর্থাৎ নাম করা সব চিকিৎসকরা খুশী হলেন না। সবচেয়ে বেশী যিনি চটলেন, তিনি সাইমের চিরশত্রু স্যার জেমস ইয়ং সিমসন। তিনিই আবার ক্লোরোফরমের প্রবর্তক এবং হসপিটালইজম ব্যাধির আবিষ্কারক।

নভেম্বর মাসের ল্যানসেটে মস্ত বড় এক প্রবন্ধ সিমসনের নামে প্রকাশিত

হল। তাতে তিনি বললেন, সার্জারীতে কারবলিক ব্যবহার এমন কিছু নতুন জিনিস নয়। লিস্টারের অনেক আগে প্যারিসে ডাঃ লেমায়ার তা ব্যবহার করেছেন। জার্মান, স্প্যানিশ এবং অন্য ফ্রেঞ্চ সার্জনরাও করেছেন। কাজেই লিস্টার নতুন কিছু আবিষ্কার করেন নি।

লিস্টার লেমায়ার-এর নাম জীবনে কখনও শোনেন নি। ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে অনেক খুঁজেও তাঁর কোনো বই তিনি পেলেন না। তবু তিনি তক্ষুনি ল্যানসেটের সম্পাদকের নামে চিঠি লিখে জানালেন যে, কারবলিক তিনি প্রথম ব্যবহার করেছেন এমন কথা কখনও বলেন নি। আসল কথা জীবাণু। তাঁর মতে জীবাণু ধ্বংসকারী কোন ওষুধ ক্ষতে ব্যবহার করা উচিত। এইটাই তাঁর প্রধান বক্তব্য।

ব্যক্তিগত ঝগড়া লিস্টার ঘৃণা করতেন। তাঁকে কেউ গাল মন্দ দিলে তিনি সিমসন অথবা তাঁর শ্বশুর সাইমের মত উল্টে গালাগাল দিতেন না। শুধু থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস অথবা আঃ ছাড়া কোন কঠিন শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরুত না।

সার্জারীতে জীবাণুতত্ত্ব একবার প্রতিষ্ঠিত করে লিস্টার আর একটি কঠিন সমস্যায় মন দিলেন। সেই সমস্যা ধমনী বেঁধে রক্তপাত বন্ধ করা। আম্ব্রোজ পারী সর্বপ্রথম ধমনীতে সুতো বেঁধে রক্তপাত বন্ধ করেন। কিন্তু দেখা যেত, যেখানে এই সুতো বাঁধা হয় প্রায়ই সেখানে ফোঁড়া হয়। পুঁজ হয়। লিস্টারের বিশ্বাস, এই সুতোর ফাঁকে জীবাণু থাকে। তাই পুঁজ হয়।

লিস্টার ভাবলেন, সুতো ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কি ঐ ধমনী বাঁধা যায় না? ক্যাটগাট অর্থাৎ ভেড়ার অন্ত্র (ইনটেসটাইন) টানলে লম্বা হয়, অথচ বেশ শক্ত। দেহে বেশীদিন থাকলে অনায়াসে শেষে হজম হয়ে যায়। এই অন্ত্র যদি কারবলিকে ভিজিয়ে জীবাণুশূন্য করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই এ থেকে আর ফোঁড়া হবে না। পুঁজ হবে না। ইনফেকশন হবে না।

বড়দিনের ছুটিতে লিস্টার নিজের বাড়ি আপটনে এলেন, ১৮৬৮ সালে। এইখানে এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার জন্য ভেড়ার অন্ত্র এনে কারবলিকে ডুবিয়ে রাখলেন। কয়েকদিন পর ক্লোরোফরম করে বাড়ির এক বাছুরের গলার ধমনী কেটে ঐ ক্যাটগাট দিয়ে তিনি বেঁধে দিলেন। জানুয়ারী মাসে এই বাছুরটিকে যখন বধ করা হল, বাছুরের গলার ঐ অংশ লিস্টারের কাছে গ্লাসগোতে পাঠানো হল। লিস্টার ব্যবচ্ছেদ করে দেখলেন, ঐ ক্যাটগাট

হজম হয়ে গেছে। কিন্তু ধমনীর বাঁধন তেমনি অটুট আছে। ক্যাটগাটের গ্রন্থির জায়গায় নতুন গজানো টিশু (কলা) হয়েছে।

লিস্টার তাঁর বাবাকে লিখলেন, আমি আজকাল যখন অপারেশন করি, তখন আর আগের মত মনে আতঙ্ক ও ভয় থাকে না। এখন সার্জারী অন্য এক জিনিস হয়েছে।

বৃদ্ধ লিস্টার ছেলের চিঠির জন্য রোজ পথ চেয়ে বসে থাকতেন। আগে প্রতি সপ্তাহে একখানা করে আসত। এখন আসে না। লিস্টারের সব চিঠি তিনি যত্ন করে বাক্সে রেখেছেন। সেই চিঠি মাঝে মাঝে তিনি এখন খুলে পড়েন।

এডিনবরায় সাইম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ১৮৭০ সালে। লিস্টার গ্লাসগো ছেড়ে এডিনবরা এলেন এবং সার্জারীর প্রফেসর নিযুক্ত হলেন।

সেই সময় জন টিনডাল নামে এক বিজ্ঞানী ঘরে আলোর রশ্মি ফেলে দেখালেন, ঘরের বাতাস সর্বদা ধুলোয় ভরা থাকে। খালি চোখে যা দেখা যায় না আলোর রশ্মিতে তা সুস্পষ্ট হয়। লিস্টার বিশ্বাস করতেন, ধুলোয় জীবাণু থাকে। ঘরের বাতাস যখন ধুলোয় ভরা, তখন নিশ্চয়ই জীবাণু ভরা। কাজেই অপারেশনের সময় অথবা ক্ষতের ব্যাণ্ডেজ বদলাবার সময় ঐ জীবাণু ক্ষতে প্রবেশ করতে পারে। তাহলে এই জীবাণু ধ্বংস করা যায় কি করে?

লিস্টার ভেবে ভেবে তারও এক উপায় বার করলেন। কারবলিক লোশনে জীবাণু ধ্বংস হয়। এই লোশন স্প্রে করে ঘরের বাতাস শোধন করে নিলে কেমন হয়? লিস্টারের মনে হল, এই ব্যবস্থাই ভাল। অমনি রুগীর ঘরে এবং অপারেশন থিয়েটারে কারবলিক লোশন স্প্রে করে হাওয়াতে ছড়ানো শুরু হল। রুগী, সার্জন, সহকারী এবং নার্সদের তাতে যে কি প্রাণান্ত হল লিস্টার তা বুঝলেন না।

লিস্টার প্রথমে নিজেই বাঁ হাতে রবার বাল্ব টিপে ফস-ফস করে কারবলিক স্প্রে করতেন, আর ডান হাত দিয়ে রুগীর ক্ষতের ব্যাণ্ডেজ খুলতেন। তাতে সুবিধা হয় না দেখে স্প্রে করবার ভার ড্রেসারের ওপর দিলেন।

রুগীর বিছানার পাশে ছোট একটি টুলে লিস্টার নিজে বসতেন। আর তার হাঁটুর কাছে ড্রেসার ঐ স্প্রে বসিয়ে ফস-ফস করে কারবলিক লোশন স্প্রে করত। তখনও ছাত্ররা, নার্সরা, অথবা বিদেশী পরিদর্শকরা লিস্টারের চারিদিকে ঘিরে থাকত। লিস্টার ব্যাণ্ডেজ খুলে তুলো লিন্ট তুলে সবাইকে

দেখাতেন। সবাই দেখত, ক্ষত পরিষ্কার। তুলোট কাপড়ে কোন দুর্গন্ধ নেই। লিস্টার বোঝাতেন, কি করে তিনি এই ক্ষত জীবাণুশূন্য করেছেন। ড্রেসার ওদিকে সমানে ফস-ফস করে স্প্রে করত। কারবলিকের বাষ্পে ঘর কুয়াশায় ভরে যেত। উগ্র গন্ধে সবার নাক মুখ চোখ জ্বালা করত। কাশি আসত। পাম্প করে করে ড্রেসারের হাতও অবশ হয়ে যেত।

শেষে হাত পাম্প-এর বদলে লিস্টার পা দিয়ে পাম্প করবার যন্ত্র চালু করলেন। তাতেও যখন অসুবিধা হল, তখন তিনি অদ্ভুত এক যন্ত্র তৈরি করলেন। তার নাম হল, গাধা-এঞ্জিন (ডংকি এঞ্জিন)। একটা কাঠের তেপায়া, কাঁচের বোতল, সরু ছুঁচলো টিউব আর একটা হাত-পাম্প। রুগীর বিছানার পাশে দাঁড় করালে ঠিক যেন গাধার মত দেখতে। এই যন্ত্র লিস্টারের গাড়ির পেছনে বাঁধা থাকত। দূর থেকে মনে হত, লিস্টার যেন একটা গাধা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন।

লিস্টার যেখানে অপারেশনে যেতেন এই গাধা-যন্ত্রটিও তাঁর সঙ্গে যেত। তখন মহারানী ভিক্টোরিয়ার বাহুতে একবার তাঁকে অপারেশন করতে হয়। সেখানেও তিনি এই যন্ত্রটি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। রাজ-চিকিৎসক স্যার উইলিআম জেনার লিস্টারের নির্দেশে এই যন্ত্র চালিয়ে কারবলিকের স্প্রে ছড়ালেন। মহারানীর চোখে এই ধোঁয়া গেল। তিনি জেনারের প্রতি বিরক্ত হলেন। কিন্তু জেনার হেসে বললেন, আমার আর কি দোষ? আমি তো শুধু পাম্পের হাতল চালাচ্ছি।

মহারানীর অপারেশন করে লিস্টার পরদিন দেখলেন, ভেতরের সব পুঁজ লিণ্টে আটকে যাচ্ছে, বাইরে বেরুচ্ছে না। হাতও ফুলছে। লিস্টারের মহা ভাবনা হল। ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হল, ক্ষতের ভিতর থেকে পুঁজ বেরিয়ে আসার রাস্তা যদি না পায়, তাহলে রক্ত দূষিত হবে। বিপত্তি ঘটবে। তাহলে কি করে তিনি মহারানীকে বাঁচাবেন?

দশ বছর আগে এক সার্জন ক্ষতে রবার টিউব ঢুকিয়ে দূষিত রক্ত এবং পুঁজ বার করা যায় কিনা তার পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু লিস্টার তা জানতেন না। তিনি নিজের বুদ্ধিতে ভেবে ভেবে একটা রবার টিউব কেটে তার গায়ে অনেকগুলি ফুটো করে মহারানীর ক্ষতে ঢুকিয়ে দিলেন। এই টিউব দিয়ে পুঁজ বেরিয়ে গেল, তারপর একদিন সেই ক্ষতও শুকিয়ে গেল। মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রাণ রক্ষা হল।

কারবলিক একে ভীষণ বিষ, তার ওপর সাংঘাতিক উগ্র তার গন্ধ। অনেক সার্জনই তা সইতে পারতেন না। এমন কি, খুব পাতলা করে জলে গুলে হাত ডোবালেও অনেকের হাত জ্বালা করত।

অনেকদিন পরের কথা। আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে এই জীবাণুধ্বংসক কারবলিক তখন চালু হয়েছে। উদীয়মান নতুন সার্জন উইলিআম স্টুয়ার্ট হলস্টেড লিস্টারের এই যুগান্তকারী রীতি জনস হপকিনস হাসপাতালে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবর্তন করেছেন। তখন ১৮৮৯ সাল। হাসপাতালের হেড নার্স আমেরিকার দক্ষিণ প্রদেশের লাবণ্যময়ী সুন্দরী এক যুবতী। নাম তার ক্যারোলাইন হ্যামপটন। কারবলিকে বার বার হাত ডুবিয়ে তাঁর ঐ নরম হাতে জ্বালা ধরে লাল হল। তারপর ঐ হাতে চর্মরোগ দেখা দিল। তাই দেখে প্রতিভাশালী যুবক সার্জন হলস্টেড উদ্বিগ্ন হলেন।

এক বৎসরের চেষ্টায় সার্জন হলস্টেড এর প্রতিকার বার করলেন; পাতলা রবারের দস্তানা। তখন অবশ্য ঐ সুন্দরী ক্যারোলাইন হ্যামপটন আর হাসপাতালের হেড নার্স নন। সার্জন হলস্টেডকে বিবাহ করে তখন তিনি হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু ঐ রবারের দস্তানা এখনও সব হাসপাতালে টিকে আছে।

লিস্টার নিজেও কারবলিকের অসুবিধা বুঝতেন। কিন্তু জীবাণু ধ্বংস করে এমন অন্য ওষুধ শত চেষ্টা করেও তিনি খুঁজে পান নি বলেই কারবলিকও ছাড়তে পারেন নি। ঐ সাংঘাতিক গাধা-যন্ত্রটি অবশ্য পরে তিনি বর্জন করেছিলেন। ১৮৭০—১৮৮০ সাল পর্যন্ত ব্যবহার হবার পর ঐ যন্ত্র মিউজিঅমে স্থান পেয়েছে।

লিস্টারের জীবাণুধ্বংসক রীতি ইংলণ্ড অথবা স্কটল্যাণ্ডে খুব বেশী সমর্থন না পেলেও বিদেশে অর্থাৎ ইওরোপ এবং আমেরিকায় সবাই তা লুফে নিল। অ্যাগনেসকে নিয়ে লিস্টার যখন জার্মানীতে গেলেন, দিগ্বিজয়ী বীরের মত তাঁকে অভ্যর্থনা করা হল। মেডিক্যাল ছাত্ররা সার বেঁধে স্টেশনে এসে গান করে তাঁকে অভ্যর্থনা করল। লাইপজিগে তাঁর জন্য ভোজের যে বিরাট আয়োজন হয়েছিল, অ্যাগনেস জীবনে কখনও সেরকম ভোজ দেখেন নি। পরদিন স্যাকসনীর রাজা নিজে লিস্টারের পদ্ধতিতে অপারেশন করা দেখলেন।

এডিনবরায় লিস্টারের জীবাণু-ধ্বংসক পদ্ধতির সবচেয়ে বিরোধী ছিলেন সিমসন। তাঁর মৃত্যুর পর হলেন, রবার্ট লসন টেইট। তিনি সিমসনের শিষ্য।

গুরুর মত ইনিও ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ। টেইট নিজেকে সিমসনের মানসপুত্র বলে মনে করতেন। সিমসনের মত পোশাক পরতেন, দাড়ি রাখতেন। চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই তিনি এক হাজার রুগীর পেট কেটে অপারেশন করেছেন; অথচ মৃত্যুহার শতকরা দশটির বেশি কখনও হয়নি। অন্য কোন সার্জন তখন এত অপারেশন করেন নি; কিংবা এইরকম সুফল দেখাতে পারেন নি।

টেইট জীবাণু বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। গরম জল তিনি ব্যবহার করতেন, কিন্তু ফোটাতেন না। কারবলিক ছুঁতেন না। লিস্টারইজম তিনি মানতেন না। বলতেন, জীবাণু যা থাকে মানুষের শরীর তা ধ্বংস করে।

যদিও তিনি লিস্টারের বিরোধী ছিলেন, তবু ঐ জীবাণুতে তাঁর যত না আপত্তি ছিল, তার চেয়ে সাংঘাতিক বেশি আপত্তি ছিল লিস্টারের কারবলিক স্প্রেতে। লিস্টার নিজেও তা পরে বর্জন করেছেন। কিন্তু তবু আজকালকার জীবাণুশূন্য রাতির রবার্ট লসন টেইট-ই ছিলেন পথিকৃৎ। সামান্য পরিচ্ছন্নতা, সাবান জল আর মানুষের দেহের জীবাণুধ্বংস করার ক্ষমতা এই ছিল তাঁর সম্বল। সামান্য ঐটুকু পুঁজি নিয়েই তিনি অত বড় বড় সব পেটের অপারেশন করে গেছেন নির্বিঘ্নে।

এই জিনিসই আজকাল অপারেশন থিয়েটারে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সব জিনিস আগে জীবাণুশূন্য করে নিতে হয়। অর্থাৎ স্টেরিলাইজ করা হয়।

এই কথাই লিস্টার সারা জীবন ধরে সবাইকে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু অনেকেই তখন তা বোঝেনি।

পঞ্চাশ বৎসর বয়সে লিস্টার আবার লণ্ডনে এলেন; কিংস কলেজ হাসপাতালে। এডিনবরা ছাড়বার আগে তিনি ছাত্রদের যখন লেকচার দেন তখন বলেছিলেন, সার্জারী শুধু লেকচার এবং বই পড়ে শেখা যায় না। রুগীর বিছানার পাশে বসে এ জিনিস শিখতে হয়। এডিনবরায় এইদিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়। কিন্তু লণ্ডনে হয় না। তাই লণ্ডনের ছাত্ররা যতবেশি শিখতে পারত, তা কখনও পারে না।

লণ্ডনে এসে লিস্টার দেখলেন, এই বক্তৃতা কাগজে কাগজে ছাপা হয়েছে। লিস্টারের ধৃষ্টতা দেখে সবাই অবাক হয়েছে। কোন সাহসে তিনি বলেন, এডিনবরায় লণ্ডনের চেয়ে ভালো শেখানো হয়?

কাজেই লণ্ডনে এসে তাঁকে বাধার পর বাধা পেতে হল। ডাক্তারদের কাছে। ছাত্রদের কাছে। নার্সদের কাছে।

প্রথম যেদিন তিনি ছাত্রদের ক্লাসে বললেন জীবাণুর কি কাজ, কি করে আঙুরের রস গেঁজে ওঠে, কি করে দুধ টকে যায়, সেদিন এইসব শুনে ছাত্ররা বিরক্ত হল। তারা এসেছে সার্জারীর কথা শুনতে। কিন্তু এসব কি? তাই তারা গুঞ্জন শুরু করল। কেউ কেউ বেড়ালের ডাক ডাকল। লিস্টার কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করলেন না। ধীরে ধীরে তিনি নিজের বক্তব্য বলে গেলেন। কিন্তু ছাত্ররা সব চটে গেল। তাই ঠাট্টা করে সবাই বলতে শুরু করল, দরজা জানালা খুলো না, তাহলেই কিন্তু লিস্টারের জীবাণুরা সব ঘরে এসে ঢুকবে।

নার্সরা দেখত লিস্টারের সময় জ্ঞান নেই। যখন-তখন ওয়ার্ডে তিনি ঢোকেন। যতক্ষণ ইচ্ছা থাকেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে উপদেশ দেন। সবচেয়ে মারাত্মক, লিস্টার রবিবারে পর্যন্ত হাসপাতালে আসেন। লোকটার কি এতটুকুও ধর্মজ্ঞান নেই?

লিস্টারকে এডিনবরা থেকে আনা হয়েছে। কেন, লণ্ডনে কি ভাল সার্জন নেই? হাসপাতালের অন্য সার্জনরা তাই লিস্টারের ওপর অপ্রসন্ন হয়ে রইলেন। তার ওপর লিস্টার নতুন নতুন সব অপারেশন শুরু করলেন। হাঁটুর সামনে নিক্যাপ নামে যে ছোট্ট হাড়টি থাকে তাই ভেঙে একটি লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে একদিন হাসপাতালে এল। লিস্টার জয়েণ্ট কেটে ঐ ভাঙা হাড় তার দিয়ে বেঁধে দিলেন। ডাক্তাররা শুনে ক্ষেপে গেলেন। যার কম্পাউণ্ড ফ্রাকচার হয়নি, তারও জয়েণ্ট খুলে অপারেশন? লিস্টার এ সব কি আরম্ভ করেছেন? কেউ কেউ বললেন, বেশ হয়েছে। অপারেশনের পর রুগীটি যখন মরবে তখন লিস্টারের নামে ম্যালপ্রাকটিসের জন্য মামলা করা যাবে।

শুনে অ্যাগনেস তো রাগে যেন জলে গেলেন। বললেন, লণ্ডনের ডাক্তাররা কি মানুষ? কোথায় সবাই চাইবে লোকটা ভাল হয়ে উঠুক। তা নয়, সবাই তার মৃত্যু কামনা করছে?

এত বাধা, এত ঝুঁকি নিয়ে লিস্টার লণ্ডনে নিজেকে ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। ধীরে ধীরে সবাই তাঁর জীবাণুধ্বংসক রীতি মেনে নিল। পাস্তুরকে পৃথিবী বুঝতে শিখল। জার্মানীর রবার্ট কক অ্যানথ্রাকস টিউবার-কুলোসিস কলেরা ইত্যাদির জীবাণু আবিষ্কার করলেন। জীবাণুতত্ত্ব চিকিৎসা বিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। হাইজিন ও পাবলিক হেলথ-এর মর্ম

এতদিনে লোকে বুঝতে শিখল। সার্জারীতে জীবাণুধ্বংসক (অ্যান্টিসেপটিক) রীতি থেকে জীবাণুশূন্য (আসেপটিক) রীতির প্রবর্তন হল।

পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে লিস্টার কিংস কলেজ থেকে বিদায় নিলেন, ১৮৯২ সালে। সেই বছর লুই পাস্তরের সপ্ততিতম জন্মোৎসব প্যারিসে খুব ঘটা করে সুসম্পন্ন হল। সারা পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানীরা ঐ উৎসবে যোগ দিলেন। এডিনবরা এবং লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির পক্ষ থেকে লিস্টার এই উৎসবে প্যারিসে গেলেন। সস্ত্রীক।

লিস্টার যখন ঐ সভায় ঘোষণা করলেন, পাস্তরের জীবাণুতত্ত্বের জন্যই আজ সার্জারীতে এই যুগান্তর আনা সম্ভব হয়েছে, পাস্তর আর বসে থাকতে পারলেন না। সভায় উঠে দাঁড়িয়ে লিস্টারকে তিনি আলিঙ্গন করলেন আড়াই হাজার দর্শকের সামনে।

তারপর লিস্টার অ্যাগনেসকে নিয়ে ইটালীর রাপালোতে বেড়াতে এলেন। ভাবলেন, শীতটা এখানে কাটিয়ে আবার দেশে ফিরবেন। কিন্তু এইখানে এসে সাংঘাতিক এক কাণ্ড হল।

একদিন ঠাণ্ডা লেগে অ্যাগনেসের জ্বর হল। দু দিনের মধ্যেই লিস্টার বুঝলেন, এ জ্বর নিউমোনিয়া। পাঁচ দিনের মধ্যেই অ্যাগনেসের মৃত্যু হল। শেষ চারদিন লিস্টার স্ত্রীর বিছানার পাশে বসে কাটালেন। কিন্তু অ্যাগনেস তখন জ্বরে অচৈতন্য। একটি কথাও তিনি আর লিস্টারকে বলে যেতে পারলেন না।

সাঁইত্রিশ বৎসর এক সঙ্গে কাটিয়ে লিস্টার আজ একা। দুজনে মিলে বেড়াতে এসেছিলেন কিন্তু বাড়ি ফিরতে হল একা। অ্যাগনেসের প্রাণহীন দেহ সযত্নে কফিনে পুরে সঙ্গে নিয়ে। এতদিন যা কিছু তিনি করেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রবন্ধ তৈরী, লেখাপড়া সবকিছুর সঙ্গেই অ্যাগনেস জড়িয়ে ছিলেন। সব কাজেই তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। অ্যাগনেসের সমাধির সঙ্গে সঙ্গে লিস্টারেরও সব কাজ শেষ হল। এখন সামনে শুধু যশ আর খ্যাতি। ১৮৯৩ সালে তাঁকে ব্যারণ করা হল এবং মহারানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলির সময় লর্ড। ১৮৯৭ সালে। ১৯১২ সাল পর্যন্ত একা এই খ্যাতির বোঝা মাথায় নিয়ে লর্ড লিস্টার একদিন দেহরক্ষা করলেন; স্ত্রী অ্যাগনেসেরই মত নিউমোনিয়ায়।

রবার্ট কক

ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহের পর তখন মাত্র উনিশ বৎসর পার হয়েছে। ১৮৭৬ সাল। পৃথিবীতে কোথাও কেউ জানে না যে প্রতিটি ছোঁয়াচে রোগ আলাদা একটি জীবাণুঘটিত; কিংবা সেই জীবাণু চোখে দেখা যায়। অথবা নিজের চোখের সামনে চাষ করে এই জীবাণু গজিয়ে সুস্থ দেহে তা সংক্রামিত করে এই রোগ ঘটানো যায়।

জার্মানীর প্রবীণ বিজ্ঞানীদের সামনে এইসব অদ্ভুত কাণ্ড ম্যাজিকের মত পর পর একসঙ্গে দেখিয়ে জীবাণু-তত্ত্ব যিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে হঠাৎ একদিন সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন তাঁর নাম রবার্ট কক্ (১৮৪৩—১৯১০)।

রবার্ট কক পূর্ব জার্মানীর লোক। হ্যানোভারের ক্লাউসথালে তাঁর জন্ম। পরিবারটি বেশ বড়। কিন্তু খুব গরিব। কাজেই যখন ঠিক হল, তাঁকে জুতো তৈরী এবং জুতো সেলাই-এর কাজই শিখতে হবে, কক তাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য হলেন না। বরং খুশি মনেই নিজেকে তিনি প্রস্তুত করলেন। ওজর আপত্তি অথবা প্রতিবাদ কিছুই তিনি করলেন না।

সৌভাগ্যক্রমে পরিবারের আথিক অবস্থা হঠাৎ কিছুটা উন্নত হল। ছোট্ট গোএটিনগেন শহরের বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আশাতীত এক সুযোগ কক পেয়ে গেলেন। এইখান থেকে কক ডাক্তারী ডিগ্রি নিলেন ১৮৬৬ সালে। ডাক্তারী ক্লাসে ভাল ছেলে বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। প্রবন্ধ লিখে তিনি প্রাইজ পর্যন্ত পেয়েছিলেন। কিন্তু পারিবারিক অর্থকষ্টের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ছেড়ে তাঁকে চাকরি নিতে হল।

তাঁর প্রথম চাকরি হল হামবুর্গের এক পাগলা গারদে। এইখানে কিছুদিন কাজ করে একটি যুবতীর সঙ্গে তাঁর খুব ভাব হল। এই মেয়েটির নাম এমি ফ্রাআজ। কক একদিন এমিকে লোভ দেখালেন যে, তাঁকে যদি এমি বিবাহ করেন, তাহলে জাহাজের কাজ নিয়ে তিনি এমিকে সঙ্গে করে

দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াবেন। খুব মজা হবে। কত নতুন নতুন জিনিস দেখা যাবে।

এমি শুনে বললেন, বিবাহে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু কককে এসব পাগলামো ছাড়তে হবে। কোনো গ্রামে কিংবা ছোট্ট একটি শহরে বসে তাঁকে ডাক্তারী প্র্যাকটিস শুরু করতে হবে।

কাজেই কককে ঐ সামান্য চাকরি ছেড়ে রাখউইজ শহরে প্র্যাকটিস শুরু করতে হল। এমির সঙ্গে বিবাহ হল। শেষে ফ্রাঙ্কোপ্রুসিয়ান যুদ্ধে কিছুদিন কাজ করে কক পোজেন প্রদেশের ভোলস্টাইন শহরে ডাক্তার হয়ে বসলেন। এই শহর যত না জার্মান, তার চেয়ে বেশী পোল দেশীয়। এইখানেই কক ঘোড়ায় চড়ে ছোটাছুটি করে রুগী দেখতে লাগলেন এবং স্ত্রী এমিকে নিয়ে সংসার পাতলেন। কক যত রুগী নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, ঘরে তত বেশী পয়সা আসত, আর এমিও তত বেশী খুশি হতেন।

তবু রবার্ট ককের মনে শান্তি নেই। এই একঘেয়ে রুগী দেখা আর ওষুধ দেওয়ায় তাঁর মন ভরে না। কী রোগ, কেন হয়, কী তার প্রতিকার কিছুই তখন জানা নেই, তবু ওষুধ দিতে হবে এবং রুগীকে দিতে হবে ভরসা। আর এমনি করে রুগীর পয়সা নিজের পকেটে ফেলতে হবে।

কক খুঁতখুঁত করেন। এই কাজ তাঁর ভালো লাগে না। প্র্যাকটিস ছেড়ে অন্য কোন চাকরি নিয়ে চলে যাবেন বলে প্রায়ই তিনি এমিকে ভয় দেখান।

কক-এর বয়স তখন মাত্র আটাশ। জন্মদিনে এমি তাঁকে একটা মাইক্রোসকোপ উপহার দিলেন। ভাবলেন, কক এটা পেয়ে খুশি হবেন। বাচ্চাদের মত এই খেলনা নিয়ে আপনমনে ঘরে বসে খেলা করবেন। গজর-গজর করে সর্বক্ষণ আর অমন আপসোস করবেন না। প্র্যাকটিসে মন বসবে।

কিন্তু এইখানেই এমির ভুল হল। নিজে খাল কেটে এমি নিজের ঘরে কুমীর আনলেন। তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেল। এই সর্বনাশা মাইক্রোসকোপ কককে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল। অক্টোপাসের মত আষ্টেপৃষ্ঠে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল যে, এমি তাঁর নারীসুলভ ছলাকলার মোক্ষম সব অস্ত্র হেনেও সে কঠিন বাঁধন আর কাটতে পারলেন না। কক দিনের পর দিন তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন এবং সারাদিন ঐ মাইক্রোসকোপ নিয়েই মেতে রইলেন।

তখন ইওরোপের গ্রামে গ্রামে গোরু ভেড়ার মড়ক লেগেছে। পালে পালে গবাদি পশু অ্যানথ্রাকস রোগে মারা যাচ্ছে। গরিব বিধবার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন নিমেষে ধ্বংস হচ্ছে। ঘরে ঘরে হাহাকার পড়ে গেছে।

কক এই রোগের কারণ খুঁজতে লাগলেন। মৃত ভেড়ার রক্ত এনে মাইক্রোসকোপে চড়ালেন। দেখলেন, সরু সরু কাঠির মত অতি ক্ষুদ্র অজানা এক জিনিসে এই রক্ত ভরা। অথচ সুস্থ ভেড়ার রক্তে এসব নেই। এই সরু সরু কাঠি, এরাই কি জীবাণু? এই কি রোগের কারণ?

কক জানতেন, কিছুকাল আগে প্যারিসের দুজন ডাক্তার অ্যানথ্রাকস রোগে মৃত ভেড়ার রক্তে এইরকম সরু কাঠির মত জীবাণু দেখেছেন। কিন্তু একমাত্র পাস্তর ছাড়া আর কেউ সেকথা বিশ্বাস করেন নি। এই জীবাণুই যে সত্যিই এই রোগের কারণ তাও অবশ্য প্রমাণ হয়নি।

কক ভাবলেন, কি করে তা প্রমাণ করা যায়? এই জীবাণুর কি প্রাণ আছে?

সুস্থ ভেড়ার রক্তে এই সরু কাঠির মত জীবাণু নেই। কসাইদের কাছ থেকে দিনের পর দিন গোরু ভেড়ার রক্ত এনে কক পরীক্ষা করে দেখেছেন কিন্তু কখনও এ জীবাণু পাননি। অথচ অ্যানথ্রাকসে মৃত পশুর রক্তে এই জীবাণু আছে। এই রোগে মৃত সব পশুর রক্তে কক ঐ একই জীবাণু দেখেছেন।

উনিশ শতকের এশিয়াটিক কলেরা

এই জীবাণু-ভরা দূষিত রক্ত যদি সুস্থ সবল পশুদেহে সংক্রামিত করা যায় তাহলে কি হয়? যদি এই জন্তুর এই অ্যানথ্রাকস রোগে মৃত্যু হয় এবং তার দেহেও ঐ জীবাণু পাওয়া যায়, তাহলে?

কক ভাবলেন, তাহলেই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হবে, ঐ জীবাণু এই সাংঘাতিক রোগের একমাত্র কারণ। অতএব পরীক্ষা করে তা প্রমাণ করা চাই।

কিন্তু সুস্থ গোরু ভেড়ার ওপর এই প্রাণঘাতী পরীক্ষা কি ক'রে সম্ভব হবে? কে তাঁকে এই সুযোগ দেবে? যদি পয়সা থাকে তাহলে অবশ্য ইচ্ছে মত গবাদি পশু কিনে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায়। কিন্তু কক গরিব মানুষ। ডাক্তারী করে কোনও রকমে তিনি সংসার চালান। এত পয়সা পাবেন কোথা?

ভেবে ভেবে ককের মাথায় এক বুদ্ধি এল। গোরু ভেড়ার অনেক দাম। কিন্তু সাদা ইঁদুর খুব সস্তা। এই ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করলে কেমন হয়?

কক রুগী পরীক্ষার ঘরে এক কোণে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ছোট্ট একটু খুপরী আলাদা করে নিলেন। একটা খাঁচায় কয়েকটা ইঁদুর, স্ত্রী এমির দেওয়া ঐ মাইক্রোসকোপ, কিছু কাঁচের স্লাইড আর একটা আগুনের চুল্লী। এই সামান্য সরঞ্জাম নিয়ে ঐ খুপরীতে বসে তাঁর গবেষণা শুরু হল।

ইনজেকশনের জন্য একটা সিরিঞ্জ পর্যন্ত নেই এমনি তাঁর ল্যাবরেটরী। সিরিঞ্জের বদলে কাঠ চিরে সরু ছুঁচলো কাঠি তৈরী করা হল। এই কাঠি চুল্লীর ওপর রেখে জীবাণুশূন্য করে কক অ্যানথ্রাকসে মৃত পশু-রক্তে ডুবিয়ে নিলেন। ছুরি দিয়ে ইঁদুরের ল্যাজের গোড়া সামান্য একটু কেটে ঐ অ্যানথ্রাক্সের রক্ত কাঠিতে তুলে তিনি ঐ কাটা জায়গায় ঘষে দিলেন। অর্থাৎ ইঁদুরের গায় ইনজেকশনের বদলে বসন্তের মত ইনঅকুলেশন করা হল। তারপর আলাদা একটা খাঁচায় এই ইঁদুরটাকে রেখে কক খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে স্ত্রী এমির কাছে এসে ফলাও করে গল্প ফাঁদলেন।

কিন্তু এমির মুখের একটিমাত্র কথায় ককের সব ফুর্তি সব উচ্ছ্বাস ফুটুস করে চুপসে গেল। ভ্রূ কুঁচকে নাক সিঁটকে এমি বললেন, কিন্তু তোমার গায় ইঁদুরের কি বিচ্ছিরি গন্ধ?

পরদিন সকালে কক দেখলেন, খাঁচাতে ঐ ইঁদুরটা মরে পড়ে আছে। কক এই মৃত ইঁদুরটা ব্যবচ্ছেদ করে দেখলেন, আনথ্রাক্সে মৃত গোরু ভেড়ার মত ইঁদুরের পিলেটিও বেশ বড় হয়েছে। এই পিলে কেটে কিছু কালো রক্ত নিয়ে কক মাইক্রোসকোপে চড়ালেন। দেখলেন, এই রক্তে ঐ সরু কাঠির মত সব জীবাণু। দেখে কক খুশী হলেন কিন্তু আনন্দে আত্মহারা হলেন না। ভাবলেন, একদিনের পরীক্ষায় কিছুই প্রমাণ হয় না। আরও বার বার পরীক্ষা করা চাই।

এখন রোজ কক একটি ইঁদুরকে এই রোগে সংক্রামিত করেন। পরদিন

ঐ মৃত ইঁদুর ব্যবচ্ছেদ করে পিলের রক্ত মাইক্রোসকোপে চড়ান। ঐ জীবাণু দেখে পিলের এই দূষিত রক্ত নতুন আর একটি ইঁদুরের গায় লাগান।

এক মাস এমনি করে পরীক্ষা করে কক দেখলেন, পরীক্ষার ফল রোজই ঠিক এক হয়। কক বুঝলেন, এতদিনে একটা তথ্য প্রমাণ হয়েছে। অ্যানথ্রাকসের কারণ যে ঐ সরু কাঠির মত জীবাণু তা প্রমাণ হয়েছে।

কিন্তু এই জীবাণুই যদি এ রোগের কারণ হয় তাহলে নিশ্চয়ই এরা সজীব। এবং মুহূর্তের মধ্যেই দেহে এরা হাজারে হাজারে বৃদ্ধি পায়। না হলে সরু কাঠির ডগায় যে সামান্য একটু দূষিত রক্ত তিনি ইঁদুরের দেহে লাগান তাতে আর কটাই বা ঐ জীবাণু থাকে ? তা থেকে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লাখে লাখে ঐ জীবাণু ইঁদুরের রক্তে কোথা থেকে আসে ?

অথচ মজা এই যে, জীবন্ত এই জীবাণু কক এখনও নিজের চোখে দেখেন নি। কি করে সামান্য কয়েকটি জীবাণু এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় ? এ রহস্য কি কখনও জানা যাবে না ? কখনও চোখে ধরা দেবে না ?

এই এক চিন্তা এখন কককে যেন পেয়ে বসল। রুগী দেখতে গিয়েও কক একথা ভাবেন। স্ত্রীর সঙ্গে খেতে বসেও এই কথা মনে পড়ে। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে বিদায় নিয়ে তিনি উঠে পড়েন। তারপর নিজের ঐ ল্যাবরেটরীতে এসে ঢোকেন। স্ত্রী এমি যে ওদিকে ক্ষুণ্ণ হয়ে মর্মাহত হয়ে একা বিছানায় ছটফট করে অবশেষে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন সে খেয়াল তার হয় না।

ঐ ছোট্ট ল্যাবরেটরী ঘরে আলো জালিয়ে সারারাত একা একা বসে কক ভাবেন, ইঁদুরের দেহে এই জীবাণু যেমন বৃদ্ধি পায়, দেহের বাইরে আর কোন উপায়ে কি তা গজানো যায় না ? কক তখনও জানেন না, প্যারিসে লুই পাস্তর এ রহস্যের সমাধান করেছেন ; মাংসের স্যুপে জীবাণু গজিয়ে।

পাহাড়ের গুহার ভিতর বসে আদিম মানুষ যেমন একদিন হঠাৎ পাথর ঠুকে প্রথম আগুন জ্বালিয়েছিল, রবার্ট ককও ঠিক সেই পদ্ধতিতে জীবাণু গজাবার উপায় খুঁজতে লাগলেন। নিজের চেষ্টায়। কিছু না জেনে। বারে বারে ভুল করে। পদে পদে ঠোক্কর খেয়ে।

কক ভাবলেন, এই জীবাণু যখন গোরু-ভেড়ার রক্তে বাড়ে তখন নিশ্চয়ই ঐ পশুদেহের রস এই জীবাণুর খাদ্য অথবা ধারক। এই ভেবে তিনি কসাইখানা থেকে ষাঁড়ের চক্ষুর তরল কিছু রস সংগ্রহ করলেন।

স্লাইডের ওপর এক ফোঁটা এই রস লাগিয়ে তিনি অ্যানথ্রাক্সে মৃত ইঁদুরের পিলে খুঁচিয়ে একটুখানি তুলে ঐ রসে লাগিয়ে দিলেন। তার ওপর আর একটি স্লাইড বসিয়ে মাইক্রোসকোপে চড়ালেন।

হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, এ রসে জীবাণু গজাবে না। জীবদেহে উত্তাপ থাকে। স্লাইডের ওপর চক্ষু-রসে উত্তাপ কৈ? অতএব ঐ স্লাইড জীবদেহের সমান গরম রাখা চাই।

কি করে এই স্লাইড পশুদেহের সমান উত্তাপে রাখা যায়? ভেবে ভেবে তারও এক উপায় কক বার করলেন। তেলের বাতির ওপর একটা পাত্রে কিছু জল রেখে তার ওপর টিনের একটা কৌটা বসিয়ে কক অভিনব এক ইনকিউবেটার তৈরি করলেন। এই অদ্ভুত ইনকিউবেটারে জীবাণু মেশানো চক্ষুরসের স্লাইড ঢুকিয়েও ককের মনে দুশ্চিন্তার আর অন্ত নেই। রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বাতির পলতে বাড়িয়ে দিতে হয়। জল শুকিয়ে গেলে আবার জল ঢালতে হয়। স্লাইড তুলে বার বার পরীক্ষা করতে হয়।

এক একবার ককের মনে হয় যেন ঐ কাঠির মত অ্যানথ্রাকসের জীবাণু তিনি দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু অন্য অনেক বাজে জীবাণু গজিয়ে ঐ সরু সরু কাঠি সব ঢেকে দেয়। কক কিছুই আর দেখতে পান না।

এইসব বাজে জীবাণু কি করে আটকানো যায়? ভাবতে ভাবতে একদিন ককের মাথা খুলে গেল। মনে হল, এই সোজা রাস্তাটা এতদিন চোখে পড়েনি কেন?

একটা স্লাইড গরম করে কক জীবাণুশূন্য করলেন। সদ্য বধ করা ষাঁড়ের এক ফোঁটা চক্ষুরস তার ওপর রাখলেন। ফোঁটার চারদিকে স্লাইডের ওপর ভেজলিন লাগানো হল। অ্যানথ্রাকসে সদ্য মৃত ইঁদুরের পিলে সরু কাঠির ডগায় খুঁচিয়ে তুলে কক স্লাইডের ওপর ঐ রসের ফোঁটায় মিশিয়ে দিলেন। তার ওপর ছোট আর একখানা স্লাইড চাপা দেওয়া হল। এই স্লাইডের মাঝখানে ঐ ফোঁটার মাপে খানিকটা কাঁচ খুঁড়ে নেওয়া। কাজেই এই স্লাইডের চাপে ঐ রস আর চেপ্টে না গিয়ে যেন ঝুলে রইল। ফোঁটার চারধারে ভেজলিন থাকায় স্লাইড দুখানা আটকে গেল। ফোঁটার ভেতর অন্য কোন জীবাণু ঢোকবার আর কোনো আশঙ্কা থাকল না।

এই স্লাইড মাইক্রোসকোপে চাপিয়ে কক অনুসন্ধানী দৃষ্টি হেনে বসে রইলেন। প্রথমে কিছুই নজরে পড়ল না। ইঁদুরের পিলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো

আর তার মধ্যে দুটি একটি ঐ সরু কাঠির মত নির্জীব অ্যানথ্রাকসের জীবাণু। দু ঘণ্টা ধরে কক বসে বসে এই স্লাইড দেখলেন। প্রতি পঞ্চাশ মিনিট পর একবার করে চোখ তুলে টাটানো চোখ দুটি একটু জিরিয়ে নিলেন। কিন্তু নতুন কিছুই দেখা গেল না।

হঠাৎ এক কাণ্ড হল। রোগক্লিষ্ট ঐ ইঁদুরের পিলের ভেতর যেন বায়োস্কোপের মত আজব এক খেলা শুরু হল। নিজের চোখের সামনে অতর্কিতে অদ্ভুত এক নাটকের অপার্থিব খেলা শুরু হতে দেখে কক বিস্ময়ে আনন্দে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর দেহের ভিতর দিয়ে হঠাৎ যেন পুলকের এক অপূর্ব শিহরণ খেলে গেল।

কক দেখলেন, একটা জীবাণু ভেঙ্গে দুটো হল, দুটো থেকে চারটে, তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে হাজার হাজার। চক্ষুরসের সমগ্র ফোঁটাটাই জীবাণুতে জীবাণুতে ভরে গেল। সরু সরু কাঠি সুতোর মত লম্বা হয়ে যেন মৃত্যুজাল তৈরী করল। কক দেখে ভয়ে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

ডাক্তারের পৌষ মাস
কলেরা রুগীর সর্বনাশ

এইবার তিনি বুঝলেন, কেন এই জীবাণুর আক্রমণে গবাদি পশুর এত দ্রুত মৃত্যু হয়। মাত্র দু ঘণ্টার মধ্যেই এক ফোঁটা রসে যদি হাজার হাজার জীবাণুর সৃষ্টি হয়, তাহলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পশুদেহে না জানি কত লক্ষ কোটি এই প্রাণঘাতী জীবাণু গজিয়ে ওঠে।

কক মাইক্রোসকোপ থেকে এই স্লাইড নাবিয়ে ওপরের ছোট্ট কাঁচটি তুলে দেখলেন, ঐ রসের ফোঁটা যেন ঘোলাটে। এই রসে কাঠি ডুবিয়ে নতুন আর, এক ফোঁটা পরিষ্কার রসে মিশিয়ে আর একটি স্লাইড তিনি ইনকিউবেটরে রেখে দিলেন। পরদিন দেখলেন, এই রসও ঘোলাটে হয়েছে এবং হাজার হাজার জীবাণুতে ভরে গেছে। এই দ্বিতীয় স্লাইড থেকে ঘোলাটে রস নিয়ে নতুন রসে লাগিয়ে তিনি আর একটি নতুন স্লাইড তৈরী করলেন। এমনি করে পর পর আটদিন। প্রতিটি স্লাইডে হাজার হাজার জীবাণু দেখা গেল।

কক ভাবলেন, এই শেষ স্লাইডের জীবাণু প্রথম স্লাইডের জীবাণুর অধস্তন অষ্টম পুরুষ। ইঁদুরের দেহের বাইরে এই জীবাণু পর পর আটটি জন্মান্তর পার হয়ে এসেছে। তবু যদি এই জীবাণু ইঁদুরের দেহে অ্যানথ্রাক্স ঘটাতে সমর্থ হয় তাহলেই বোঝা যাবে এই জীবাণুই নিঃসন্দেহে ঐ সাংঘাতিক রোগের কারণ।

এই স্লাইড থেকে একটুখানি রস তুলে কক ইঁদুরের গায় সংক্রামিত করলেন। পরদিন সেই প্রথমদিনের মত এই ইঁদুরও মরে গেল। পিলে ভরা হাজার হাজার ঐ জীবাণু দেখা গেল।

তবু কক তাঁর এই আবিষ্কার গোপন রাখলেন। ভাবলেন, এই জীবাণুর সব রহস্য এখনও তাঁর জানা হয়নি।

জীবাণু-ভরা ঐ চক্ষুরস নিয়ে তিনি এইবার বিলিতি ইঁদুর (গিনিপিগ), তারপর খরগোস এবং শেষে একদিন সুস্থ এক ভেড়ার দেহে সংক্রামিত করলেন। দেখলেন যে, সব জায়গাতেই ফল এক হল। এই অ্যানথ্রাকস রোগেই সব পশুর মৃত্যু হল এবং বিভিন্ন সব জন্তুর পিলেতে ঐ একই জীবাণু পাওয়া গেল।

তখন সবাই বলত, এক একটা গোচারণের মাঠ যেন অভিশপ্ত। ঐ মাঠে চরলেই গোরু ভেড়ার অ্যানথ্রাক্স হয়। কি করে তা সম্ভব কক ভেবে পেলেন না। এই জীবাণু মাঠের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে থাকে? দিনের পর দিন কি করে তারা বেঁচে থাকে? অথচ কক-এর স্লাইডে চক্ষুরস শুকিয়ে গেলেই সব জীবাণু মরে যায়। নতুন রসে সংক্রামিত করলে তখন কোন জীবাণুই আর গজায় না।

ইনকিউবেটারে ইঁদুরের দেহের সমান উত্তাপে চব্বিশ ঘণ্টা রাখা জীবাণু ভরা এক ফোঁটা চক্ষুরসের স্লাইড মাইক্রোসকোপে চাপিয়ে কক একদিন অদ্ভুত এক কাণ্ড দেখলেন। ভেবেছিলেন, ঐ রস জীবন্ত সব জীবাণুতে ভরে থাকবে। সরু সরু কাঠির মত জীবাণু লম্বা লম্বা সুতোয় পরিণত হবে।

কিন্তু তাকিয়ে দেখলেন, এ কি? লম্বা লম্বা সুতো হয়েছে ঠিক। কিন্তু তার মধ্যে ছোট ছোট মুক্তোর মত ও কি? ছোট ছোট মুক্তো যেন মালার মত সুতো দিয়ে গাঁথা।

কক ভাবলেন, হয়ত অন্য কোন জীবাণু এই স্লাইডে ঢুকেছে। তবু এই স্লাইডের ওপর ঐ রস শুকিয়ে কক রেখে দিলেন। মাসখানেক পর একদিন আবার ঐ স্লাইড মাইক্রোসকোপে চড়িয়ে দেখলেন, সেই মুক্তোর মালা ঠিক

তেমনি আছে। এখনও ঠিক তেমনি চিক চিক করছে। কক শুকনো ঐ রসের ওপর তাজা এক ফোঁটা চক্ষুরস ফেললেন। তারপর মাইক্রোসকোপে চড়িয়ে দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার এক আজব কাণ্ড ঘটল। কি আশ্চর্য! তাজা খাদ্যরসে ভিজে মুক্তো দানার ঐ আবরণ ছিন্ন করে মুক্তোর ভেতর থেকে সজীব সব জীবাণু ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। কক দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন।

এইবার তিনি বুঝলেন, ঐ মুক্তোর মত দানা আসলে অ্যানথ্রাকসের গুটি (স্পোর)। তাই দীর্ঘকাল এরা সুপ্ত থাকে। অনুকূল পরিবেশে আবার এরা সজীব হয়।

সেই সময় উদ্ভিদবিদ্যার সঙ্গেই জীবাণুতত্ত্বের চর্চা হত। ফার্ডিনাণ্ড কঅন জার্মানীর ব্রেসলাউ-এ নামকরা উদ্ভিদবিশারদ। মাইক্রোসকোপে দেখা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবজগতের তখন তিনি মস্ত বড় এক পণ্ডিত।

কক কঅনের কাছে লিখলেন, অনেকবার ব্যর্থ হয়ে অবশেষে আমি অ্যানথ্রাকস জীবাণুর ক্রমবিকাশ আবিষ্কারে সফল হয়েছি। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমার বিশ্বাস, এই গবেষণার ফল, এখন আমি বেশ খানিকটা নিশ্চয়তার সঙ্গেই প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করার আগে হে মহামান্য অধ্যাপক, জীবাণুবিদ্যার অগ্রণী, শ্রদ্ধার সঙ্গে মিনতি করি, আপনি একবার দয়া করে এই আবিষ্কার দেখে আপনার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করুন।

কঅন অবশ্য এ চিঠি পেয়ে খুব কিছু উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন না। আবিষ্কারের অভিনব দাবি নিয়ে অনেকেই এরকম চিঠি লেখে। শেষে কিছুই প্রমাণ করতে পারে না। তবু সব্বাইকে যেমন তিনি আমন্ত্রণ করেন, কককেও তেমনি আসতে লিখলেন।

চিঠি পেয়ে কক তাঁর সাজসরঞ্জাম নিয়ে ব্রেসলাউ-এ হাজির হলেন। একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল। বড় বড় বিজ্ঞানী, রোগতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান ইত্যাদির পণ্ডিতদের সব নিমন্ত্রণ করা হল। রোগতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণাগার কনহাউস ইনস্টিটিউট-এও খবর পাঠানো হল। কঅন ভেবেছিলেন, ইনস্টিটিউটের কোন সহকারী প্যাথোলজিস্ট হয়ত নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আসবেন। কিন্তু সকলকে অবাক করে ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর জুলিআস কঅনহাইম নিজে ককের এই প্রদর্শনী দেখতে এলেন।

তারপর যা ঘটল সে এখন ইতিহাসের কথা। তিন দিন তিন রাত্রি ধরে রবার্ট কক তাঁর আবিষ্কার দর্শকদের সামনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখিয়ে দিলেন। জুলিআস কঅনহাইম থ্যানথ্রাকস জীবাণুর বিচিত্র এই ক্রমবিকাশ এবং তার পরিণতি নিজের চোখে দেখে বিস্ময়ে আনন্দে যেন অভিভূত হয়ে গেলেন। নিজের গবেষণাগারে ফিরে এসে সহকারীদের তিরস্কার করে বললেন, হাতের কাজ সব ফেলে এক্ষুনি ছুটে ককের কাছে চলে যাও। দেখে এস, লোকটা কি অদ্ভুত আবিষ্কার করেছে বৈজ্ঞানিক কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য না নিয়ে। নিজের একার চেষ্টায়। প্রমাণের কিছুই আর সে বাকি রাখে নি। সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য পরিপূর্ণ করে সে প্রকাশ করেছে। নতুন আর কিছুই কারুর করবার নেই। জীবাণুতত্ত্বের এ এক সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। আমার মনে হয়, কক আমাদের মুখে চূণ কালি দিয়ে আরও এমনি অনেক আবিষ্কার করে আমাদের লজ্জা দেবে। চমকিত করবে।

জুলিআস কঅনহাইমের এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে বেশী দেরি হল না। ১৮৭৬ সালে কক অ্যানথ্রাকসের রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন। মাত্র এক বছর পরে ককের নতুন আবিষ্কার, কি করে জীবাণু পাতলা কাচের ঢাকনিতে (কভার স্লিপ) শুকিয়ে আটকে রাখা যায় এবং তার ফটো তোলা যায় সে বিষয়ে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হল—নভেম্বর মাসে; ১৮৭৭ সালে। (ফিকসিং, ড্রাইং ব্যাকটেরিয়াল ফিলমস অন কভার স্লিপ এণ্ড ফটোগ্রাফি অফ ব্যাকটেরিয়া)। এক বছব পরে কক মনুষ্য দেহে আঘাতজনিত সংক্রামক রোগের কারণ আবিষ্কার করলেন; ১৮৭৮ সালে। (ইটিওলজি অফ ট্রমাটিক ইনফেকসাস ডিজিজ)।

কঅন এবং কঅনহাইম ভাবলেন, ককের মত এমন একজন বিজ্ঞানীর ঐরকম এক গাঁয়ে বসে ডাক্তারী এখন আর করার কোনো মানে হয় না। তাই তাঁরা চেষ্টা করে তাঁকে ব্রেসলাউ শহরে নিয়ে এলেন এবং সারকিট চিকিৎসকের এক কাজ দিলেন।

কিন্তু কক দেখলেন, এই সামান্য বেতনে শহরে থাকার খরচ তাঁর কুলোয় না। কাজেই তিনি কিছুদিন পরে আবার ঐ ভোলস্টাইন গ্রামে ফিরে গেলেন এবং সেখানেই ডাক্তারী প্র্যাকটিস শুরু করলেন।

অবশেষে ১৮৮০ সালে কনহাইমের চেষ্টায় কক বার্লিনে ইমপেরিয়াল

হেলথ কমিশনের এক সভ্যের কাজ পেয়ে গেলেন। এর পর আর তাঁকে বার্লিন ছাড়তে হয় নি।

বার্লিনে এসে মাত্র এক বছরের মধ্যেই কক মাংসের রস এবং জিলেটিন (সিরিশ) কাঁচের পাত্রে জমিয়ে তার ওপর বিভিন্ন সব জীবাণু আলাদা করে গজিয়ে জীবাণুতত্ত্বের এক যুগান্তর এনে দিলেন ; ১৮৮১ সালে। (কালচার মিডিয়া প্লেট উইথ জিলাটিন এণ্ড মিট ইনফিউশন)। তারপর অপারেশনে ব্যবহারের জন্য তুলো গজ এবং যন্ত্রপাতি কি করে ফুটন্ত জলের বাষ্প দিয়ে জীবাণুশূন্য করা যায় তারও এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। (স্টিম স্টেরিলাইজেশন ; পারফেকশন অফ মার্কস আইডিয়া)

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জানে যক্ষ্মা রোগ আসলে ক্ষয়রোগ এবং সাংঘাতিক ছোঁয়াচে। কিন্তু এই রোগ যে বিশেষ একটি জীবাণুর কাজ তা কেউ জানে না। বিজ্ঞানীরা বহু চেষ্টা করেও এ জীবাণু খুঁজে পান নি। শব ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গেছে, এই রোগে ফুসফুসের ওপর ছোট ছোট গুটি হয়। ফুসফুসে ক্ষত হয়। তারপর ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়।

অধ্যাপক জুলিআস কনহাইম যক্ষ্মারোগে মৃত রোগীর ফুসফুসের ওপর থেকে ঐ গুটি নিয়ে খরগোশের চোখে সংক্রামিত করেছিলেন। কক তাই দেখে নিজেই একদিন পরীক্ষা শুরু করলেন। এখন আর তাঁর অর্থাভাব নেই। তাই খরগোশ এবং বিলিতি ইঁদুরের এখন আর কোনো অভাব হল না।

কক নিজেও কনহাইমের মত খরগোশের দেহে এই রোগ সংক্রামিত করতে সমর্থ হলেন। ভাবলেন, তাহলে ফুসফুসের ঐ গুটির মধ্যে নিশ্চয়ই এই রোগের জীবাণু আছে।

হাসপাতাল থেকে এই রোগে মৃত রোগীর শব-ব্যবচ্ছেদের পর রোগদুষ্ট ফুসফুসের অংশ নিয়ে এসে কক এই জীবাণু খুঁজতে শুরু করলেন, রোগদুষ্ট ঐ ফুসফুসের টুকরো কাচের স্লাইডে লাগিয়ে এবং ঐ গুটি তুলে। অবশেষে একদিন তাঁর চেষ্টা সফল হল। তিনি নতুন এই যক্ষ্মা জীবাণু আবিষ্কার করলেন। ১৮৮২ সালে।

গল্প আছে, সবাই যখন এই জীবাণুর কথা শুনে ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু করেছে, তখন পল আরলিক নামে রঙে পাগল এক যুবক ডাক্তার একদিন কক-এর কাছে এলেন। ছ বছর আগে কক যখন অ্যানথ্রাকস জীবাণুর ক্রমবিকাশ

দেখতে প্রথম ব্রেসলাউ-এ আসেন, এই আরলিক তখন ডাক্তারী পড়েন। ল্যাবরেটরীতে আরলিকের ডেস্ক দেখিয়ে অধ্যাপকরা ককে তখন বলেছিলেন, এই ডেস্ক আরলিকের। ছেলেটা রঙের কাজ খুব ভাল জানে কিন্তু পরীক্ষায় পাশ কখনও করতে পারবে না।

এই আরলিক এক শিশি নীল রঙের মেথিলিন ব্লু সঙ্গে নিয়ে একদিন ককের কাছে এলেন, যক্ষ্মা-জীবাণু দেখতে। কক তখন ল্যাবরেটরীতে ছিলেন না। কিন্তু যে স্লাইডে কক ঐ জীবাণু পেয়েছিলেন সেখানা টেবিলের ওপর ছিল। তাই দেখে আরলিক খানিকটা ঐ নীল রঙ ঐ স্লাইডের ওপর ঢেলে দিলেন। তারপর ভেজা স্লাইডখানা হাতের কাছে ঠাণ্ডা স্টোভের ওপর তুলে রেখে নিজের বাসায় চলে গেলেন।

পরদিন সকালে ঝি এসে ঘর পরিষ্কার করে নিয়মমত স্টোভে আগুন দিয়ে চলে গেল। আরলিক যখন এলেন তখন ঐ স্লাইডটি বেশ গরম হয়েছে। ঐ স্লাইড মাইক্রোসকোপে চাপিয়ে আরলিক দেখলেন, ককের ঐ জীবাণু সব নীল হয়ে গেছে। চমৎকার রঙ ধরেছে। কক এসে দেখে নিজেও অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর জীবাণু কখনও আগে এত সুন্দর স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। নীল রঙে ডুবে এমন চমৎকার জ্বল জ্বল কখনও করে নি। কক আরলিককে ছাড়লেন না। নিজের ল্যাবরেটরীতে এক কাজ দিলেন।

যক্ষ্মা-জীবাণু এমনি করে রং করে কক দেখলেন একই জীবাণু রুগীর ফুসফুসে, থুতুতে, গ্ল্যাণ্ডে এবং হাড়ে অথবা বিভিন্ন আন্তর যন্ত্রেও পাওয়া যায়।

এই জীবাণু তিনি সেদ্ধ করা আলুর এক টুকরোর ওপর ল্যাবরেটরীতে একদিন গজিয়ে ফেললেন। এই গজানো জীবাণু যখন বিলিতি ইঁদুর কি খরগোশের গায়ে ঢোকানো হল, তাদের দেহেও এই জীবাণু পাওয়া গেল এবং এই রোগে তাদের মৃত্যু হল।

কক তাঁর তিন বৎসরের গবেষণার ফল একদিন প্রকাশ করলেন; জার্মানীর শারীর-বিজ্ঞান সমিতির কাছে। ১৮৮২ সালে; মার্চ মাসে।

এই প্রবন্ধে তিনি চারটি স্তম্ভ তুলে জীবাণুতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন। প্রথম, যক্ষ্মারোগীর দেহে এই জীবাণু থাকা চাই। দ্বিতীয়, এই জীবাণু রুগীর দেহ থেকে আলাদা করা চাই। তৃতীয়, সেই জীবাণু রুগীর দেহের বাইরে চাষ করে গজানো চাই। চতুর্থ, চাষ করে গজানো এই জীবাণু পশুদেহে সংক্রামিত করে এই রোগ ঘটিয়ে তার দেহ থেকে ঐ জীবাণু বার করা চাই।

যক্ষ্মারোগীর থুতুতে এই জীবাণু থাকে। কাশির সঙ্গে এই জীবাণু বেরিয়ে এসে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সুস্থদেহে সংক্রামিত করে। এই তথ্য প্রমাণের জন্য কক একটা বন্ধ বাক্সে খরগোশ, ইঁদুর এবং গিনিপিগ বাগানে রেখে নিজের ল্যাবরেটরী থেকে সীসের পাইপ লাগিয়ে ল্যাবরেটরীতে গজানো যক্ষ্মা জীবাণু রোজ আধ ঘণ্টা ধরে পাম্প করে ঐ বাক্সে ঢুকিয়েছেন। তিনদিন পাম্প করে দেখেছেন, দশদিনের দিন খরগোশের এই রোগ হয়েছে আর তিন সপ্তাহে গিনিপিগের।

ছোট্ট এই প্রবন্ধ শারীর-বিজ্ঞান সমিতির সভায় পাঠ করে কক যখন আলোচনার জন্য বসে পড়লেন, বিজ্ঞানীরা কেউ আর মুখ খুললেন না। প্রবীণ অধ্যাপক ফিরকাও ককের এই জীবাণু গজানো আগে কখনও মানেন নি। তিনি পর্যন্ত মাথা হেঁট করে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। কারণ কক তাঁর কাজে কোথাও কোন ফাঁক রাখেন নি। বিপক্ষের সব যুক্তি সব তর্ক আগে থেকে ভেবে নিয়ে তিনি নিজের প্রমাণ দাখিল করেছেন।

এই আবিষ্কারে ককের নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে হৈ চৈ লাগিয়ে দিল। সর্ব দেশে যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধের নতুন নতুন ব্যবস্থা শুরু হল।

১৮৮৩ সালের আগস্ট থেকে ১৮৮৪ সালের মে মাস। এই কটি মাস কক বার্লিনে ছিলেন না। জার্মান কলেরা কমিশনের প্রধান হয়ে তিনি তখন মিশর এবং ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তখন এশিয়াটিক কলেরা ভারতবর্ষ থেকে মিশর এবং শেষে ইওরোপে ভূমধ্যসাগরের পারে মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে। কক প্রথমে মিশর তারপর ভারতবর্ষে এলেন; এই কলকাতা শহরে।

কলকাতায় এসে তিনি কলেরার জীবাণু আবিষ্কার করলেন; রুগীর মৃতদেহে। পানীয় জলে। রুগীর নোংরা কাপড়-চোপড়ে। এই জীবাণু আবিষ্কার করেই তাঁর কাজ শেষ হল না। তিনি এই জীবাণু (কলেরা ভিবরিও) ল্যাবরেটরীতে পর্যন্ত গজিয়ে দেখালেন। এইজন্য প্রুসিআন গভর্নমেণ্ট তাঁকে এক লক্ষ মার্ক পুরস্কার দিল।

এখন থেকে জনস্বাস্থ্য (পাবলিক হেলথ) এবং হাইজীনের নতুন যুগ শুরু হল। কক-এর খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে জীবাণুতত্ত্ব শিখতে ককের কাছে ছাত্ররা এসে ভিড় জমালো। জার্মানীতে ককের নামে নানাবিধ চেয়ার এবং প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হল। কক বার্লিন

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাণুতত্ত্ব এবং হাইজীনের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন ১৮৮৫ সালে।

এইখানে ককের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র ছিলেন জাপানের কিটাসেটো। ইনি ককের কাছে জীবাণুবিদ্যা শিখে জাপানে এসে সর্বপ্রথম ধনুস্টংকার (টিটেনাস) রোগের জীবাণু ল্যাবরেটরীতে চাষ করে গজাতে সক্ষম হন এবং প্লেগের জীবাণু আবিষ্কার করেন।

১৮৯০ সালে জার্মানী থেকে ঘোষণা করা হল, যক্ষ্মারোগের এক প্রতিকার কক আবিষ্কার করেছেন। নাম তার টিউবারকুলিন। এই টিউবারকুলিন দেখতে অনেকটা মধুর মত। যে তরল পদার্থে কক যক্ষ্মারোগের জীবাণু ল্যাবরেটরীতে চাষ করে গজাতে সক্ষম হয়েছেন, তারই নাম টিউবারকুলিন। এই খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। দেশ বিদেশ থেকে রুগীরা এই টিউবারকুলিন নিয়ে আরোগ্য হবার আশায় জার্মানীতে আসতে লাগল। কিন্তু ফল হল ভয়াবহ। টিউবারকুলিন দিয়ে যক্ষ্মারোগ সারাতে কক পারলেন না। বরং মৃত্যু-হার আরও অনেক বেড়ে গেল। ইংলণ্ড থেকে লর্ড লিস্টার তাঁর ভাইঝিকে এই চিকিৎসার জন্য ককের কাছে নিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হল।

ককের মত অত সাবধানী এক বিজ্ঞানী কি করে যে এমন একটি মারাত্মক ভুল করলেন তাই নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। আজ সবাই জানেন, এই আবিষ্কার অমন হুট করে প্রকাশ করবার কোন ইচ্ছে তাঁর ছিল না। আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হতেই কক চেয়েছিলেন। কিন্তু জার্মানীর কাইজার তা দিলেন না। বিজ্ঞানে জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য তিনি ককের এই আবিষ্কার অবিলম্বে প্রকাশ করবার হুকুম দিলেন।

কিন্তু এখনও এই টিউবারকুলিন কাজে লাগে; দেহে যক্ষ্মারোগ সুপ্ত আছে কি নেই তা বোঝার জন্য; বি সি জি দেবার আগে।

১৮৯১ সালে কক প্রমাণ করে দেখালেন, পানীয় জল পরিস্রুত (ফিলট্রেশন) করলে কলেরা টাইফয়েড ইত্যাদি জল-বাহী রোগ প্রতিরোধ করা যায়। সেই থেকে পৃথিবীর সব দেশে পানীয় জল পরিস্রুত করবার রীতি চালু হল।

চিকিৎসাবিদ্যায় কক নোবেল প্রাইজ পেলেন; ১৯০৫ সালে। পরের বছর তাঁকে আফ্রিকায় পাঠানো হল, স্লিপিং সিকনেস কমিশনের অধিনায়ক করে; ১৯০৬ সালে।

রবার্ট কক যদিও খ্যাতি এবং যশের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিলেন তবু তাঁকে শেষ বয়সে পারিবারিক নানাবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। যৌবনের সাথী স্ত্রী এমিকে নিয়ে তিনি সুখী হতে পারেন নি। অবশেষে একদিন তাঁকে পরিত্যাগ করে যখন তিনি সুন্দরী যুবতী হেডভিগ ফ্রাইবের্গকে বিবাহ করলেন, তখন শুধুমাত্র তার নিজের পরিবারেই নয়, সমগ্র জার্মান দেশে প্রতিবাদ এবং নিন্দার সাংঘাতিক এক ঝড় উঠল। পুরনো বন্ধুরা তাঁকে পরিত্যাগ করল। এই ঘটনায় জার্মান গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। ককের জন্মস্থান ক্লাউসথালের অধিবাসীবা জাতীয় গৌরবের যে স্মারকখণ্ড তাঁর জন্মস্থানে একদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থাপন করেছিল এই ঘটনায় নিদারুণ বিদ্বেষ ও অপরিসীম ঘৃণায় তা আবার একদিন উঠিয়ে নিয়ে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখালো জাপান; দ্বিতীয় পক্ষের পরমাসুন্দরী স্ত্রী ফ্রাইবের্গকে নিয়ে যখন কক জাপানে গেলেন ১৯০৮ সালে, তাঁর ভূতপূর্ব ছাত্র কিটাসেটোর অনুরোধে।

এই কিটাসেটো এখনও "জাপানী কক" নামে বিখ্যাত। জাপানী পোশাক পরে মহামান্য কক দেশেব সর্বজনের বরেণ্য হয়ে আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় জয় করে ফেললেন। তাঁর আবিষ্কৃত সব জীবাণুর ছবি দিয়ে নতুন পোস্টকার্ড ছাপান হল। তাঁর মাথার কয়েকগাছি চুল নিয়ে রবার্ট ককের নামে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করে জাপান সমগ্র জাতির আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করল।

শেষ জীবনে এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। জীবনের সর্বশেষ পুরস্কার।

দুই বৎসর পরে হঠাৎ একদিন রবার্ট ককের মৃত্যু হল; হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে। ১৯১০ সালে; মে মাসের ২৭ তারিখে।

ভারতের সার্জেন মেজর

আজকাল ইস্কুলের ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীরাও সবাই জানে মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়। ইস্কুলে যারা যায় না তারাও একথা জানে। অথচ মাত্র ষাট বছর আগেও পৃথিবীতে এ কথা কেউ জানত না। ভারতে তখনকার দিনে মিলিটারী চাকরির নানা বাধার মধ্যে শুধুমাত্র নিজের অধ্যবসায় এবং তিন বছরের একাগ্র চেষ্টার ফলে যিনি একদিন এ তথ্যটি অনেক কষ্টে আবিষ্কার করলেন, সেকেন্দ্রাবাদ মিলিটারী হাসপাতালের অন্ধকার একটি ঘরে, তাঁর নাম রোনালড রস (১৮৫৭—১৯৩২)।

সিপাহী বিদ্রোহের বছরে ভারতের আলমোড়ায় রোনালড রসের জন্ম হয় ১৮৫৭ সালে। তখন তাঁর বাবা ছিলেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সামান্য এক মেজর। পরে তিনিই হন কর্নেল। স্যার ক্যাম্পবেল রস নামে তিনি বিখ্যাত। স্যার ক্যাম্পবেল জাতে স্কটিশ কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইংরেজ।

ইস্কুলে পড়াশুনা করবার জন্য ছেলেবেলায় রসকে বিলেত পাঠানো হয়। পরে লণ্ডনের সেণ্ট বার্থলোমিউ হাসপাতালে তিনি ডাক্তারী ট্রেনিং নেন। গল্প আছে, কলেজ অফ সার্জনের ফাইন্যাল পরীক্ষা তিনি মাত্র তিন দিন পড়ে পাশ করেন। কাজেই ডাক্তারী পরীক্ষায় বিশেষ কোন কৃতিত্ব তিনি দেখাতে পারেন নি। কিন্তু ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস পরীক্ষায় তার স্থান হয় সপ্তদশ।

১৮৮১ সালে ডাক্তারী পাশ করে রস, আই. এম. এস. এ. চাকরি পান মাত্র ২৪ বছর বয়সে। আই. এম. এস. এ. তখন মোট ৬০০ জন মাত্র ডাক্তার। সার্ভিসের দুটি ভাগ। একটি সিভিল, অর্থাৎ সাধারণের জন্যে। আর একটি মিলিটারী; শুধু সৈন্যদের জন্য। রস এই মিলিটারী বিভাগেই কাজ পান।

চাকরির যেমন নিয়ম আজ যদি কোয়েটায়, আগামী মাসে হয়ত বাঙ্গালোরে। সেখান থেকে হয়ত বর্মায়, কিংবা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে।

চাকরির রোজকার ডিউটি শেষ হলে রস কবিতার বই নিয়ে বসতেন। কখনও কখনও হয়ত খেলতেন টেনিস কি বিলিয়ার্ড। কদাচিৎ যেতেন শিকারে।

একদিন অঙ্কের একখানা পাঠ্যপুস্তক নাড়াচাড়া করে খানিকটা পড়ে রস বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন ছাত্রাবস্থায় যে জিনিস কখনও মগজে ঢুকত না, আজ যেন তা জলের মত পরিষ্কার। রস মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অঙ্কের জটিল সব নিয়ম কেমন করে বেরুল, তাই নিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে স্বপ্ন দেখলেন।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যখন রস বদলী হন, তখন কাজের শেষে সমুদ্রের ধারে তিনি ঘুরে বেড়াতেন আর ছিপ দিয়ে মাছ ধরতেন। পূর্বদেশের এই প্রাকৃতিক শোভা, ঘন জঙ্গল, কোরাল পাহাড় এবং সমুদ্রের ঢেউ-এ মেঘ ও রৌদ্রের বিচিত্র খেলা দেখে রসের মনে রঙ লাগল। এই পরিবেশে 'চাইল্ড অফ দি ওশান' নামে বিয়োগান্ত করুণ অথচ উদ্দীপ্ত কামনাপূর্ণ রোমান্টিক এক উপন্যাস তিনি লিখে ফেললেন। এই উপন্যাস তখনকার সমালোচকেরা আর এল স্টিভেনসন এবং রাইডার হ্যাগার্ড-এর লেখার সঙ্গে তুলনা করতেন।

৩১ বৎসর বয়সে রস ছুটি নিয়ে বিলেত গিয়ে বিবাহ করেন। তারপর আবার ভারতবর্ষে ফিরে বাইরনের এক অসমাপ্ত নাটক নিয়ে এপিক ড্রামা অর্থাৎ মহাকাব্য লেখায় হাত দেন। এই কাব্যের নাম 'দি ডিফরমড ট্রান্সফরমড'। কয়েক বছর পরে 'দি একজাইল' নামে রসের এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ছুটিতে আর একবার যখন রস বিলেত যান, তখন 'স্পিরিট অফ দি স্টরম' নামে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও দাসত্ব প্রথা নিয়ে তাঁর রোমান্টিক এক উপন্যাস বেরোয়।

তবু রসের মনে শান্তি ছিল না। আই এম এস-এর চাকরি তখনও পাকা অর্থাৎ পার্মানেণ্ট হয় নি। সমসাময়িক অন্য অনেকে তখন রসের চেয়ে বেশি মাইনে পেত। তাই রসের মনে সুখ ছিল না।

নিজের লেখা স্মৃতি-কথায় তাই রস লিখেছেন, আমি আবার ভারতবর্ষে ফিরে চললাম। স্ত্রী এবং বাচ্চা তিনটি দেশে পড়ে রইল। আমার বয়স এখন ৩৮। বারো বৎসর আই এম এস এ চাকরি করে আমি মাত্র সার্জেন মেজর হতে পেরেছি।

চাকরিতে নিজের আশানুরূপ উন্নতি হল না দেখে রস ভাবলেন, এখন

থেকে ডাক্তারীতেই তাঁকে একটু খেটে দেখতে হবে। লুই পাস্তুর তখনও বেঁচে। সংক্রামক রোগ যে জীবাণুঘটিত তা অনেক আগেই প্রমাণ হয়ে গেছে। রবার্ট কক তখনও নতুন নতুন জীবাণু আবিষ্কার করে চলেছেন। রসের ইচ্ছে হল, তিনি এই জীবাণুতত্ত্ব শিখবেন। ভাবলেন, ভারতবর্ষে এ-জ্ঞান হয়ত তাঁর অনেক কাজে লাগবে।

পৃথিবীতে তখন ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু-হার সব চেয়ে বেশী। অতি প্রাচীন এই রোগ। খ্রীষ্ট জন্মের হাজার বছর আগেও ভারতীয় চিকিৎসকরা এ রোগ দেখেছেন। প্রাচীন গ্রীসেও এ রোগের উল্লেখ আছে হিপোক্রেটিসের লেখায়। তবু সভ্য মানুষ এ রোগের কোন ওষুধই খুঁজে পায় নি ১৬৩০ সালের আগে পর্যন্ত।

সেই সময় কাউণ্টেস অফ সিনকোন ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশের বড়লাট পত্নী। আনা তাঁর ডাকনাম। একদিন তাঁকে এই ম্যালেরিয়ায় ধরল। এমন সাংঘাতিক এই জ্বর যে কিছুতেই আর ছাড়ে না। জানা সব ওষুধ ব্যর্থ হল দেখে কাউণ্টেস আনার চিকিৎসক জুআন-দি-ভেগো অনন্যোপায় হয়ে অবশেষে এক দিশি ওষুধ খাওয়ালেন।

তখন পেরুদেশের বনে-জঙ্গলে কুইনা-কুইনা নামে এক রকমের গাছ প্রচুর পাওয়া যেত। ঐ দেশের আদিম অধিবাসীরা এই গাছের ছাল জলে সেদ্ধ করে অথবা রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে খেত এই জ্বর হলে। তাদের বিশ্বাস এ ওষুধ অতি পুরাতন এবং অব্যর্থ। জ্বর এতে ছাড়বেই।

জুআন-দি-ভেগো যখন দেখলেন জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না, এবং কোন ওষুধেই ধরে না, তখন একদিন কাউণ্টেস আনাকে এই দিশি গুঁড়ো খাওয়ালেন। অমনি জ্বর ছেড়ে গেল।

আনা নিজে আরোগ্য হয়ে এই গুঁড়ো ইওরোপে নিজের আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে পাঠালেন। ইওরোপে তখন খুব ম্যালেরিয়া। এই ওষুধে ঐ জ্বর সেরে গেল দেখে সারা দেশে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল।

জেসুইটরা এই গাছের ছাল ইওরোপে নিয়ে যায় ১৬৩২ সালে। পরে জুআন দি ভেগো নিজে এই গাছ ইওরোপে নিয়ে আসেন। কাউণ্টস অফ সিনকোনের নামে এই গাছের নাম দেওয়া হয় সিনকোনা। দুশ বছর পরে এই সিনকোনা থেকে কুইনিন তৈরি হয় ১৮২০ সালে।

কুইনিন আবিষ্কারের পর ইওরোপ এবং আমেরিকায় ম্যালেরিয়া কমে গেল কিন্তু ভারত ও আফ্রিকায় গেল না।

তখন লুই পাস্তর জীবাণুতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সব রোগই যে জীবাণুঘটিত এমনি একটা ধুয়া উঠেছে। সেই সময় আফ্রিকার আলজেরিয়ায় আলফোঁসে ল্যাভেরাঁ নামে এক আর্মি ডাক্তার ম্যালেরিয়া রুগীর রক্তে এক পরজীবী কীটাণু আবিষ্কার করলেন রক্তের লাল কণিকার মধ্যে, ১৮৮০ সালে। এই কীটাণুর নাম হল, ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট। এজন্য পরে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯০৭ সালে।

তখনকার দিনে এই সব আবিষ্কারের খবর এখনকার মত এত দ্রুত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ত না। সুদীর্ঘ তের বৎসর কেটে গেল, তবু সবাই এ অভিনব খবর জানল না। বিজ্ঞানীরা সবাই এ আবিষ্কার মানলেন না। ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট নিয়ে মতভেদ থেকে গেল।

রোনাল্ড রস ভারতে ফেরবার আগে জীবাণু-তত্ত্ব নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করলেন এবং পড়াশুনা করলেন। লুই পাস্তর রবার্ট কক—এই দুই মহারথীর আবিষ্কার পড়ে এবং ল্যাভের্যার ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট আবিষ্কার দেখে তাঁর মনে একটা খটকা লাগল। তাই তিনি গেলেন একদিন প্যাট্রিক ম্যানসনের বাড়িতে।

এই প্যাট্রিক ম্যানসন তখন এক বিজ্ঞ ডাক্তার এবং প্রবীণ অভিজ্ঞ চিকিৎসক। ট্রপিক্যাল রোগের তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কারক। ফাইলেরিয়া রোগ যে কিউলেকস মশার কামড়ে মানুষের দেহে প্রবেশ করে, তা আবিষ্কার করে তখন তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। চীন দেশের কাছে এময়, ফরমোজা এবং অবশেষে হংকং-এ সারা জীবন কাটিয়ে ফাইলেরিয়ার কারণ আবিষ্কার করে ৪৬ বৎসর বয়সে তিনি অবসর নিয়েছেন এবং বছর তিনেক হল দেশে ফিরে কনসালট্যাণ্ট প্র্যাকটিস শুরু করেছেন।

ম্যানসন দেখলেন, ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের এক ছোকরা ডাক্তার ছুটিতে জীবাণু-তত্ত্ব শিখতে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। নাম তার রোনাল্ড রস। ম্যানসন রসকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি দরকার?

রস বললেন, ল্যাভেরাঁ যে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট আবিষ্কার করেছেন, তা কি সত্যি? ম্যানসন নিজে কি বিশ্বাস করেন ম্যালেরিয়া রোগের কারণ এই প্যারাসাইট? প্রবীণ বিজ্ঞানী ম্যানসন রসের এই কৌতূহলে খুব খুশি হলেন। রসকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, ম্যালেরিয়া রোগ এই প্যারাসাইট

থেকেই হয়। ল্যাভের্যাঁর আবিষ্কার নির্ভুল। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষে অনেক ম্যালেরিয়ার রুগী তুমি পাবে। তাদের রক্ত পরীক্ষা কর। কি করে এ-প্যারাসাইট মানুষের রক্তে আসে, তার কারণ খুঁজে বার কর।

রোনাল্ড রসের জীবনে এ-এক স্মরণীয় দিন। ম্যালেরিয়া রোগ কেন হয়, তার কারণ খুঁজে বার করতে হবে। প্যাট্রিক ম্যানসন এই চিন্তা রসের মনে ঢুকিয়ে দিলেন।

১৮৯৩ সালে ছুটির শেষে রস ভারতে ফিরে এলেন। দেখলেন চাকরিতে থেকে জীবাণু-তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা কঠিন। রক্ত পরীক্ষা করার কোন সুযোগ নেই। পুরো একটি বছর কেটে গেল, রস নিজে পরীক্ষা করে ম্যালেরিয়া রুগীর রক্তে ঐ প্যারাসাইট দেখতে পেলেন না।

এক বছর পরে ১৮৯৪ সালে আবার যখন ছুটিতে তিনি বিলেত গেলেন, ম্যানসন একদিন নিজের মাইক্রোসকোপে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট রসকে দেখালেন চেয়ারিং ক্রশ হাসপাতালে। কেমন করে রুগীর আঙুল ফুটিয়ে স্লাইডে রক্ত নিতে হয়, কি করেই বা তা রঙ (স্টেইন) করে শুকিয়ে নিতে হয়, সব রসকে শিখিয়ে দিলেন। রস ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট এই প্রথম নিজের চোখে দেখলেন ১৮৯৪ সালে, ম্যানসনের হাসপাতালের এই মাইক্রোসকোপে।

ফরাসী আর্মি ডাক্তার ল্যাভের্যাঁ এই ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এই প্যারাসাইট মানুষের রক্তে আসে কি করে? বিজ্ঞ ম্যানসন এবং নবীন শিষ্য রস রোজ এই নিয়ে আলোচনা করতেন। সম্ভব অসম্ভব সব কারণ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা হত।

একদিন দুজনে লণ্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রীট দিয়ে চলেছেন। ম্যালেরিয়ার কারণ নিয়ে কথা হচ্ছে। হঠাৎ ম্যানসন বললেন, কি করে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট মানুষের রক্তে ঢোকে জান? আমার ধারণা, মশার কামড়ে।

ফাইলেরিয়া রোগ যে মশার কামড়ে সংক্রামিত হয় ম্যানসন নিজে তা আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছেন। কাজেই ম্যালেরিয়াও যে ঐভাবেই হয় তা ভাবা ওঁর পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়। তাছাড়া এরকম একটা থিওরী অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। আমেরিকার কিং প্রথম একথা বলেন ১৮৮০ সালে এবং ল্যাভের্যাঁ নিজে তা সমর্থন করেন। কিন্তু রসের কাছে তা নতুন। অভিনব।

ম্যানসন এই এক নতুন বুদ্ধি রসের মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। সত্যি ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া যেমন বেশি, মশাও তেমনি সাংঘাতিক।

. ভারতবর্ষে ফিরে রস এদিকে মন দিলেন। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বিলেত থেকে একটা পোর্টেবেল মাইক্রোসকোপ তৈরি করে রস এবার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ঐ মাইক্রোসকোপ দিয়ে এখন ইচ্ছেমত কাজ করা যাবে এবং যেখানে ইচ্ছে বাইনোকুলারের মত কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

সেকেন্দ্রাবাদ মিলিটারী হাসপাতালে রসের ডিউটি পড়ল। রোজকার ডিউটি শেষ হলে আগে রস কবিতার বই খুলে বসতেন। এখন বসেন মাইক্রোসকোপ নিয়ে; আর ম্যালেরিয়ার রুগী দেখতে পেলেই তার আঙুল ফুটিয়ে রক্ত নেন, কাঁচের স্লাইডে। তারপর ঐ স্লাইড মাইক্রোসকোপে বসিয়ে প্যারাসাইট খোঁজেন।

মশার কামড়ে রুগীর ম্যালেরিয়া হয়। ম্যানসন রসের মনে এ ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাহলে রুগীর রক্তে যে প্যারাসাইট আছে, মশার মধ্যেও তা থাকা উচিত। অতএব মশার দেহ পরীক্ষা করে দেখতে হয়। কিন্তু মশা তিনি ধরবেন কি করে?

রস মশা ধরার এক বুদ্ধি বার করলেন। দেয়ালে মশা বসে। বড় মুখ-ওয়ালা বোতলের খোলা মুখ দিয়ে একদিন হঠাৎ রস ঐ দেয়ালে চেপে ধরলেন। অনেক মশা বোতলে ঢুকে গেল।

মশা তো ধরা হল। এবার একে ম্যালেরিয়া রুগীর গায়ে বসাতে হয়। কিন্তু শুধু শুধু মশার কামড় খাবে কে? আর কেনই বা খাবে?

রস লোভ দেখালেন। বললেন, যে রুগী তাঁর ঐ বোতলের মশার কামড় খেতে রাজী হবে, সে এক আনা করে পয়সা পাবে। এই বুদ্ধিতে ফল হল। মশার কামড় খেতে রাজী রুগী এইবার অনেক পাওয়া গেল।

ম্যালেরিয়া রুগীর গায়ে মশা বসিয়ে সেই মশা মেরে এইবার পরীক্ষা করতে হবে। এ-কাজও বেশ কঠিন। অতটুকু ক্ষুদ্র জীব সামান্য একটু খোঁচাতেই তার দেহ ছিঁড়ে যায়। রস সরু ছুঁচ দিয়ে চিরে মশার পাকস্থলী বার করলেন। তারপর সেই পাকস্থলী ছুঁচ দিয়ে কাঁচের স্লাইডে তুলে ঐ পোর্টেবল মাইক্রোসকোপে বসিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন।

কিন্তু যা খুঁজছিলেন তা তিনি পেলেন না। ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট দেখা গেল না।

অবসর সময়ে কবিতা পড়া আর নভেল লেখা রসের ঘুচে গেল। এখন শুধু মশা আর মশা। ম্যালেরিয়া রুগীর রক্ত আর মাইক্রোসকোপ। এই নিয়ে রসের দিন কাটতে লাগল।

নিজের পরীক্ষার ফল রস ম্যানসনকে চিঠি লিখে জানাতেন। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংশয়-ভয়-ব্যর্থতার কথা লিখে পরামর্শ চাইতেন। উত্তরে ম্যানসন উৎসাহ দিতেন। পরামর্শ দিতেন। পরীক্ষার ভুল ধরিয়ে দিতেন। নতুন পথে গবেষণা চালাবার বুদ্ধি দিতেন।

একটা চিঠিতে ম্যানসন লিখলেন, মানুষের এবং অন্য সব জীবজন্তুর মধ্যে যেমন পৃথক পৃথক শ্রেণী আছে, মশারও তেমনি নানা জাতি আছে; শ্রেণী আছে। এই আলাদা আলাদা শ্রেণী ঠিক ঠিক চেনা চাই। নির্দিষ্ট করা চাই। মশার কোন বিশেষ জাত নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়ার কারণ এবং বাহক; যেমন একটি জাত ফাইলেরিয়ার।

এতদিন রস মশাকে শুধু মশা বলেই দেখেছেন। বিভিন্ন রঙের মশা যে আবার বিভিন্ন জাতির হতে পারে, তা কখনও ভাবেন নি। কোনো একটা বিশেষ জাতের মশা যে ম্যালেরিয়ার কারণ হতে পারে তা কখনও মনে হয় নি। ম্যানসন রসের মনে নতুন এক চিন্তাধারা খুলে দিলেন।

রস বিভিন্ন রং-এর মশা আলাদা আলাদা বোতলে রাখলেন। বোতলে মশার ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাতে শিখলেন। দেখলেন, এক জাতের ডিম থেকে অন্য জাতের মশা হয় না।

এইবার রস ইচ্ছেমত এক জাতের মশা ম্যালেরিয়া রুগীর গায়ে বসাতে সমর্থ হলেন। সেই মশার কি পরিবর্তন হয়, মাইক্রোসকোপে তা পরীক্ষা শুরু হল।

রস ভাবলেন, ম্যালেরিয়ার কারণ সমাধানের ঠিক রাস্তাটি এইবার তিনি ধরেছেন। কিন্তু এই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলা রসের ভাগ্যে ঘটল না। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত উপর থেকে বদলীর হুকুম এল। এক্ষুণি তাঁকে বাঙ্গালোরে যেতে হবে। সেখানে এপিডেমিক লেগেছে কলেরার। বাঙ্গালোরে গিয়ে রসকে তা বন্ধ করতে হবে।

ঠিক এই সময়ে সেকেন্দ্রাবাদ ছেড়ে যাওয়া মানেই ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধান বন্ধ রাখা। কিন্তু কেন? আই এম এস-এ কি আর কোন ডাক্তার নেই? আর কেউ কি বাঙ্গালোরে যেতে পারে না?

সার্ভিসের উপরওয়ালার কাছে রস আবেদন করলেন, সেকেন্দ্রবাদেই তাঁকে রাখা হোক, ম্যালেরিয়ার গবেষণার জন্য ; স্পেশাল ডিউটিতে।

কিন্তু সে আবেদন গ্রাহ্য হল না। উত্তর এল, রসের বাঙ্গালোরের সহকর্মী ছুটি পেয়েছেন রেস খেলার জন্য। অতএব রসকে তাঁর জায়গাতেই যেতে হবে এবং কর্তব্য পালন যদি তিনি করতে চান তাহলে তাঁকে এমনি করেই করতে হবে অবিলম্বে।

ম্যালেরিয়ার এই গবেষণার জন্য চাকরিতে উন্নতির অনেক সুযোগ রস হারিয়েছেন। অন্যেরা তাঁকে ডিঙিয়ে প্রমোশন পেয়ে গেছে। এতদিন সব রস সহ্য করেছেন। কিন্তু আর না। ভাবলেন, দেবেন এই চাকরি ছেড়ে তারপর চলে যাবেন বিলেতে।

মনে মনে এই সঙ্কল্প নিয়ে রস বাঙ্গালোর গেলেন। সেখান থেকে বদলী হলেন উটকামণ্ডে। এইখানে এসে রসের এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এক জায়গায় মাত্র নয় ঘণ্টা কাটিয়ে রসের একদিন কেঁপে জ্বর এল। ম্যালেরিয়ায় ধরল।

ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে কি পচা পুকুরে স্নান করে ম্যালেরিয়া হয় এতদিন তাই লোকের ধারণা ছিল। নিজে তিনি ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগান নি। বাইরে কোথাও স্নানও করেন নি। তবু কেন তাঁর ম্যালেরিয়া হল ? কি করে এই ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট তাঁর দেহে ঢুকল ?

যে জায়গায় মাত্র নয় ঘণ্টা কাটিয়ে রস এই রোগটি বাধিয়েছেন, সেখানে যেমন ম্যালেরিয়া তেমনি মশা। রসের অনুসন্ধিৎসু মন আবার ঐ মশার দিকে ঝুঁকল।

রস সুস্থ হয়ে উঠে ডিউটি সেরে আবার সেকেন্দ্রাবাদ ফিরলেন, জুন মাসে ; ১৮৯৭ সালে। ভাবলেন, চাকরি ছাড়বার আগে আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন।

তখন অসহ্য গরম। বর্ষার কোন লক্ষণ নেই। রস আবার গবেষণার কাজে লাগলেন, নিজের সেই বাইনোকুলারের মত ঝোলানো মাইক্রোসকোপ নিয়ে। সেকেন্দ্রাবাদ হাসপাতালের ছোট্ট একটি অন্ধকার ঘরে চলল তাঁর একক সাধনা।

বাইরে তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে। রস দরদর করে ঘামছেন। ঘামে মাইক্রোসকোপের স্ক্রুতে মরচে ধরেছে। লেনস ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

তবু পাঙ্খাওয়ালাকে পাখা চালাতে বলবার উপায় তাঁর নেই। পাখা চললে পরীক্ষার জন্য টেবিলে রাখা মশা সব উড়ে যাবে।

রস এমনি করে কাজ করে চললেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। অসহ্য গরমে, বিনা পাখায়।

বোতলে ডিম থেকে মশার বাচ্চা ফুটে বেরোচ্ছে। এক এক জাতের মশা, ভিন্ন ভিন্ন বোতলে রাখা আছে। প্রতিটি বোতলে আলাদা লেবেল দেওয়া হয়েছে।

সেদিন ২০শে আগস্ট। ১৮৯৭ সাল। আকাশে মেঘ জমেছে। সারাদিন বৃষ্টি হয় নি। প্রচণ্ড গরম। অসম্ভব গুমোট। রস ঐ অন্ধকার ছোট্ট ল্যাবরেটরীর ঘরে ঢুকলেন।

দেখলেন একটা বোতলে গুটিকয়েক মশা ডিম থেকে ফুটে বেরিয়েছে। ডানায় তাদের ছিট ছিট দাগ। এ-জাতের মশা আগে কখনও রস দেখেন নি। রোজকার মত এদের তিনি ম্যালেরিয়া রুগীর গায়ে বসালেন। মশার কামড় খাওয়ার জন্য প্রতিটি রুগী বরাদ্দমত এক আনা করে পয়সা নিল।

এই মশা মেরে ছুঁচ দিয়ে চিরে রস স্লাইড তৈরি করলেন। তারপর মাইক্রোসকোপ নিয়ে বসলেন। এই একই কাজ রোজ করে করে এখন একঘেয়ে হয়ে গেছে। বিরক্তি ধরে গেছে। এ-কাজ আর রসের ভাল লাগছে না। মাইক্রোসকোপ দেখলেই মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে।

তবু রস মাইক্রোসকোপ নিয়ে বসলেন ঐ অন্ধকার ঘরে। অসহ্য গুমোটে আবার গা ঘেমে উঠল। চোখে মুখে চুলে কীটপতঙ্গ মাছি এসে বসল। মনে বিরক্তি নিয়ে রস মাইক্রোসকোপে মশার স্লাইড চাপালেন। পর পর কয়েক-খানা দেখলেন। নতুন কিছুই নজরে পড়ল না। আর একখানা মাত্র বাকি। এইটি হলেই আজকের মত এই আলো-বাতাসহীন বন্ধ ঘরের দুর্ভোগ তাঁর শেষ।

স্লাইডখানা চাপিয়ে রস মাইক্রোসকোপে নিজের শ্রান্ত চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি হানলেন। কিন্তু এ কি? মশার পাকস্থলীতে আজ নতুন এ কি দেখা যাচ্ছে; এ-জিনিস তো আগে কখনও তিনি দেখেন নি?

রস বলেছেন, তখনই মনে হল ভাগ্য দেবতা বুঝি খুশী হয়ে আমার মাথায় হাত দিলেন। আশীর্বাদ করলেন।

রস দেখলেন, মশার পাকস্থলীর দেয়ালের কোষের মধ্যে কালো গুঁড়োর

মত কি যেন ছড়ানো রয়েছে। মানুষের রক্তের লাল কণিকার মধ্যে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট ভেঙে ঠিক যেমন হয়। কণ্ট্রোলের মধ্যে অর্থাৎ যে মশা ম্যালেরিয়া রুগীর রক্ত খায় নি তার পাকস্থলীতে এ জিনিস নেই। কাজেই কালো রঙের গুঁড়োর সঙ্গে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ আছে। সবচেয়ে বড় কথা এই জিনিস মশার পাকস্থলীতে হজম হয়ে না গিয়ে পাকস্থলীর দেয়াল ভেদ করে কোষে কোষে ছড়িয়ে রয়েছে।

রস নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এলেন। চা খেয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমুলেন। মশার পাকস্থলীর দেয়ালে ঐ কালো জিনিস কি? ঘুমের মধ্যে রসের অবচেতন মন এই সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়াল।

হঠাৎ রসের ঘুম ভেঙে গেল। দু হাজার বছর আগে গ্রীক গণিতবিদ আর্কিমিডিস যেমন 'ইউরেকা' বলে লাফিয়ে উঠেছিলেন রস তেমনি 'পেয়েছি' বলে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর ছুটে ঐ অন্ধকার ছোট্ট ল্যাবরেটরী ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

পাকস্থলীর দেয়ালের কোষের মধ্যে কালো গুঁড়ো মানুষের রক্তেরই রূপান্তর। অন্য কিছু নয়। রুগীর দেহ থেকে মশা রক্ত শোষণ করেছে। সেই রক্তে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট আছে। এই প্যারাসাইট মশার পাকস্থলীর দেয়াল ভেদ করে দেয়ালের অভ্যন্তরে কোষে কোষে ছড়িয়ে গেছে।

রসের মনে হল, ম্যালেরিয়ার রহস্য তিনি সমাধান করেছেন।

মনের আবেগে নোট বই বার করে তিনি খসখস করে লিখে ফেললেন সেই বিখ্যাত কবিতা, আজও যা খোদাইকরা আছে তাঁর মূর্তির নীচে।

This day relenting God
Hath placed within my hand
A wondrous thing ; and God
Be praised. At his command
I have found thy secret deeds
Oh million murdering death,
I know this little thing
A million men will save—
Oh death where is thy sting ?
Thy victory, Oh grave ?

অর্থাৎ ভগবান কৃপা করে আমার হাতে আজ অদ্ভুত এক জিনিস দিয়েছেন। জয় হোক সেই বিধাতার। তাঁরই নির্দেশে হে মৃত্যু তোমার গুপ্ত রহস্য আমি খুঁজে পেয়েছি। অতি ক্ষুদ্র এই বস্তু থেকেই আমি জানি লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণ রক্ষা হবে। হে মৃত্যু তোমার দংশন এখন কোথায়? কোন কবরে তোমার এখন বিজয়?

কিন্তু ম্যালেরিয়ার কারণ এবং বাহক যে সত্যি এক বিশেষ জাতের মশা তা প্রমাণ করা অত সহজ ব্যাপার নয়।

ম্যালেরিয়া রুগীর রক্তে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট থাকে। ল্যাভেরাঁ তা আবিষ্কার করেছেন। ডানায় ছিট ছিট দাগওয়ালা এক বিশেষ জাতের মশা, পরে যার নাম হয়েছে, এনোফিলিস, রুগীর দেহ থেকে রক্তের সঙ্গে এই প্যারাসাইট চুষে নেয়। এই প্যারাসাইট মশার পাকস্থলীর দেয়ালের কোষে কোষে প্রবেশ করে।

এই পর্যন্ত রস আবিষ্কার করেছেন সেকেন্দ্রাবাদ মিলিটারী হাসপাতালের ছোট্ট একটি অন্ধকার ঘরে।

এখন প্রমাণ করা চাই মশার পাকস্থলীর দেয়াল থেকে এই প্যারাসাইট কোথায় যায় এবং কি করেই বা এই প্যারাসাইট মশার কামড়ে সুস্থ লোকের দেহে ঢোকে।

রস সেকেন্দ্রাবাদে যতটুকু আবিষ্কার করেছেন তা নিয়ে এক প্রবন্ধ লিখলেন। মশার ভিতর তিনি যে পরিবর্তন দেখেছেন ছবি এঁকে তা বোঝালেন। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হল, ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে।

রস ভাবলেন দু এক মাসের মধ্যেই ম্যালেরিয়া এবং মশার বাকি রহস্য তিনি ভেদ করবেন অনায়াসে। কিন্তু চাকরিতে থেকে নিজের ইচ্ছে মত কাজ কে কবে করতে পারে? কার ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটে? তখনও যেমন তা হত না, এখনও তেমনি সে ভাগ্য কারু হয় না।

একদিন হঠাৎ হেড কোয়ার্টার সিমলা থেকে রসের বদলীর অর্ডার এল। রসকে এক্ষুনি সেকেন্দ্রাবাদ ছাড়তে হবে। মধ্য ভারতে কোন এক উপজাতি নাকি খুব গোলমাল শুরু করেছে। সৈন্য পাঠিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করতে হবে। আর রসকে যেতে হবে সেই সঙ্গে। কাজেই বছর দুই-এর মধ্যে রস আর ফিরতে পারবেন না।

ম্যালেরিয়ার গবেষণা পড়ে রইল। রস মধ্যভারতে বদলী হয়ে এলেন। এসে দেখেন, ডাক্তারী করবার এখানে কোনো সুযোগ নেই। প্রচণ্ড শীত। তাঁর বোতলের মশা পর্যন্ত কাউকে কামড়াতে চায় না। চার মাসের মধ্যে জ্বরের রুগী একটিও রস পেলেন না।

রস বুঝলেন, আর্মির বড়কর্তাদের ম্যালেরিয়ার এ গবেষণা ভাল লাগে নি। সামান্য একটা মশা নিয়ে একজন সৈনিক ডাক্তারের এত হৈ-চৈ তাঁদের পছন্দ হয়নি। তাই তাঁকে একটু শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং ইচ্ছে করেই বদলী করা হয়েছে এই নির্জন ম্যালেরিয়াবিহীন জায়গায়।

এমনি সময় বিলেত থেকে প্যাট্রিক ম্যানসনের এক চিঠি এল সেকেন্দ্রাবাদ ঘুরে অনেক দেরী করে।

চিঠিতে ম্যানসন রসের আবিষ্কারে উৎফুল্ল হয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং আশা করে আছেন, ম্যালেরিয়ার বাকি রহস্যটুকু নিশ্চয়ই এতদিনে সমাধান হয়ে গেছে।

রস তখন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান আর ছিপ দিয়ে মাছ মেরে আলসেমি করে সময় কাটান। চার মাসের মধ্যে একদিনও মাইক্রোসকোপ তিনি খোলেন নি। মনে মনে এবার সঙ্কল্প করেছেন আই এম এস-এর চাকরি তিনি সত্যি সত্যি এবার ছেড়ে দেবেন।

বিলেতে বসে ম্যানসন এ-খবর পেলেন। রসের চাকরি ছাড়বার হুমকি ভারতের কর্তারা কেউ গ্রাহ্য করলেন না, ম্যানসন কিন্তু বিচলিত হলেন। ম্যানসনের তখন মস্ত নাম। বিশাল তাঁর প্রতিপত্তি। আই এম এস-এর লণ্ডনের বড়কর্তার কানে একদিন কী মন্ত্র যে দিলেন, হঠাৎ এক গভর্নমেণ্ট কেব্‌ল বিলেত থেকে ভারতে এল। দেখা গেল, রসকে ছ-মাসের জন্য স্বাধীনভাবে ম্যালেরিয়া গবেষণার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, স্পেশাল ডিউটিতে।

এই স্পেশাল ডিউটিতে রস কলকাতা এলেন। ১৮৯৮ সালে। সেকেন্দ্রবাদের আবিষ্কারের ছ-মাস পরে।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে রসের গবেষণার জন্য এখন একটা আলাদা ল্যাবরেটরী। মশা জন্মাবার জন্য ছোট্ট একটা ডোবা। সাহায্য করবার জন্য দুজন সহকারী। রস দেখলেন, সে এক এলাহি কারবার।

রসের মনে খুব গর্ব হল। ভাবলেন, এতদিনে কর্তারা বুঝি তাঁর কাজের গুরুত্ব বুঝেছেন। রস আবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন।

এইবার রস ম্যালেরিয়া রুগী এবং মশা ছাড়া কাক, চড়ুই এবং পায়রা নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। এদের রক্তে রস ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের অনুরূপ এক প্যারাসাইট দেখতে পেলেন। ভাবলেন এই প্যারাসাইটের কী পরিবর্তন হয় লক্ষ্য করলে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের ক্রমবিকাশও হয়ত বোঝা সহজ হবে।

রসের এখন এক চিন্তা। এক কাজ। সহকারী দুজন ছোট জাল দিয়ে মশা ধরে এনে বোতলে পুরে রাখে। পায়রা, কাক চড়ুই-এর খাঁচায় জল দেয়। খাবার দেয়। তদ্বির করে।

কাজ করে এখন অনেক সুখ। অনেক আরাম। রস তন্ময় হয়ে গেলেন। অবশেষে একদিন তাঁর গবেষণা শেষ হল। ১৮৯৮ সালে। জুলাই মাসে।

রস দেখলেন, ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট মশার পাকস্থলীতে গিয়ে হজম না হয়ে পাকস্থলীর দেয়াল ভেদ করে কোষে এসে বাসা নেয়। সেখান থেকে শুরু হয় বিচিত্র এক ক্রমবিকাশ। অনেক রকম রূপ পরিবর্তন করে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট অবশেষে মশার লালাগ্রন্থিতে আসে। সেখান থেকে হুলে গিয়ে ঢোকে। এই হুলের দংশনে ম্যালেরিয়া হয়।

সেকেন্দ্রাবাদ হাসপাতালে রস ডানায় ছিট ছিট দাগওয়ালা মশার (অ্যানোফিলিস) পাকস্থলীর দেয়ালে প্রথম ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট দেখেন ২০শে আগস্ট ১৮৯৭ সালে। সেই প্যারাসাইট কি করে মশার হুলে আসে তা আবিষ্কার করেন কলকাতায়, পাখির ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের ক্রমবিকাশ অনুসরণ করে, ১৮৯৮ সালে।

গবেষণার এই শেষ পর্যায়ে সর্বশেষটুকু প্রমাণ করবার আগেই রস ম্যানসনকে লেখেন, কি চমৎকার এই আবিষ্কার! আবেগে উচ্ছ্বাসিত হয়ে মুক্ত কণ্ঠে আজ আমি আপনার প্রশংসা করছি। কারণ এ আবিষ্কার আসলে আপনার। আমার নয়। এক এক সময় মনে হয় সমগ্র রোগ-বিজ্ঞানের মধ্যে প্যারাসাইটের এই ক্রমবিকাশের মত সুন্দর প্রকাশ আর বুঝি কিছু নেই। অথচ দেখুন কত সরল। কত সাধারণ।

ম্যালেরিয়া রহস্য সমাধান করে রস বিস্তারিত বিবরণ ম্যানসনকে টেলিগ্রাম করে জানালেন। ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কনফারেন্স সেবার এডিনবরায় বসেছে। প্যাটিক ম্যানসন কনফারেন্সে যাবার জন্য

প্রস্তুত হয়েছেন। এমনি সময় রসের এই টেলিগ্রাম এল। কনফারেন্সে গিয়ে ম্যানসন ম্যালেরিয়া রহস্যের চূড়ান্ত সমাধানের কথা প্রকাশ করলেন। রসের লিখিত বিবরণ, মাইক্রোসকোপের স্লাইড, আঁকা ছবি এবং সর্বশেষের ঐ টেলিগ্রাম দেখে কনফারেন্সে হুলুস্থুল পড়ে গেল।

রস বললেন, ম্যালেরিয়া দূর করতে হলে মশা মারতে হবে এবং মশা যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। কি কি করলে এ-কাজ সম্ভব তারও এক পরিকল্পনা করলেন। বিলেতে অ্যামেরিকায় তাঁর খুব প্রশংসা হল। ব্রিটিশ কলোনিয়াল আপিস ম্যানসনের নিজের তত্ত্বাবধানে ম্যালেরিয়া নিবারণী একটি দল আফ্রিকা পাঠাবেন ভাবলেন। রস নিজে কি করেছেন, তা দেখবার জন্য বিলেত থেকে একজন ডাক্তারকে কলকাতায় পাঠানো হল। কিন্তু কলকাতার কর্তারা রসকে সামান্য একটু বাহবা দিয়ে আর এগুলেন না। রসের কাজে কোনো সাহায্য কি স্বাধীনতা অথবা কোনো সুযোগ কিছুই তাঁরা দিলেন না। রসের গবেষণার যে কোনো মূল্য আছে, কর্তাদের ভাবে তা বোঝা গেল না। অনেক লেখা-লেখির পর কাক পায়রা ও চড়ুই-এর উপর রসের গবেষণার ফল প্রকাশ করবার অনুমতি পাওয়া গেল।

ভারত গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত চুপ করে রইলেন। না দিলেন রসকে কোনো ধন্যবাদ, না দিলেন কোনো খেতাব। গভর্নমেণ্টের কাছে কোনো সম্মান রস পেলেন না। রসের কোনো পরামর্শ গভর্নমেণ্ট নিলেন না। এমন কি, কাজের বেলায় যেন জেদের বশে রসের সব সুপারিশের বিরোধিতা শুরু করলেন।

রসের মনে হল, ভারত গভর্নমেণ্টের তাঁকে আর কোনো প্রয়োজন নেই। ক্ষোভে দুঃখে মর্মাহত হয়ে রস চাকরি ছেড়ে পেনসন নিলেন। গভর্নমেণ্টের কাছে তিনি যেন আবর্জনার সামিল, এই ক্ষোভ মনে নিয়ে রোনাল্ড রস ভারত ছেড়ে চলে গেলেন। এর পর মাইক্রোসকোপ নিয়ে কঠিন অথবা মূল্যবান কোনো কাজ জীবনে আর কখনও তিনি করেন নি।

রস যখন কলকাতায় কাক পায়রা চড়ুই এবং মশা নিয়ে গবেষণায় মত্ত তখন রবার্ট কক একদিন ইতালীতে এলেন ম্যালেরিয়ার কারণ অন্বেষণে। সারা ইওরোপে তখন ইতালীতেই খুব বেশী ম্যালেরিয়া।

সেই সময় জিওভানি ব্যাতিসতা গ্রাসি ছিলেন রোমের প্রাণী-বিদ্যার অধ্যাপক। যদিও তিনি পাস করা ডাক্তার, তবু রোগীর চিকিৎসা না করে তিনি প্রাণী-বিদ্যার গবেষণা করতেন।

ইতালীতে তখন যেমন ছিল ম্যালেরিয়া তেমনি ছিল মশা। কিছুদিন এই মশা নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছিলেন। কিন্তু কোনো ফল পান নি।

এখন রবার্ট ককের মতো জীবাণুতত্ত্বের এত বড় একজন দিকপালকে ম্যালেরিয়ার কারণ খুঁজতে ইতালীতে আসতে দেখে গ্রাসির আবার এদিকে ঝোঁক হল।

অনেকদিন আগে থেকেই গ্রাসি দেখেছেন, যেখানে ম্যালেরিয়া সেখানেই এক রকমের মশা থাকে ডানায় যার ছিট ছিট দাগ ইতালীতে তার নাম জানজারোনি।

গ্রাসি রবার্ট ককের সঙ্গে একদিন দেখা করে বললেন, তাঁর ধারণা এই জানজারানি মশাই ম্যালেরিয়ার বাহন।

প্রমাণ ছাড়া গ্রাসির মাত্র আন্দাজ এবং এই ধারণা রবার্ট কক অনায়াসে অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিলেন। এমন কি গ্রাসিকে উৎসাহ দেওয়া তো দূরের কথা বরং বেশ একটু বিদ্রূপই প্রকাশ পেল তাঁর কথায়। তাইতেই গ্রাসির রোখ চেপে গেল। গ্রাসি ঠিক করলেন এ তথ্য নিজেই তিনি দেখাবেন প্রমাণ করে।

গ্রাসি দেখেছেন, ইতালীর সব জায়গাতেই ম্যালেরিয়া হয় না। এমন জায়গা অনেক আছে যেখানে খুবই মশা কিন্তু ম্যালেরিয়া নেই। কিন্তু মশা নেই অথচ ম্যালেরিয়া আছে এমন কোনও জায়গা গ্রাসি দেখেন নি।

ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে গ্রাসি দেখলেন, জানজারোনি মশা ছাড়াও এসব জায়গায় অন্য দুরকমের মশা আছে। এই তিন রকমের মশা বোতলে পুরে তিনি একদিন রোমে ফিরে এলেন।

রোমে তখন ম্যালেরিয়া নেই। এই জানজারোনিও নেই। এইখানে তিনি এমন একটি লোক খুঁজে পেলেন যাঁর জীবনে কখনও ম্যালেরিয়া হয়নি এবং গত দু বছর ধরে যিনি জানা একজন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আছেন। তাঁর নাম মিঃ শোলা। স্বাস্থ্যও তাঁর খুব ভাল। গ্রাসির পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মশার কামড় খেতে এই মিঃ শোলা একদিন রাজী হলেন।

একমাস ধরে রাত্রে বাতি নিভিয়ে মিঃ শোলার বিছানায় রোজ গ্রাসি জানজারোনি ছাড়া অন্য দু রকমের মশা ছেড়ে দেখলেন তাতে তাঁর জ্বর হয় না।

কাজেই একদিন তিনি রোমের বাইরে ম্যালেরিয়া রুগীর বাড়ি থেকে

বোতলে করে কয়েকটি আনজারোনি মশা ধরে নিয়ে এলেন। এই মশার কামড় খেয়ে দশ দিনের মধ্যেই মিঃ শোলার কম্প দিয়ে জ্বর এল এবং রক্তে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট পাওয়া গেল। অতএব গ্রাসিই মানুষের দেহে মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া ঘটাতে সর্বপ্রথম সমর্থ হলেন।

এই সময় রোনাল্ড রস কাক পায়রা চড়ুই এবং ম্যালেরিয়া মশার গবেষণার ফল প্রকাশ করেছেন। গ্রাসি একদিন এই খবর পড়ে ভাবলেন, মানুষের ম্যালেরিয়ার কারণ রস কিছুই প্রমাণ করেন নি। তিনি শুধুই দেখিয়েছেন পাখির ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের ক্রমবিকাশ। কাজেই মানুষের দেহে যে মশা এই রোগের সৃষ্টি করে তার ক্রমবিকাশ যে পাখির ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের মতই হবে তার প্রমাণ কি? এই ভেবে গ্রাসি আনজারোনি নিয়ে কাজ শুরু করলেন।

মাইক্রোসকোপে এই মশার পাকস্থলীর দেয়ালে গ্রাসি ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট পেলেন, ঠিক যেমন রোনাল্ড রস পেয়েছিলেন ২০শে আগস্ট ১৮৯৭ সালে সেকেন্দ্রবাদ হাসপাতালে। তার চেয়েও আশ্চর্য, ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের যে ক্রমবিকাশ রস বর্ণনা করেছেন মশার দেহে পক্ষি ম্যালেরিয়ায়, গ্রাসিও মানুষের ম্যালেরিয়া মশায় ঠিক সেই একই ক্রমবিকাশ দেখতে পেলেন। দেখলেন রসের বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ঠিক ঐ রকম করেই ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট আনাজারোনি মশার পাকস্থলী থেকে লালাগ্রন্থিতে যায় এবং সেখান থেকে হুলে। এই হুলের দংশনেই মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট ঢোকে।

মানুষের দেহে মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া সংক্রমিত করে একদিকে যেমন গ্রাসি রসের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব দাবি করলেন, তেমনি আবার নিজের দেশ থেকে এ রোগ কি করে উচ্ছেদ করা যায় তারও এক উপায় বার করে নিজে পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিলেন।

১৯০০ সালে ইতালীর কামপাগনায় সব চেয়ে ভীষণ ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এক গ্রামে গিয়ে গ্রাসি কয়েকটি বাড়ির দরজা জানালায় মিহি জাল লাগিয়ে দিলেন। তারপর এই বাড়ির সবাইকে সন্ধ্যার পর ঘরের বাইরে আসা বন্ধ করলেন। কারণ সন্ধ্যার পরেই মশা বেরোয় মানুষের রক্ত খেতে। সেবার গ্রীষ্মে ঐ কটি বাড়িতে ম্যালেরিয়া হল মাত্র দুটি একটির। কিন্তু অন্য সব বাড়িতে হল আগের মতই বাড়ি সুদ্ধ সবাইকার।

কাজেই ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের কার্যকরী এই দৃষ্টান্ত তিনিই সর্বপ্রথম দেখান। কিন্তু ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কারের কৃতিত্ব আসলে রসের। তাঁরই নির্দিষ্ট পথে গবেষণা করে গ্রাসি রসের পরীক্ষিত তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করেছেন মাত্র। ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের আবিষ্কারক আলফোঁসে ল্যাভের‍্যাঁ এবং রবার্ট কক দুজনে একমত হয়ে এই কথা ঘোষণা করেন গ্রাসি এবং রসের সব আবিষ্কার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে।

তাই রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসা বিদ্যার নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯০২ সালে।

তখন রস লিভারপুল ট্রপিক্যাল স্কুলের শিক্ষক। আই. এম. এস-এর চাকরি ছেড়ে ইংলণ্ডে এসেই রস এই কাজটি পান ১৮৯৯ সালে; বার্ষিক ২৫০ পাউণ্ড পারিশ্রমিকে।

রসে ভেবেছিলেন এইবার বুঝি তিনি তাঁর মনোমত এক কাজ পেয়ে গেলেন। তাঁরই নির্দেশমত বুঝি এবার হাসপাতালে চিকিৎসা হবে। কিন্তু সে ভুল তাঁর ভাঙল লিভারপুলে এসেই। স্পষ্ট করেই তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল, তাঁর কাজ শুধু লেকচার দেওয়া। হাসপাতালের চিকিৎসার ভার সেখানকার চিকিৎসকদের।

অতি সামান্য এই কাজ। মাত্র গুটিকযেক ছাত্র। রস লেকচার দিতেন, ছাত্রদের মাইক্রোসকোপ নিয়ে কাজ করা শেখাতেন, প্রচার পুস্তিকা রচনা করতেন। তবু তাঁর কাজ অতি অল্প সময়েই শেষ হয়ে যেত। ম্যালেরিয়া মশাও যেমন তিনি পেতেন না, তেমনি পাওয়া যেত না এই প্যারাসাইট দোকানের কোন খাঁচার পাখির রক্তে। তাঁর মনে হত, এর চেয়ে আফ্রিকায় গিয়ে ম্যালেরিয়ার কাজ করাও বুঝি অনেক ভাল ছিল।

লিভারপুলে কাজ নেবার আগেই তিনি একবার পশ্চিম আফ্রিকার ফ্রি টাউনে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট পান। পক্ষী ম্যালেরিয়ায় যে তথ্য তিনি কলকাতায় দেখেছিলেন, মানুষের প্যারাসাইটেরও ঠিক সেই একই রকম ক্রমবিকাশ এইখানে এসে তিনি এই প্রথম মিলিয়ে দেখতে সক্ষম হলেন।

তারপর এই মশা কোথায় কোথায় জন্মায় সেইসব ডোবা খুঁজে বার করে কেরোসিন ছড়িয়ে তা ধ্বংস করবার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে ফেললেন।

সুয়েজ খাল যখন তৈরী হয় তখন ফরাসী এন্‌জিনিয়ার এবং দেশী শ্রমিকদের জন্য ইসলামিয়াতে নতুন শহরের পত্তন হয়। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন

রাস্তা, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবু সেখানে তখন সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া। কুইনিন খাইয়ে এবং দূরের খাল ডোবার সংস্কার করেও যখন ম্যালেরিয়া রোধ করা গেল না তখন কর্তারা ভাবলেন ইসলামিয়া পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও শহর পত্তন করা ছাড়া আর বুঝি এখন উপায় নেই। এমনি সময় রোনাল্ড রস একদিন ওখানে গেলেন। ইসলামিয়ায় তখন মাত্র সাত হাজার লোক, কিন্তু ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হত বছরে দু হাজার।

রস গিয়ে দেখলেন শহর খুবই পরিষ্কার। ধারে কাছে কোথাও পচা ডোবা নেই। কিন্তু রাত্রে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আসে। দিনের বেলায় এরা থাকে কোথায় ?

বাড়িগুলি সবই আধুনিক কায়দায় তৈরী। বাড়ির নোংরা জল পাইপ দিয়ে মাটির নীচে একটা ঢাকা গর্তে গিয়ে পড়ে, তার সঙ্গে থাকে হাওয়া চলাচলের একটা পাইপ। এক একটি এই গর্তে রস হাজার হাজার মশার বাচ্চা পেলেন। সবে তারা ডিম ফুটে বেরিয়েছে। এখনও পাখা গজায়নি কারু।

এইবার সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। হাওয়া চলাচলের পাইপ দিয়ে প্রতিটি গর্ত থেকে রোজ হাজার হাজার মশা আসে। রস এইসব গর্তে কেরোসিন ছড়িয়ে মশা মারবার ব্যবস্থা করলেন। নিয়ম করা হল প্রতি সপ্তাহে এমনি করে কেরোসিন ছড়াতে হবে প্রতিটি গর্তে। এই উপায়ে কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামিয়া শহরে ম্যালেরিয়া বন্ধ হয়ে গেল।

এই ধরনের কাজই রস ভালবাসতেন। কিন্তু তখনকার দিনে ম্যালেরিয়া নিবারণের গুরুত্ব বোঝবার মত লোক কেউ ছিল না। তাই তাঁকে লিভারপুলেই পড়ে থাকতে হয়েছে সামান্য ঐ শিক্ষকতা করে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ; সামান্য ঐ পারিশ্রমিকে।

১৯১১ সালে রসকে নাইটহুডের সম্মানে ভূষিত করা হল। তখন রস লিভারপুল ছেড়ে লণ্ডনে এলেন, কনসালট্যান্ট প্র্যাকটিস করবেন বলে, ১৯১২ সালে। কিন্তু এডওয়ার্ড জেনারের মত তাঁরও প্র্যাকটিস কিছু জমলো না।

নোবেল পুরস্কার এবং নাইটহুডের সম্মান পেয়েও রস সব সময়ে আক্ষেপ করতেন তাঁর উপযুক্ত কাজ তিনি পান নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে মশা ধ্বংস করে ম্যালেরিয়া নিবারণের কোনো চেষ্টাই গভর্নমেণ্ট করেন নি, তাঁর এত চেষ্টা সত্ত্বেও।

১৯২৩ সালে রস রয়াল ইনসটিটিউট এবং ট্রপিক্যাল হাসপাতালের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। পরে যখন তাঁর সম্মানের জন্য নতুন রস ইনস্টিটিউট তৈরী হয় ১৯২৬ সালে তিনি হন তাঁর ডাইরেক্টার।

এত সম্মান পাওয়া সত্ত্বেও শেষ বয়সটা তাঁর অর্থকষ্টে কেটেছে। কারণ তাঁর ঝোঁক ছিল মৌলিক গবেষণায়। তাই তাঁর আবিষ্কারে বহু লোক লাখপতি হয়েছে, কিন্তু তিনি কাটিয়েছেন অর্থকষ্টে।

তাঁর কবিতা তখনকার সভাকবি জন মেসিফিল্ডএর সুখ্যাতি পেয়েছে। তাঁর রচিত গান গির্জায় গাওয়া হয়েছে। উপন্যাসের কদর হয়েছে।

এত বিভিন্ন রকমের সাফল্য একটা জীবনে কারুর কখনও হয় না। তবু রসের অভিযোগ ছিল, জীবনটা তাঁর বৃথাই গেল।

অঙ্ক শাস্ত্র নিয়ে মৌলিক গবেষণাতেও তাঁর সুনাম হয়েছে। তিনি শব্দের ওপর ঝোঁক দিয়ে নতুন এক ইংরেজি বানান পদ্ধতির প্রবর্তন করেন এবং সেই ভাষায় কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি শর্টহ্যাণ্ডের নতুন একটি পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেছিলেন।

কিন্তু তবু তিনি নিজের এই বহুমুখী কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। সর্বদাই অভিযোগ করেছেন, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থাই হচ্ছে না। ইচ্ছে হলে সবাই যা অনায়াসে পারে।

আজকাল পৃথিবীতে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। ভারত গভর্নমেণ্টও সম্প্রতি এমনি একটি বিরাট পরিকল্পনা করেছেন। কাজেই আশা হয়, পৃথিবীতে ম্যালেরিয়া আর হবে না এবং রোনাল্ড রসের স্বপ্ন সফল হবে।

১৯৩২ সালে স্যার রোনাল্ড রসের মৃত্যু হয়, ৭৫ বৎসর বয়সে।

ম্যাজিক গুলি

রামধনু যখন আকাশে ওঠে, ছেলেমেয়েরা ছুটে বাইরে আসে। আনন্দে হাততালি দেয়। প্রকৃতির এই অপূর্ব শোভা দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়। আদিমকাল থেকে রঙের এই বিচিত্র খেলা মানুষের মন রাঙিয়েছে। কবিচিত্তে কল্পনার জোয়ার এনেছে। এমন কি, রসকসহীন ডাক্তারের কাঠখোট্টা মনও এই রঙের ছোঁয়াচ থেকে রেহাই পায়নি।

এই রঙে পাগল হয়ে জার্মানীর এক ইহুদী ডাক্তার ভাবলেন, জীবদেহে যেমন রঙ লাগে জীবাণুও তেমনি রাঙা হয়। অতএব জীবদেহে এই রঙ ঢুকিয়ে দেহটাকে বাঁচিয়ে শুধু ঐ জীবাণুই কি রাঙানো যায় না? এই রঙ দিয়েই কি দেহের সব জীবাণু ধ্বংস করা যায় না?

রামধনুর রঙ নিয়ে তাই তিনি মেতে উঠলেন। রঙের এই মজার খেলায় পাগল হয়ে একদিন সত্যি এক জীবাণুধ্বংসী রঙ আবিষ্কার করে গোটা রোগ-সারানো বিদ্যাটাই যিনি হঠাৎ ওলোটপালট করে ফেললেন তাঁর নাম পল আরলিক। (১৮৫৪-১৯১৫)।

পূর্ব জার্মানীর সাইলেসিয়া প্রদেশের অন্তর্গত ছোট্ট স্ট্রেশেন শহরে আরলিকের জন্ম। ১৮৫৪ সালের মার্চ মাসে। বাবা সামান্য এক সরাইখানার মালিক। জাতে ইহুদী।

তখন জার্মানীতে হাজারো রকমের জৈব রসায়নের যৌগিক দ্রব্য (অরগ্যানিক কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড) আলকাতরা থেকে বার করে নতুন নতুন রঙের বিরাট বিরাট কারখানা তৈরী হচ্ছে। কৃষিজাত নীল, হলুদ অথবা লাল রঙের বদলে নতুন এই রসায়নঘটিত (সিনথেটিক) রঙের চালু হয়েছে। জার্মানী সারা পৃথিবীর বাজার একচেটিয়া করে ফেলেছে।

ছেলেবেলা থেকেই আরলিক এই রঙ নিয়ে খেলতেন। বই-খাতায় কালি ঢালতেন। জামা, কাপড়, তোয়ালে কি বিলিয়ার্ড টেবিল কিছুই তিনি বাদ দিতেন না। যেখানে সেখানে রঙ ঢেলে বাপ-মাকে জ্বালাতেন।

ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেও আরলিকের এই স্বভাব কিছুমাত্র বদলাল না। নিয়মিত ক্লাসে তিনি যেতেন না। রসায়নের ক্লাসটি সবচেয়ে বেশী কামাই করতেন। অন্য সব ছেলেদের মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে কাজ করা তার ধাতে সইত না। রঙ নিয়ে তিনি যা খুশি তাই করতেন। ডেস্কের ওপর বিচিত্র সব রঙ ফেলে এমন পাকা দাগ লাগিয়ে রাখতেন, যে কেউ তা ওঠাতে পারত না। বহুকাল পরে এক অধ্যাপক আরলিকের এই পুরনো ডেস্ক দেখে অপর একটি অধ্যাপককে লিখেছিলেন, আরলিকের কাজের চিহ্ন সত্যি অক্ষয়। কারু সাধ্য নেই, এই অক্ষয় চিহ্ন মুছে ফেলে।

এই ডেস্ক দেখিয়েই অধ্যাপকরা একদিন রবার্ট কককে বলেছিলেন, ছেলেটা রঙ লাগাতে খুব ওস্তাদ। কিন্তু পরীক্ষায় কখনও পাশ হবে না।

ডাক্তারী শিখতে হলে শব-ব্যবচ্ছেদ করতে হয়। দেহের বিভিন্ন মাংসপেশী, শিরাধমনী ইত্যাদির নাম মুখস্ত করতে হয়। কিন্তু এই গতানুগতিক পথে না গিয়ে আরলিক মৃতদেহের একটি অংশ কেটে রঙ লাগাতেন। দেখতেন, কোন্ রঙ কোথায় ধরে।

কাজেই পরীক্ষায় তিনি ফেল করলেন। এক বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভরতি হলেন। এমনি করে ব্রেস্‌লাউ, স্টারসবুর্গ ও লাইপজিগ এই তিনটি ইউনিভার্সিটি পেরিয়ে তিনি একদিন শিক্ষকদের তাক লাগিয়ে ডাক্তারী ডিগ্রী পেয়ে গেলেন। ১৮৭৮ সালে।

কিন্তু ডাক্তার হয়েও রুগীর চিকিৎসার দিকে তাঁর মন ফিরল না। রামধনুর ঐ রঙ তাঁকে যেন পাগল করে ফেলল। বার্লিনের দাতব্য চিকিৎসালয়ের সহকারী ডাক্তারের কাজ পেয়েও আরলিক শুধু ঐ রঙ নিয়েই মেতে রইলেন।

তখন জীবাণুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। রবার্ট কক অ্যানথ্রাকস জীবাণু আবিষ্কার করে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। জার্মানীর বিজ্ঞানী কার্ল ভাইগার্ট সর্বপ্রথম এই জীবাণু রঙ করে (স্টেইন) দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। আরলিক এই দাতব্য হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখলেন, দেহের বিভিন্ন অংশে রঙ লাগালে যেমন তা রাঙা হয়, তার ভিতরে জীবাণু থাকলে তারাও তেমনি রঙিন হয়।

এতদিন লুই পাস্তুর প্রমুখ জীবাণুবিদরা রঙ ছাড়াই জীবাণু দেখেছেন। বিনা রঙে জীবাণুর প্রকৃতি অনুশীলন করেছেন। এই দুঃসাধ্য কাজ আরলিকের পদ্ধতিতে রঙ লাগিয়ে এখন অনেক বেশী সহজ হয়ে গেল।

রবার্ট কক যক্ষ্মা জীবাণু আবিষ্কার করলেন। ১৮৮২ সালে। তখনও কক এই জীবাণুতে রঙ ধরাতে পারেন নি। কথিত আছে, আরলিক একদিন এই জীবাণু দেখতে গেলেন। যে স্লাইডে এই জীবাণু ছিল, তার ওপর তাঁর নতুন রঙ মেথিলিন ব্লু খানিকটা ঢেলে স্লাইডখানা ঠাণ্ডা স্টোভের ওপর সরিয়ে রাখলেন। পরদিন ভোরবেলা ঝি এসে অভ্যাসমত স্টোভে আগুন দিয়ে চলে

প্রকাশ্য রাস্তায় বারবণিতা

গেল। আরলিক এসে দেখলেন, স্লাইডখানা গরমে তেতে উঠেছে। মাইক্রোসকোপে চড়িয়ে দেখলেন, ককের আবিষ্কৃত যক্ষ্মা জীবাণু সব নীল রঙে রঙিন হয়ে জ্বলজ্বল করছে।

সেই থেকে আরলিক রবার্ট ককের প্রিয় হয়ে গেলেন এবং বার্লিনে ছোঁয়াচে রোগের রবার্ট কক ইনস্টিটিউটে কাজ পেলেন।

এইখানে তখন ডাঃ এমিল ফন-বেরিং ডিপথেরিয়ার প্রতিষেধক অ্যান্টিটক্সিন

তৈরী করবার এক উপায় বার করেছেন। আরলিক কিছুদিন এই কাজে তাঁকে সাহায্য করলেন। প্রথম প্রথম যে অ্যান্টিটক্সিন তৈরী হত তা এত বেশী দুর্বল ছিল যে, রোগ সারানো কিংবা প্রতিরোধ কিছুই তাতে হত না। আরলিক এক উপায় বার করে এর জোর পঞ্চাশ ষাট গুণ বাড়িয়ে দিলেন। এই অ্যান্টিটক্সিন এখনও ডিপথেরিয়ার প্রতিরোধক এবং আরোগ্যকারক। অথচ এই কাজের কৃতিত্ব আরলিক কিছুই পেলেন না।

যক্ষ্মারোগের জীবাণু রঙ ধরাতে গিয়ে একদিন আরলিক নিজেই ঐ সাংঘাতিক রোগ বাধিয়ে বসলেন। ১৮৮৮ সালে। মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে। তখন এই ক্ষয়রোগের একমাত্র চিকিৎসা ছিল হাওয়া পরিবর্তন। ইওরোপের লোক মিশরে যেত। সূর্যের প্রখর আলোয় এ রোগ ধ্বংস হয় বলে সবাই তখন বিশ্বাস করত। মিশরে গিয়ে নেপোলিঅনের এ রোগ সেরেছিল। আরলিকও তাই মিশরে এলেন। দুবৎসর পরে সুস্থ হয়ে জার্মানীতে ফিরলেন। ১৮৯০ সালে। রবার্ট কক তখন যক্ষ্মারোগ আরোগ্যকারী টিউবারকুলিন আবিষ্কার করেছেন। আরলিকের দেহে এই সাংঘাতিক জিনিস কক ফুঁড়ে দিলেন। তবু কি আশ্চর্য আরলিকের দেহে স্তিমিত এই ক্ষয়রোগ জলে উঠে মৃত্যু ঘটাল না। আরলিক দিব্বি বেঁচে রইলেন।

আরলিক বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। ১৮৯০ সালে। কিন্তু যেহেতু তিনি জাতে ইহুদী, সেই হেতু এই পদের উপযুক্ত মর্যাদা তাঁকে দেওয়া হল না।

কিছুদিন পরে প্রুসিয়ান সরকার বার্লিনের উপকণ্ঠে স্টেগলিজ শহরে ছোট্ট একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার তৈরী করলেন। এইখানে এসে আরলিক সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে বড় গবেষণার সুযোগ পেলেন। এই গবেষণাগারের নাম প্রুসিয়ান ইনস্টিটিউট ফর সিরাম টেস্টিং। আরলিক হলেন তার ডাইরেক্টার। ১৮৯৬ সালে।

এই গবেষণাগারের দুটি মাত্র ঘর। একটিতে আগে ছিল রুটি তৈরীর কারখানা। অপরটিতে ছিল আস্তাবল। এই দুটি অন্ধকার ঘরে পায়চারি করতে করতে আরলিক ভাবতেন জীবাণু থেকে দেহে যে বিষ উৎপন্ন হয় (টকসিন) নিশ্চয়ই তার পরিমাপ আছে। ঠিক যেমন ভেষজ বিষের থাকে। অতএব এরাও সব অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম মানতে বাধ্য। জীবাণু থেকে কতখানি বিষ উৎপন্ন হলে কতটুকু তার প্রতিষেধক (অ্যান্টিটকসিন) প্রয়োজন নিশ্চয়ই

তার মাপ আছে। অতএব আরলিক বিলিতী ইঁদুরের ওপর এই জীবাণুর বিষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন।

বার্লিনের রবার্ট কক ইনষ্টিটিউটে যখন আরলিক কাজ করতেন ১৮৯০ সালে, তখনও তাঁর মাথায় এইরকম আজগুবি সব কল্পনা আসত। এইসব উদ্ভট উদ্ভট তথ্য প্রমাণের জন্য তিনি উঠে-পড়ে লাগতেন। সাদা ইঁদুর বিলিতী ইঁদুর খরগোশ ইত্যাদির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে.খামোখা সব প্রাণী বিনষ্ট করতেন। আগে যেখানে একটা মাত্র ইঁদুর নষ্ট হত আরলিক সেখানে পঞ্চাশটি ইঁদুর বিনষ্ট করতেন।

রবার্ট কক পরীক্ষার ফল জানতে চাইলে উচ্ছ্বসিত হয়ে আরলিক বকবক করে তাঁর তথ্য বোঝাতে শুরু করতেন।

কক কিছুক্ষণ চুপ করে আরলিকের বক্তৃতা শুনে যখন বলতেন, কিন্তু তুমি কি বলতে চাইছ কিছুই তো ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না ?

আরলিক তাতে লজ্জিত হওয়া তো দূরের কথা যেন লাফিয়ে উঠে বলতেন, এখুনি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি স্যার।

এই বলে হাঁটু গেড়ে বসে খড়ি দিয়ে তিনি মেঝের ওপর ছবি আঁকতেন। ফরমুলা লিখতেন। এই উদ্ভট ফরমুলা কিন্তু আরলিক ছাড়া আর কেউ কিছু বুঝত না।

আরলিক বোঝাতে চাইতেন, দেহের বিভিন্ন কোষে এমন কোনো বস্তু আছে, যা বিশেষ একটি রাসায়নিক দ্রব্যকেই শুধু আকর্ষণ করে। অন্য দ্রব্য বর্জন করে। ঠিক যেমন বিশেষ একটি রঙ বিশিষ্ট একটি সুতোয় ভালভাবে আঁকড়ায় কিন্তু অন্য সুতোয় ধরে না। অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরে জীবন্ত একটি কোষ যেন বিশিষ্ট এক রাসায়নিক দ্রব্যকেই শুধু ভালবাসে। তাই তাকে টেনে আনে। আঁকড়ে ধরে। অন্য সব জিনিস ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে দেয়। কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

জীবদেহের এই যে বৈশিষ্ট্য, বস্তু বিশেষের প্রতি ভালবাসা অথবা ঘৃণা তাই থেকেই দেহে বিষ থেকে বিষের প্রতিষেধক উৎপন্ন হয়। টক্সিন থেকে অ্যান্টিটক্সিনের সৃষ্টি হয়।

এই তথ্য আরলিক সব্বাইকে বোঝাতে চাইতেন। কিন্তু কেউ তা বুঝত না। শুনে সবাই হাসত। ঠাট্টা করত। কিন্তু আরলিক তা গায়ে মাখতেন না। অনর্গল বকবক করে তবু সবাইকে বোঝাতে চাইতেন।

ডাক্তারদের কনফারেন্সে আরলিক যখন এই তথ্য নিয়ে বক্তৃতা করতেন, ডাক্তাররা সব ঠাট্টা করে হেসে উঠতেন। খবরের কাগজে তাঁর নামে ব্যঙ্গ কার্টুন ছাপা হত, 'আজগুবি ডাক্তার' (ডকটার ফ্যানটাসাস) নাম দিয়ে। তা দেখেও আরলিক দমতেন না। বলতেন, লোকগুলির লজ্জাশরম কিছু নেই। নিজেরা কিচ্ছু বোঝে না, অথচ যে বোঝে তাকে আবার ঠাট্টা করে।

আরলিকের স্বভাব ছিল আমুদে। সব্বাইর সঙ্গে তিনি হাসি-ঠাট্টা করতেন। নিজে রোজ পঁচিশটা করে হাভানা সিগার খেতেন। সিগারের ছাই অনবরত তাঁর জামা-কাপড়ে ঝরে পড়ত। আরলিক তা দেখেও কিছু গ্রাহ্য করতেন না।

পদমর্যাদার গাম্ভীর্য বলে কোন জিনিস আরলিক কখনও মানতেন না। অনায়াসে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে তিনি একসঙ্গে বসে বীয়ার খেতেন। এমন কি তাঁর গবেষণাগারের বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্যের সঙ্গে প্রকাশ্য পানশালায় বসে বীয়ার খেতেও তিনি কোনো দ্বিধা কিংবা লজ্জা বোধ করিতেন না।

তাই ধনী-গরীব সবাই তাঁকে ভালবাসত। সহকর্মী ডাক্তাররা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেও লোকে ভাবত আরলিক সত্যি একজন অসাধারণ লোক, পণ্ডিত এবং জ্ঞানী। কাজেই যখন আরলিক স্টেগলিজের ঐ ছোট্ট ল্যাবোরেটরী ধনী ইহুদীপ্রধান ফ্রাঙ্কফুরটে উঠিয়ে আনবার পরামর্শ দিলেন, কেউ তাতে বাধা দিল না। ফ্রাঙ্কফুরট-আম-মাইনের এই বিরাট গবেষণাগারের নাম হল, দি রয়আল প্রুসিয়ান ইনস্টিটিউট ফর এক্সপেরিমেণ্টাল থেরাপি। আরলিক এখানে উঠে এলেন ১৮৯৯ সালে।

সারা পৃথিবীতে শুধু এক জার্মানীতেই তখন অত বড় একটি পরীক্ষাগার। অন্য কোনও দেশে এর পরিকল্পনা পর্যন্ত তখন কারু মাথায় আসে নি। আরলিক হলেন তার সর্বেসর্বা। যেমন বিরাট এই গবেষণাগার, তেমনি বিপুল তার তহবিল। আর তেমনি তার সব আধুনিক যন্ত্রপাতি।

আরলিকের মাথায় যেসব উদ্ভট কল্পনা আসত সুযোগ্য সহকারীরা তা সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখত। এবং তার ফলাফল আরলিককে জানাত। আরব্য উপন্যাসের বাদশার মত আরলিক শুধু হুকুম দিতেন, আর ক্রীতদাসের মত সহকারীরা সে হুকুম তামিল করত। কোনও প্রশ্ন করত না।

এই অদ্ভুত পরিবেশে আরলিকের প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে।

তাঁর আগে যাঁরা গবেষণা করে বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করেছেন, তাঁরা সবাই কাজ করেছেন দারিদ্র্যের মধ্যে। দৈন্যের মধ্যে। কারু কাছে কোনো সাহায্য না পেয়ে। নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়।

কিন্তু আরলিক তা করেন নি। অভাবের মধ্যে দৈন্যের মধ্যে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়নি। সুবৃহৎ এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা বিরাট এক ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার যেমন করে কাজ চালান, আরলিক ঠিক তেমনি করে তাঁর সহকারীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করেছেন এবং নিজের গবেষণা চালিয়েছেন।

এই বিরাট গবেষণাগারের একটি কোণে তাঁর ছোট্ট একখানা কালির মত নিজস্ব ঘর ছিল। বসবার জন্য একখানা সোফাও ছিল। কিন্তু এই সোফায় কেউ কখনও কাউকে বসতে দেখে নি। কারণ ঐ সোফায় আরলিক পৃথিবীর যাবতীয় রাসায়নিক পত্রিকা চাপিয়ে রাখতেন। স্তূপীকৃত এই পত্রিকা থেকে দরকারমত একখানা টেনে নিয়ে সর্বদা তিনি নতুন তথ্য খুঁজতেন। সোফায় বসা তো দূরের কথা, তিল ধারণের একটু জায়গাও আর তাতে থাকত না। এই ঘরের দেয়ালের গায় তেমনি সব দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং পুস্তিকা ঘাড়ের সমান উঁচু স্তূপ হয়ে পড়ে থাকত। কোথায় কে নতুন কি রাসয়নিক যৌগিক পদার্থ (কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড) আবিষ্কার করল, অথবা পুরনো কোন পদার্থের কি পরিবর্তন হল সব আরলিক খবর রাখতেন এবং নিজের গবেষণায় কাজে লাগাতেন।

পাশের ঘরে তাঁর নিজস্ব ল্যাবেরেটরীর তাকে নানা রঙের সব রাসায়নিক দ্রব্য বোতলে সাজানো থাকত। আর থাকত কিছু টেস্ট টিউব এবং গ্যাসের একটি বুনসেন বার্নার। এক রঙের ওষুধ টেস্ট টিউবে ঢেলে অন্য একটা মিশিয়ে গরম করে ব্লটিং পেপারে ঢেলে আরলিক তার রঙের পরিবর্তন দেখতেন। এক একটা ওষুধের কি কি পরিবর্তন হয়, তা লক্ষ্য করতেন। কিন্তু কি করে যে তাঁর মাথায় গবেষণার উদ্ভট সব কল্পনা আসত কেউ তা বুঝত না।

রোজ সকালে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে আরলিক এই গবেষণাগারে আসতেন। গাড়ি ভরতি একরাশ কাগজপত্র, পকেট ভরতি সব বৈজ্ঞানিক পুস্তিকা এবং লম্বা বড় এক বাক্স ভরতি টাটকা কড়া হাভানা সিগার। এই সিগার ছাড়া আরলিক একটি মুহূর্তও স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না। রোজ সকালে

দোকান থেকে তাঁর বাড়িতে এই টাটকা সিগার আসত। দৈবাৎ কোনদিন না এলে আরলিক ক্ষেপে উঠতেন। তক্ষুনি লোক দিয়ে দোকানে জরুরী খবর পাঠাতেন। সাইকেলে করে যখন দোকান থেকে লোক এসে সিগার দিয়ে যেত, তখনই শুধু তিনি শান্ত হতেন। সিগারের ধোঁয়ায় তাঁর মাথা খুলত। ক্লান্তি দূর হত। নতুন নতুন কল্পনা রূপ নিত।

গবেষণাগারে পৌছে গাড়ি থেকে সিগারের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আরলিক হাঁক দিতেন, কাদেরাইৎ, কাদেরাইৎ, শিগগির খনিজ-জল (মিনারেল ওয়াটার) নিয়ে আয়। এই হাঁক-ডাক আর কড়া সিগারের গন্ধ থেকে সবাই বুঝত আরলিক এসেছেন।

কাদেরাইৎ আরলিকের পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য। ডাক শুনেই খনিজ-জল নিয়ে এগিয়ে আসত। ভোরবেলা এই কাদেরাইৎ আরলিকের চিঠিপত্র এবং ডাকে-আসা বৈজ্ঞানিক পুস্তিকা সব আরলিকের বাসায় পৌছে দিয়ে এসেছে। আরলিক প্রাতরাশ খেতে খেতে এইসব কাগজ পড়েছেন। আর কাদেরাইৎ ইতিমধ্যে গবেষণাগারে এসে কর্মচারীদের হাতে আরলিকের লেখা সেইদিনকার কাজের নির্দেশ পৌছে দিয়েছে।

প্রতিদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিকল্পনা আরলিক আগের দিন রাত্রে করে রাখতেন। বিভিন্ন রঙের কার্ডে রঙবেরঙের পেন্সিল দিয়ে আরলিকের নির্দেশ লেখা থাকত। লাল, নীল, সবুজ রঙের দাগ থেকে সহকারীরা বুঝত, কোন কাজ কত বেশী জরুরী। আরলিকের পকেটে সর্বদা রঙীন ছোট ছোট পেন্সিল সরু করে কাটা থাকত। দরকার মত তাই দিয়ে দাগ কেটে তিনি সহকারীদের সব বুঝিয়ে দিতেন।

ফ্রাঙ্কফুরটের এই গবেষণাগারে সাত বৎসর ধরে আরলিক হাজারো রকমের রঙ জীবদেহে ঢুকিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু পরশ-পাথরের মত সেই ম্যাজিকগুলি যা শুধু জীবাণুই ধ্বংস করবে অথচ জীবদেহের কোনো ক্ষতি করবে না, তা তিনি পেলেন না।

তখন ১৯০৬ সাল। ধনী এক ব্যাঙ্কারের বিধবা ভদ্রমহিলা, মিসেস ফ্রানজিসকা স্পেআর, আরলিকের গবেষণার জন্য প্রচুর টাকা দিয়ে বিরাট এক গবেষণাগার তৈরী করে দিলেন। এই গবেষণাগারের নাম হল জর্জ স্পেআর হাউস। এইখানে আরলিক নিজের ইচ্ছে মত যা খুশি তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সুযোগ পেলেন। কারু কাছে তাঁর কাজের জন্য কোনো

জবাবদিহি করবার আর কোনো প্রয়োজন থাকল না। এইখানে এসেই আরলিকের ভাগ্য হঠাৎ একদিন খুলে গেল।

আরসেনিক অর্থাৎ সেঁকো বিষ খনিজ একটি ধাতু। প্রাচীনকাল থেকেই খুনীর কাছে মহামূল্য একটি অস্ত্র। এই একটি বিষ দিয়ে পৃথিবীতে যত বেশী হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে তেমন আর অন্য কোনো বিষ দিয়ে হয়নি। এই

নব বধূ ও মৃত্যু

আরসেনিকের একটি কম্পাউণ্ডের (যৌগিক পদার্থ) নাম অ্যাটকসিল। অ্যাটকসিল শব্দের মানে নির্বিষ। অর্থাৎ যদিও এটার মধ্যে আরসেনিক আছে তবু এতে কোনো বিষ নেই।

এই অ্যাটকসিল আফ্রিকার স্লিপিং সিকনেস রোগে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখা গেছে, রোগের প্রকোপ অনেকটা কমে বটে কিন্তু একেবারে সারে না। রবার্ট কক যখন স্লিপিং সিকনেস কমিশনের অধ্যক্ষ হয়ে আফ্রিকা ঘুরে আসেন, তিনিও এই অ্যাটকসিল ব্যবহার অনুমোদন করেন।

কিন্তু শুধু এই অ্যাটকসিলের জন্যই অনেকে অন্ধ হয়ে গেছে। অনেকের মৃত্যু হয়েছে।

আরলিক এই অ্যাটকসিল নিয়ে কাজ শুরু করলেন। নিজের ছোট্ট ঐ ফালির মতো ল্যাবরেটরী ঘরে ঢুকে, টেস্ট টিউবে এই অ্যাটকসিল নিয়ে তার মধ্যে অন্য সব রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে গরম করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। একদিন তাঁর মনে হল, এই অ্যাটকসিলও সামান্য একটু পরিবর্তন করা সম্ভব। এবং এই পরিবর্তিত অ্যাটকসিল সত্যই নির্বিষ।

আরলিক ছুটে তাঁর প্রধান কেমিস্টের কাছে গিয়ে বললেন, আমি দেখেছি এই অ্যাটকসিল বদলানো যায়। ইচ্ছে করলে এই থেকে আমরা আরসেনিকের হাজার হাজার কম্পাউণ্ড তৈরী করতে পারি। অতএব ভাই বার্থাইম, কাল থেকেই কাজ শুরু করা যাক।

সেই থেকে দু বৎসর ধরে আরলিকের গবেষণাগারে এই অ্যাটকসিল ভাঙা শুরু হল। অন্য সব কাজ ফেলে সব্বাই এই কাজে ঝুঁকে পড়ল।

অ্যাটকসিল থেকে ৬০০ রকমের আলাদা আলাদা আরসেনিকের কম্পাউণ্ড তৈরী হল। একটি কম্পাউণ্ড তৈরী হয়, আর স্লিপিং সিকনেসে আক্রান্ত ইঁদুরের ওপর তা পরীক্ষা করা হয়। এমনি করে ৬০০ বিভিন্ন কম্পাউণ্ড যখন ইঁদুরের ওপর প্রয়োগ করা হল, দেখা গেল, রোগের জীবাণু যদিও এতে ধ্বংস হয় কিন্তু ইঁদুর তারপর আর বাঁচে না। হয় রক্ত জল হয়ে যায়, নয়তো সাংঘাতিক জনডিস হয়। যে দু একটি ইঁদুর রক্ষা পায় তারা আবার পাগল হয়ে সারাদিন খাঁচার মধ্যে নাচে। অথবা নিজের চারদিকে গোল হয়ে ঘোরে।

কাজেই আরসেনিকের এইসব কম্পাউণ্ড অকেজো বলে বর্জন করা হল।

১৯০৫ সালে ভিএনার এক বিজ্ঞানী ফ্রিজ শডিন, এবং চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ এরিক হফম্যান বার্লিনের সেণ্ট্রাল হেলথ ডিপার্টমেণ্টে সিফিলিস নিয়ে কাজ করে হঠাৎ ঘোষণা করলেন, উপদংশ (সিফিলিস) রোগ জীবাণু-ঘটিত; এই সাংঘাতিক রোগ ইওরোপে প্রথম যায় কলম্বসের নাবিকদের সঙ্গে। ক্যারিবিআন দ্বীপের অধিবাসিদের সংসর্গে এসে।

তারপর চার শ বছর ধরে এই রোগ ইওরোপে ছড়িয়েছে। এমন কি, বিবাহের পরেই নববধূর দেহে এ রোগ ঢুকেছে। কিন্তু কেউ বোঝে নি এটা জীবাণুঘটিত। বলা হয়েছে, এ রোগ পাপের ফল। তাই প্রকাশ্য রাস্তায় পুলিস বারবণিতাদের ধরে লাঞ্ছিত করেছে।

কিন্তু এই প্রথম লোকে জানল, এই সাংঘাতিক রোগ পাপের ফল নয়। জীবাণুঘটিত। এই জীবাণু অনেকটা রূপোর সরু তারে তৈরী একটা কর্ক স্ক্রুর মতো দেখতে। নাম তার স্পাইরোকিট।

আরলিক ভাবলেন, অন্য সব জীবাণুর মতো সিফিলিসের এই জীবাণুতেও নিশ্চয় রঙ ধরবে। ম্যাজিক গুলি দিয়ে তাকে আক্রমণ করা যাবে। কিন্তু কোথায় সে গুলি?

সিফিলিসের এই জীবাণু এবং স্লিপিং সিকনেসের জীবাণু উভয়ের প্রকৃতির মধ্যে অনেক মিল। কাজেই একটির ওষুধ অপরটিতে লাগতে পারে। আরলিকের মনে পড়ল অ্যাটকসিলের কথা এবং তার ছ-শ বিভিন্ন কম্পাউণ্ডের কথা।

সেই সময় রবার্ট ককের শিষ্য কিটাসেটো জাপানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কর্ণধার। টোকিও ইম্পিরিয়াল ইউনিভারসিটিতে চিকিৎসা ফ্যাকালটির তিনি তখন সর্বপ্রধান কর্তা। জাপান থেকে ভাল ভাল ছাত্র বেছে তিনি জার্মানীতে পাঠাতেন।

ডাঃ হাটা এইরকম একটি কৃতী ছাত্র। জাপানে অনেকদিন সিফিলিস নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিটাসেটো এই হাটাকে আরলিকের কাছে পাঠালেন। আরলিক তাঁকে আবার ঐ আরসেনিকের কম্পাউণ্ড নিয়ে পরীক্ষার কাজে লাগালেন।

হাটা ধীর স্থির ধৈর্যশীল অধ্যবসায়ী গবেষক। আরসেনিকের বিভিন্ন সব কম্পাউণ্ড নিয়ে একে একে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। খরগোশের দেহে সিফিলিস রোগ সংক্রামিত করে এইসব কম্পাউণ্ড ইনজেকশন দিতে লাগলেন। কিন্তু কোনো সুফল হল না। এমনি করে ছ-শ কম্পাউণ্ড পরীক্ষা করা হল। শেষে হঠাৎ একদিন দেখা গেল, ৬০৬নং কম্পাউণ্ড-এ যেন কাজ হচ্ছে। খরগোশের দেহে সিফিলিস রোগ প্রতিহত হয়েছে। মনে হল, যেন ঐ সাংঘাতিক রোগ আরোগ্য হয়েছে।

আরলিক হাটার পরীক্ষার ফল বিচার করে দেখে নিজেও খুব খুশী হলেন। নিঃসন্দেহ হলেন। তাঁর মনে পড়ল, বছর দুই আগে তাঁর এক অযোগ্য সহকারী এই ৬০৬নং কম্পাউণ্ড নিয়ে কাজ করত, তারপর সে কাজ ছেড়ে চলে যায়। তারই ভুলে এই কম্পাউণ্ডটি এতদিন অকেজো বলে বাতিল করা হয়েছে

এখন থেকে এই ৬০৬ নিয়ে আরলিক মেতে উঠলেন। শত শত প্রাণীর ওপর এর পরীক্ষা শুরু হল। আরলিক দেখলেন, মাত্র একটা ইনজেকশনের পরেই খরগোশের দেহে সিফিলিসের ক্ষতে একটি জীবাণুও আর পাওয়া যায় না। ঘা শুকোতে শুরু করে।

কাজেই কিছুদিন পর আরলিক লিখলেন, এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, যথেষ্ট পরিমাণ ৬০৬ যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে একটিমাত্র ইনজেকশনেই সিফিলিসের সব জীবাণু তৎক্ষণাৎ সমূলে বিনষ্ট করা যায়।

কিন্তু আরসেনিক অতি সাংঘাতিক একটি বিষ। মানুষের দেহে সামান্য একটু ইনজেকশন করাও অতিশয় বিপজ্জনক এক ব্যাপার। কে বলতে পারে এই সামান্য বিষই প্রতিটি ইনজেকশনের পর ধীরে ধীরে দেহে সঞ্চিত হয়ে একদিন মৃত্যু ঘটবে না? কে তার দায়িত্ব নেবে?

বিজ্ঞানীরা বা চিকিৎসকরা এ দায়িত্ব নিতে পারেন না। কিন্তু রুগীরা অনায়াসে পারে। চারিদিক থেকে রুগীদের দাবী উঠল, এই নতুন আবিষ্কার কাজে লাগানো হোক। ইনজেকশন দেওয়া হোক।

আরলিকের বন্ধু ডাঃ কোনরাড অলট এক রুগীকে এই ইনজেকশন দিয়ে খুব ভাল ফল পেলেন। সেই থেকে আরও অনেকে।

এইসব রিপোর্ট সংগ্রহ করে আরলিক একদিন তাঁর আবিষ্কার প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, ১৯১০ সালে। ভাইসবাদেনের জার্মান মেডিক্যাল কংগ্রেসে। অ্যাটকসিল থেকে উদ্ভূত এই ৬০৬-এর নাম দিলেন স্যালভারসান অর্থাৎ যে ওষুধ স্বাস্থ্যটাকে রক্ষা করে।

এই আবিষ্কার চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর এনে দিল। হলদে রঙ-এর এই ওষুধ শিরার মধ্যে ইনজেকশন করে মানুষের দেহে এই প্রথম ঢোকানো শুরু হল। মুহূর্তের মধ্যে এই ওষুধ দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে গেল। দেহটাকে বাঁচিয়ে শুধু জীবাণুটাকেই ধ্বংস করা সম্ভব হল। সেই থেকে বর্তমানকালের কেমোথেরাপির যুগ শুরু হল। আরলিক তাঁর ম্যাজিক গুলি খুঁজে পেলেন।

রামধনুর রঙ নিয়ে সারাজীবন ধরে খেলে আরলিক একদিন তাঁর ম্যাজিক গুলি পেয়ে গেলেন তবু তাঁর মন ভরল না। আবার হাজারো রকমের পরীক্ষা করে তিনি স্যালভারসানের চেয়েও যোগ্যতর এক অষুধ বার করলেন। তার নাম হল নিওস্যালভারসান।

আরলিক ছিলেন ফলিত রসায়নের রাজা। আধুনিক কেমো-থেরাপির স্রষ্টা। পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান দিয়েছেন। দেশবাসী তাঁর নামে ফ্রাঙ্কফুরটের শহরতলীর এক রাস্তার নামকরণ করেছে, পল আরলিক স্ট্রাসি। ১৯০৮ সালে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

কিন্তু তখন মহাযুদ্ধ বেধেছে। ১৯১৪ সালে। আরলিক বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হলেন। এই রোগের তখন কোনো চিকিৎসা নেই। একমাত্র চিকিৎসা আহার সংক্ষেপ। যুদ্ধের জন্য তাঁর প্রিয় হাভানা সিগার পর্যন্ত তাঁকে ছাড়তে হল। আরলিকের চুল দাড়ি আগেই পেকেছিল। এখন মুখ শুকিয়ে গেল, কপালে গালে কুঞ্চিত রেখা দেখা দিল। অবশেষে একদিন তাঁর মৃত্যু হল। ১৯১৫ সালে। বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগে। ৬১ বৎসর বয়সে।

পরশ পাথর

ভারতবর্ষে তখন মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করেছেন। দলে দলে ছাত্ররা স্কুল কলেজ ছেড়ে দিচ্ছে। শিক্ষকরা পর্যন্ত এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ভারতে অদ্ভুত এক গণ-জাগরণ দেখা দিয়েছে। সরকারী চাকুরেদের প্রতি জনসাধারণের মনে ভারতে এই প্রথম শ্রদ্ধার বদলে বিদ্বেষ এবং ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে।

সেই সময় কলকাতা শহরে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে (আজকাল যার নাম নীলরতন সরকার হাসপাতাল) এক সরকারী ডাক্তার কালাজ্বরের গবেষণা নিয়ে মেতে রইলেন। ছোট একখানি ঘরে সরকারী কাজের ফাঁকে রাতে কেরোসিনের এক লণ্ঠন জালিয়ে রোজ তিনি এই গবেষণা করতেন।

এই ডাক্তারটির নাম উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। ১৮৭৩ সালে তাঁর জন্ম, ডিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখে। তাঁর বাবা ছিলেন মুঙ্গের জেলার জামালপুরে ই আই রেলওয়ের খ্যাতনামা এক চিকিৎসক। ছেলেকে তিনি ডাক্তারী পড়াবেন ভেবে হুগলী কলেজে ভর্তি করলেন।

কিন্তু কলেজে ঢুকে উপেন্দ্রনাথের ঝোঁক হল গণিত এবং রসায়নে। হুগলী কলেজ থেকে অঙ্কে অনার্স নিয়ে তিনি বি-এ পাশ করলেন। তাই তাঁর ইচ্ছে হল, এইবার তিনি অধ্যাপকের কাজ নিয়ে শিক্ষকতা করবেন।

কিন্তু তাঁর বাবা এতে রাজী হলেন না। কাজেই বাবার ইচ্ছায় অবশেষে তাকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে হল। কিন্তু রসায়ন তিনি ছাড়লেন না। এম-এ পরীক্ষাতে একদিন তিনি রসায়নে প্রথম স্থান অধিকার করে ফেললেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে।

লেখাপড়ায় বরাবরই উপেন্দ্রনাথ ভাল ছিলেন। অনায়াসে তিনি প্রথমে এল-এম-এস এবং পরের বৎসর এম-বি পাশ করলেন ১৮৯৯ সালে। শুধু পাশই নয়, সার্জারী এবং মেডিসিন দুটিতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করলেন।

তারপর ডাক্তার হয়ে সরকারী চাকরি। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে তাঁকে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করা হল।

এইখানে তিনি যেমন ছাত্রদের পড়াতেন, তেমনি করতেন রুগীর চিকিৎসা ; এবং অবসর সময়ে গবেষণা। তাই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-ডি ডিগ্রি পেয়ে গেলেন, ১৯০২ সালে। তারপর হিমোলাইসিস অর্থাৎ রক্তকণিকা গলে যাওয়া নিয়ে গবেষণা করে তিনি পি-এইচ-ডি ডিগ্রি পেলেন, ১৯০৯ সালে।

এইবার তাঁকে কলকাতায় বদলী করা হল। ক্যাম্পবেল হাসপাতালে।

ক্যাম্পবেলে মেডিসিনের সুযোগ্য শিক্ষক হিসেবে তাঁর যেমন নাম হল, তেমনি খুব ভাল চিকিৎসক বলেও তাঁর খুব সুনাম হল।

কলকাতা শহরে একবার যদি কারু সুনাম হয়, সে চিকিৎসকের আর আহার নিদ্রার সময় থাকে না। দিনরাত তাঁকে রুগীর জন্যে খাটতে হয়।

উপেন্দ্রনাথ হাসপাতালের সরকারী চাকরি এবং রুগীর চিকিৎসায় অত খাটুনি খেটেও রোজ কিছুটা সময় বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য হাতে রাখতেন। ক্যাম্পবেল হাসপাতালে এই জন্য তাঁর ছোট্ট একটি ঘর ছিল। এ ঘরে না ছিল ইলেক্‌টিসিটি, না ছিল গ্যাসের কোনো বন্দোবস্ত। কেরোসিন তেলের এক লণ্ঠন জ্বালিয়ে রোজ রাত্রে এই ঘরে বসে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন।

তখন বাংলা এবং আসামে যে রোগে সবচেয়ে বেশী মৃত্যু হত, তা হল ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর।

ম্যালেরিয়ার ওষুধ যে কুইনিন তা অনেক আগেই জানা গেছে। ভারতে গভর্নমেণ্টের চেষ্টায় সিনকোনার চাষ শুরু হয়েছে। গভর্নমেণ্ট সস্তা দরে কুইনিন পোস্ট অফিসের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে বিলি করবার ব্যবস্থা করেছেন।

ম্যালেরিয়ার কারণ যে মশা তাও স্যার রোনাল্ড রস আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

কিন্তু কালাজ্বর যে কি জিনিস এবং কি তার চিকিৎসা কিছুই তা জানা যায় নি।

এ জ্বরে পিলে বড় হয়। ক্রমশঃ রক্তশূন্যতা বাড়ে। রক্তের শ্বেতকণিকা কমে যায়। মুখে ঘা হয়। অবশেষে সারা দেহে জল জমে ফুলে ওঠে। গায়ের রক্ত ক্রমশঃ কালচে হয় বলেই বোধহয় এর নাম কালাজ্বর।

এ রোগ নতুন কিছু জিনিস নয়। প্রাচীনকাল থেকেই ভারত, চীন, গ্রীস, ইটালী, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় এ রোগ ছিল।

ভারতে আসাম, বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং মাদ্রাজে চিরদিন এই জ্বরে লোকে ভুগেছে। কিন্তু সাংঘাতিক মহামারী হয়ে লোক ক্ষয় হয়েছে শুধু বাংলা এবং আসামে।

এমন ভীষণ মহামারী অন্য কোথাও আর হয় নি। বাংলাতে এ মহামারী হয় উনিশ শতকের ছয় দশকে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় শতকে বর্ধমান জেলায় জলবায়ু কলকাতার চেয়ে অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর ছিল। তাই কলকাতা থেকে লোকে সেই সময় হাওয়া পরিবর্তনের জন্য বর্ধমানে যেত।

বর্ধমান জেলার সম্বন্ধে ১৮১৫ সালে বুকানন হামিলটন লিখে গেছেন; বর্ধমানের মধ্যে এমন গ্রাম খুবই কম যেখানে কোন স্কুল নেই, অথবা শিশুরা লেখাপড়া যেখানে জানে না। সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে বর্ধমানের মত কৃষিসম্পদ স্থান আর কোথাও তখন নেই। এ যেন জনমানবহীন মরুভূমির মাঝে সুন্দর এক মরূদ্যান।

সেই বর্ধমানে সাংঘাতিক এক মহামারী শুরু হল ১৮৫৯ সালে। জ্বরে ভুগে ভুগে হাজার হাজার লোক মরে গেল। দশ বছরের মধ্যে ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়ে প্রতি বর্গমাইলে আড়াই-শ করে লোক কমে গেল ১৮৬৯ সালে। অমন সোনার দেশ ক্রমশঃ এমন শ্মশানে পরিণত হল যে, একবার ওখানে গেলে এই জ্বরের কবল থেকে কেউ আর নিস্তার পেত না। প্রাণ নিয়ে যদি কেউ পালিয়ে আসতে পারত তাহলেই তাকে ভাগ্যবান বলা হত।

এই রোগ শুধুমাত্র বাংলা দেশেই যে ছিল তা কিন্তু নয়। ভারত গভর্নমেণ্টের স্যানিটারী কমিশনার গ্রীন সাহেব ১৮৬৮ সালে এক রিপোর্টে বলেন, পাটনাতে এই জ্বরের এক মহামারী লাগে, গ্রামে গ্রামে, ১৮৫৬—১৮৫৯ সালে।

পাণ্ডুয়াতে এই রোগ যায় ১৮৬২ সালে। ছ-মাসের মধ্যেই ১২০০ লোকের মৃত্যু হয়।

আর্মি স্যানিটারী কমিশনারের রিপোর্টে দেখা যায় ১৮৭২ সালে যে গ্রামে এ রোগ হয়েছে সেখানেই শতকরা ৭০জন লোক মারা গেছে। এমনও দেখা

গেছে যে, মহামারী শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিন মাসের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ লোকের মৃত্যু হয়েছে।

আসামে এই মহামারী শুরু হয় প্রথমে গারো পাহাড়ে। তারপর কামরূপ এবং গোয়ালপাড়ায়। অবশেষে নওগাঁও-এ এই রোগের জন্য শতকরা ৩১.৫ জন লোক কমে যায়।

এই সাংঘাতিক জ্বরের নামই কালাজ্বর। যশোহর জেলায় এই জ্বরেরই আর এক নাম ছিল, জ্বর-বিকার। কলকাতার লোকে বলত, বর্ধমানের জ্বর (বার্ডওআন ফিভার)। আসামের গারো পাহাড়ের আদিম অধিবাসীরা এই জ্বরকে বলত কালহাজ্বর। সেই থেকেই এ রোগের নাম হয়েছে কালাজ্বর।

এই কালাজ্বর নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা শুরু হয় এই বিংশ শতাব্দীতে। ১৯০৩ সালে। ফাইলেরিয়ার কারণ আবিষ্কারক এবং ম্যালেরিয়ার গবেষণায় স্যার রোনাল্ড রসের পরামর্শদাতা এবং পৃষ্ঠপোষক স্যার প্যাট্রিক ম্যানসন সর্বপ্রথম বলেন, স্লিপিং সিকনেস রোগের মতই এই রোগেরও নিশ্চয়ই কোন প্যারাসাইট (পরজীবী কীটাণু) আছে।

কয়েকমাসের মধ্যেই জানা গেল, লিশম্যান ইংলণ্ডের নেটলী হাসপাতালে দমদমজ্বরে আক্রান্ত এক সৈন্যের পিলের মধ্যে এমনি এক অদ্ভুত জিনিস দেখেছিলেন ১৯০০ সালে। দেখতে অনেকটা ঐ স্লিপিং সিকনেসের প্যারাসাইটের মতো। ম্যানসনের এই সন্দেহের পর লিশম্যান এক প্রবন্ধ লিখলেন, ১৯০৩ সালে। তার নাম, ভারতে স্লিপিং সিকনেসের সম্ভাবনা।

এই প্রবন্ধ পড়বার আগেই ডোনোভ্যান নিজেও এই প্যারাসাইট দেখে এক রিপোর্ট প্রকাশ করলেন, ১৯০০ সালে, জুলাই মাসে।

প্রায় ঠিক একই সময়ে হামবুর্গ হাসপাতালে জ্বরে মৃত এক চীনে সৈনিকের লিভার, পিলে এবং হাড়ের মজ্জায় অনুরূপ এক কীটাণু দেখা গেল।

সেই বছর ডিসেম্বর মাসে দার্জিলিং থেকে কালাজ্বর নিয়ে একটি রুগী বিলেতে গিয়ে ম্যানসনের কাছে হাজির হল। ম্যানসন তার রক্ত পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, ঐ রক্তও লিশম্যান এবং ডোনোভানের দেখা ঐ কীটাণুতে ভরা।

তাই কালাজ্বরের এই প্যারাসাইটের নাম হল, লিশম্যান ডোনোভান বডিস।

আসামের নওগাঁও-এ তখনও কালাজ্বরের মহামারী। বেনটলী মৃত রোগীর পিলের মধ্যে এই কীটাণু পেলেন।

সেই সময় কালাজ্বর যে সত্যি এক পরজীবী কীটাণুঘটিত ভিন্ন রকমের জ্বর সে কথা কেউ বুঝত না। সবাই ভাবত এ জ্বর ম্যালেরিয়ারই একরকম ফের।

এমনি সময় স্যার লিওনার্ড রজার্স তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। ১৯০৪ সালে।

এই প্রবন্ধের নাম, লিশম্যান ডোনোভাস বডিস ইন ম্যালেরিয়াল ক্যাচেকসিয়া অ্যাণ্ড কালাজ্বর। সেই থেকেই সবাই জানল, এ জ্বর আলাদা একটি কীটাণুঘটিত এবং তার নাম কালাজ্বর।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী তখন ক্যাম্পেবেল মেডিক্যাল স্কুলে মেডিসিনের শিক্ষক। এখন থেকে এই কালাজ্বর নিয়ে তিনি মেতে উঠলেন এবং গবেষণা শুরু করলেন।

দু বছরের মধ্যেই তাঁর প্রথম প্রবন্ধ বেরুল, "কালাজ্বরে জ্বরের বিভিন্ন রূপ" জানুয়ারী মাসে, ১৯০৬ সালে।

এই কালাজ্বরে আগে ম্যালেরিয়ার মত কুইনিন দিয়ে চিকিৎসা করা হত। নানাবিধ উপায়ে রক্তের শ্বেত কণিকা বাড়াবার চেষ্টা করা হত। আর ছিল অ্যালকালি অথবা হাড়ের মজ্জা খাওয়ানো এবং পারদ আরসেনিক অথবা অন্যান্য ভেষজ দিয়ে চিকিৎসা।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হত না। শতকরা ৯৮ জনের এই রোগে মৃত্যু হত।

দক্ষিণ আমেরিকায় কালাজ্বরজনিত চামড়ার রোগে (ডারমাল লিসমানিআসিস) অ্যান্টিমনি টারটেট ব্যবহার করে ডাঃ ভিআন্না খুব ভাল ফল পান ; ১৯১৩ সালে। তাই দেখে বাচ্চাদের কালাজ্বরে এই ওষুধ ব্যবহার করা হয় ১৯১৫ সালে।

শিরার ভিতর এই ওষুধ ইনজেকশন দিয়ে কালাজ্বরের চিকিৎসা সর্বপ্রথম ভারতে প্রবর্তন করেন, স্যার লিওনার্ড রজার্স ; ১৯১৫ সালে।

এই ইনজেকশনে অনেক উপকার হলেও নানারকম অসুবিধা দেখা দিল। উপেন্দ্রনাথ ক্যাম্পবেল হাসপাতালে রুগীর ওপর প্রয়োগ করে এই অসুবিধা দূর করবার উপায় ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, এই অ্যান্টিমনি টারটারেটের বদলে সোডিয়াম অ্যান্টিমনিল টারটারেটে ভাল কাজ হবে।

প্রেসিডেন্সী কলেজ ল্যাবরেটরী থেকে এক শিশি এই নতুন ওষুধ তিনি তৈরী করিয়ে নিলেন।

দেখা গেল, এই নতুন ওষুধ টারটার এমিটিকের অর্থাৎ অ্যান্টিমনি টারটারেটের চেয়ে অনেক বেশী নির্বিষ এবং উপকারী। ১৯১৫ সালের নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে উপেন্দ্রনাথ তাঁর পরীক্ষার ফল প্রকাশ করলেন। সেই থেকে এই ওষুধ সব জায়গায় চালু হল।
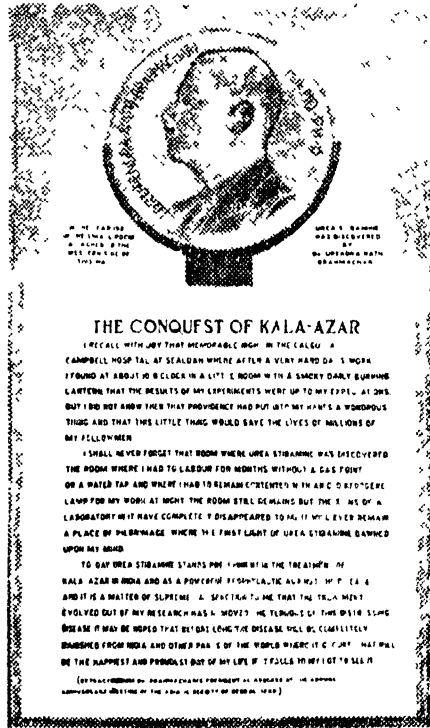
ক্যাম্পবেল হাসপাতালের দেয়ালে এই আবিষ্কারের স্মারক খণ্ড

উপেন্দ্রনাথ কিন্তু এইখানেই থেমে গেলেন না। এই ওষুধের চেয়ে আরও বেশী যোগ্যতর কি ওষুধ তৈরী করা যায় সেইদিকে মন দিলেন।

এমনি করে অ্যান্টিমনি ধাতুর সূক্ষ্মতম এক গুঁড়ো ইলেকট্রোলাইসিসের সাহায্যে তৈরী করে উপেন্দ্রনাথ রুগীর দেহে প্রয়োগ করে দেখলেন, আগেকার ওষুধের চেয়ে এতে ফল বেশী ভাল হয় এবং কম ইনজেকশনে কাজ বেশী হয়।

উপেন্দ্রনাথ তাঁর গবেষণার ফল ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে প্রকাশ করলেন, জানুয়ারী মাসে ১৯১৬ সালে। এই পদ্ধতিতে কালাজ্বরে আক্রান্ত রুগী কি করে রোগমুক্ত হয়েছে তার বিবরণ এসিয়াটিক সোসাইটির বঙ্গীয় শাখায় উপস্থিত করলেন এপ্রিল মাসে, ১৯১৬ সালে।

তাঁর এই গবেষণা দেখে ভারতীয় রিসার্চ ফাণ্ড অ্যাসোসিয়েশন ১৯১৯ সালে কালাজ্বর নিয়ে আরও গবেষণার জন্য উপেন্দ্রনাথকে অর্থ সাহায্য করলেন।

উপেন্দ্রনাথ ক্যাম্পবেল হাসপাতালের ঐ ছোট্ট ঘরে নতুন উদ্যমে কালা-জ্বরের গবেষণায় মগ্ন হলেন।

ধাতব অ্যান্টিমনি (মেটালিক অ্যান্টিমনি) যদিও রুগীর দেহে কালাজ্বরের পরজীবী কীটাণু অতি দ্রুত ধ্বংস করে তবু এ-জিনিস তৈরী করা এবং নির্দিষ্ট উপায়ে রুগীর দেহে ইনজেকশন দেওয়ার অনেক ঝঞ্ঝাট। সুদক্ষ চিকিৎসক ছাড়া অন্য কেউ তা পারে না।

তাছাড়া সোডিআম অ্যান্টিমনিল টারটারেট দিয়ে কালাজ্বর সারাতে অনেক বেশীদিন লাগে। রুগীর ধৈর্য নষ্ট হয়। মাঝপথে চিকিৎসা বন্ধ হয়।

তাই উপেন্দ্রনাথ নতুন ওযুধের আবিষ্কারে মন দিলেন।

কেমোথেরাপির স্রষ্টা পল আরলিক জার্মানীতে অ্যাটকসিল থেকে স্যালভারসান তৈরী করেছিলেন। অ্যাটকসিল আরসেনিক ঘটিত একটি অরগ্যানিক কম্পাউণ্ড। এই অ্যাটক্সিল স্লিপিং সিকনেসে ব্যবহার করে অনেক উপকার পাওয়া গেছে। কালাজ্বরের প্যারাসাইটও দেখতে অনেকটা এই স্লিপিং সিকনেসের জীবাণুর মত। অ্যান্টিমনি দিয়ে এই কালাজ্বরে এতদিন ভাল ফল পাওয়া গেছে। তাই উপেন্দ্রনাথের মনে হল, এই অ্যাটকসিলে আরসেনিকের বদলে যদি অ্যান্টিমনি বসানো যায় তাহলে কি হয় ?

রসায়ন বিদ্যায় উপেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়ে এম এ পাশ করেছেন। কাজেই আরসেনিকের বদলে অ্যান্টিমনি দিয়ে অ্যাটকসিলের মত একটি কম্পাউণ্ড তিনি অনায়াসে তৈরী করে ফেললেন। এর নাম হল পি-অ্যামাইনো ফিনাইল স্টিবিনিক অ্যাসিড।

উপেন্দ্রনাথ দেখলেন, এ জিনিস আগেকার সব ওষুধের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী এবং নির্বিষ। কাজেই তিনি রিসার্চ ফাণ্ড অ্যাসোসিয়েশনকে চিঠি লিখে জানালেন, এ জিনিস যদি ভারতে তৈরী করা হয় তাহলে সিনকোনা চাষের মতই লক্ষ লক্ষ লোকের এতে উপকার হবে।

পল আরলিক প্রবর্তিত কেমোথেরাপির মানেই হল ওষুধ হবে নির্বিষ। রুগীর দেহের কোন ক্ষতি তাতে হবে না। কিন্তু রোগের জীবাণু সব ধ্বংস হবে।

উপেন্দ্রনাথ এই নতুন ওষুধ রুগীর ওপর প্রয়োগ করে যখন দেখলেন, এতেও রুগীর নানা অসুবিধা হয় তখন কি করে এই অসুবিধা দূর করা যায় এবং এই ওষুধ আরও বেশী উন্নত এবং উপযুক্ত করা যায় তাই নিয়ে দিনরাত ভাবতে লাগলেন। সেই সময় ক্যাম্পবেল হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরাই শুধু জানেন, উপেন্দ্রনাথ তখন সারাদিন কি করতেন।

তখন তাঁর দিনরাত শুধু একটিমাত্র চিন্তা ; কি করে কালাজ্বরের উপযুক্ত এক ওষুধ বার করা যায়। পল আরলিক যেমন করে অ্যাটকিসল ভেঙ্গে একটার পর একটা জৈবরাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে অবশেষে স্যালভারসন তৈরী করেছিলেন, উপেন্দ্রনাথও তেমনি এই পি-অ্যামাইনো ফিনাইল স্টিবিনিক অ্যাসিডের সঙ্গে জৈব রসায়নের বিবিধ দ্রব্য মিশিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন।

তখন ম্যালেরিয়ায় কুইনিন ইনজেকশন দেওয়া হত। এই ইনজেকশনে সাংঘাতিক ব্যথা হত। এই ব্যথা কমাবার জন্য কুইনিনের সঙ্গে ইউরিয়া মিশিয়ে এক রকমের ওষুধ তৈরী হত তার নাম ছিল, কুইনিন-ইউরিয়া।

এই ইউরিয়া একটি জৈব রসায়নিক দ্রব্য এবং নির্বিষ। উপেন্দ্রনাথের মনে হল, এই ইউরিয়া ঐ পি-অ্যামাইনো ষ্টিবিনিক অ্যাসিডের সঙ্গে মেশালে পল আরলিকের অ্যাটকিসলের মতই অ্যান্টিমনির এক নতুন ওষুধ তৈরী হবে।

একদিন তাই তিনি ঐ অ্যাসিডের সঙ্গে ইউরিয়া মেশালেন। দেখলেন, তিনি যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই হল। নির্বিষ এক ওষুধ তৈরী হল। রুগীর দেহে এই জিনিস অতি দ্রুত কালাজ্বরের পরজীবী কীটাণু ধ্বংস করল, কিন্তু দেহের কোন ক্ষতি হল না।

পল আরলিক যেমন ৬০৬ বার ব্যর্থ হয়ে হঠাৎ একদিন ম্যাজিক গুলি পেয়েছিলেন, উপেন্দ্রনাথও ঠিক তেমনি এক পরশ পাথর পেয়ে গেলেন।

কিন্তু তফাত শুধু এই, আরলিকের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়েছে প্রাচুর্যের মধ্যে। জর্জ স্পেআর হাউসের মত বিরাট এক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের সর্বেসর্বা হয়ে এবং বিজ্ঞানের আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ এই আবিষ্কার করেছেন, ক্যাম্পবেল হাসপাতালের একতলার ছোট্ট একখানি ঘরে। রাত্রে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালিয়ে। ইলেকট্রিসিটি

অথবা গ্যাসের কোনো সাহায্য না পেয়ে। ১৯২১ সালের দেশব্যাপী স্বাধীনতার অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে এবং নিজে সামান্য এক সরকারী চাকুরে হয়ে।

উপেন্দ্রনাথ এই ওষুধের নাম দিলেন,* ইউরিয়া ষ্টিবামাইন। নিজে কালাজ্বরের রুগীর ওপর প্রয়োগ করে আটটি রুগী ভাল করে তার বিস্তারিত বিবরণ ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ-এ প্রকাশ করলেন, অক্টোবর, ১৯২২ সালে।

তারপর এই ওষুধ মেডিক্যাল কলেজে ব্যবহার হল। শিলং-এর পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের কালাজ্বর রিসার্চ হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হল। আসামের চা বাগানে ব্যবহার করা হল।

তখন আসামেই কালাজ্বর হত সব চেয়ে বেশী ; তাই মৃত্যুও বেশী হত। ব্রহ্মচারীর এই ইনজেকশন প্রবর্তন করার ফলে দশ বছরেব মধ্যে এ রোগের প্রকোপ কমে গেল। ১৯২৫ সালে যেখানে ৬০,৯৪০ জনেব কালাজ্বর হয়েছিল, দশ বছর পরে দেখা গেল মাত্র ১১,১০০ লোক মাত্র এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যুহারও তেমনি কমে গেল। ১৯২৫ সালে সমগ্র আসামে কালাজ্বরে ৬,৩৬৫ জন লোকের মৃত্যু হয়। ১৯৩৫ সালে মৃত্যু হল ৮৪৫ জনের।

কাজেই কালাজ্বরে ইউরিয়া স্টিবাইন শুধু ভাবতে নয় চীনদেশে পর্যন্ত ব্যবহার হতে লাগল। আগে যেখানে শতকরা ৯৮ জনেব মৃত্যু হত, এই চিকিৎসায় সেখানে শতকরা ৯৮ জন আরোগ্যলাভ করল।

এই আবিষ্কারের জন্যে তিনি ১৯২১ সালের মিণ্টো মেডাল পেলেন। গভর্নমেণ্ট কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক দিয়ে তাকে সম্মান দেখালেন ১৯২৪ সালে।

উপেন্দ্রনাথ সরকারী চাকুরি ছেড়ে নিজে এক গবেষণাগার খুললেন। চিকিৎসক হিসাবে আগেই তাঁর খুব সুনাম ছিল, কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করবার পর সেই সুনাম আরও বেশী বেড়ে গেল। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করলেন।

তিনি যেমন বিপুল অর্থ উপার্জন করেছেন, তেমনি আবার দানও করেছেন প্রচুর। তখন ইণ্ডিয়ান রেডক্রস অ্যাণ্ড সেণ্ট জনস আম্বুল্যান্স অ্যাসোসিয়েশন সাহেবদের একচেটিয়া ছিল। এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে বিরাট দানের জন্য

গভর্নমেণ্ট তাঁকে এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি এই সম্মান পান। বাংলাদেশের সেণ্ট জনস্ অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশনের তিনিই ছিলেন সহঃ সভাপতি আর সভাপতি তখন বাংলার লাট বাহাদুর।

বাংলায় এসিয়েটিক সোসাইটি পর পর তিনবার তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করে।

ভারতের বড়লাট বাহাদুর তাঁকে নাইট হুডের সম্মানে ভূষিত করেন।

এত বিপুল সম্মান এবং অর্থ উপার্জন করা সত্ত্বেও স্যার উপেন্দ্রনাথ তাঁর গবেষণা কখনও ছাড়েন নি। তাঁর লিখিত গবেষণামূলক পুস্তক পুস্তিকা এবং রচনার সংখ্যা সবসুদ্ধ প্রায় দেড়শ। দেশে বিদেশে তা ছাপা হয়েছে আর তা বিজ্ঞানীদের কাছে সম্মান এবং শ্রদ্ধা পেয়েছে।

স্যার উপেন্দ্রনাথ কত বিভিন্ন পরিবার এবং প্রতিষ্ঠানকে যে কত অর্থ এবং কালাজ্বরের কত ওষুধ দান করে গেছেন তার কোনো হিসেব নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, সেণ্টাল গ্লাস এণ্ড সেরোমিক ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও তার দান থেকে বঞ্চিত হয় নি।

৭৩ বৎসর বয়সে স্যার উপেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ সালে।

তাঁর মর্মর মূর্তি এখনও এসিয়েটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনে যে দুটি মর্মর মূর্তি আছে তার একটি স্যার রোনাল্ড রসের, অপরটি স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর।

মধুমেহ

সারাটা জীবন পল আরলিক রঙ দিয়ে শুধু জীবাণু ধ্বংস করার চেষ্টাই করে গেলেন। কিন্তু জীবাণু ছাড়াও যে দেহে মারাত্মক অন্য রোগ হয়, সেদিকে তাঁর মন গেল না। এ খেয়াল যখন হল, তখন তাঁর নাম দেশবিদেশে ছড়িয়ে গেছে। আধুনিক কালের জীবাণুধ্বংসী চিকিৎসার (কেমোথেরাপির) জনক বলে তখন তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন।

তাঁর আবিষ্কৃত সিফিলিসের ওষুধ স্যালভারসনের জন্য তখন সারা পৃথিবী থেকে দাবি আসছে, এই নতুন ওষুধ চাই। আরো চাই। তাঁর ফ্যাক্টরীর লোকেরা দিনরাত খেটে এই ওষুধ তৈরী করছে। তবু চাহিদা মিটছে না।

এমনি সময়ে আরলিক অসুখে পড়লেন। তাঁকে ডায়াবেটিস (বহুমূত্র) রোগে ধরল। এইবার তিনি বুঝলেন জীবাণু ছাড়াও দেহে কঠিন অন্য রোগ হয়।

ডায়াবেটিস জীবাণুঘটিত রোগ নয়। কিন্তু প্রাণঘাতী। এই সাংঘাতিক রোগের কোন প্রতিবিধান নেই। তখনও ছিল না, এখনও কিছু নেই। তখনকার চিকিৎসা ছিল শুধু খাওয়া কমানো।

আরলিক তখন সবেমাত্র জীবাণুধ্বংসী চিকিৎসার নতুন পথটি শুধু আবিষ্কার করেছেন। এই পথের আশেপাশে অন্য অনেক নতুন ওষুধের সন্ধান পেয়েছেন। এমন কি, যুগান্তকারী সালফা ড্রাগ যা থেকে তৈরী হয়, সেই সালফানিলিক অ্যাসিড পর্যন্ত তাঁর নজরে এসে গেছে। সারাজীবনের চেষ্টায় আরলিক তখন যেন জীবাণুধ্বংসী এক নতুন রাজ্যের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন। এমনি সময়ে তাঁর মৃত্যু হল ডায়াবেটিসে। মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে, ১৯১৫ সালে।

ডায়াবেটিস অতি প্রাচীনকালের রোগ। খ্রীঃ পূঃ হাজার বছর আগেও ভারতের চিকিৎসকরা এ রোগ দেখেছেন। জানতেন, এই রোগে মূত্রের

সঙ্গে মিষ্টি থাকে। তাই এর নাম ছিল মধুমেহ। অর্থাৎ মূত্রের সঙ্গে যেন মধু মেশানো। এ তথ্য পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তখন কেউ জানত না। আজও কেউ জানে না, কেন এ রোগ হঠাৎ একজনকে ধরে। বংশপরম্পরায় কেন একটি পরিবারে থাকে।

শুধু জানা গেছে, দেহের অভ্যন্তরে আন্তর যন্ত্রে এ রোগে কোথায় কি পরিবর্তন ঘটে এবং কি উপায়ে তা রোধ করা যায় আর কি দিয়েই বা তার চিকিৎসা করা যায়।

এই চিকিৎসা বার করে ডায়াবেটিস রোগে মানুষের মৃত্যু যিনি হঠাৎ একদিন প্রতিরোধ করে ফেললেন, তাঁর নাম ফ্রেডারিক গ্রাণ্ট ব্যানটিং।

ব্যানটিং উত্তর আমেরিকার লোক, সামান্য এক কৃষকের ছেলে। ক্যানাডায় তার বাড়ি। ডাক্তারী পাশ করে প্রথম মহাযুদ্ধে আর্মি সার্জনের কাজ করে যুদ্ধশেষে দেশে ফিরে এলেন। ক্যানাডার অনটেরিও প্রদেশের ছোট্ট লণ্ডন শহরে সার্জারী প্র্যাকটিস শুরু করলেন। কিন্তু প্র্যাকটিস কিছু জমল না।

রোজ ব্যানটিং তার চেম্বার খুলে সাজগোজ করে সকাল-বিকালে বসে থাকেন; কিন্তু একটি রুগীও আসে না। দেখতে দেখতে দিন যায়। সপ্তাহ যায়। চার সপ্তাহ পরে একটি রুগী এল। প্রথম মাসে ঐ একটিমাত্র রুগী দেখে ব্যানটিং চার ডলার রোজগার করলেন।

ব্যানটিং বুঝলেন, প্র্যাকটিসের আশায় বসে থাকলে তাঁকে না খেয়েই মরতে হবে। কাজেই তিনি এক চাকরি নিলেন। ওয়েস্টার্ন অনটেরিও মেডিক্যাল স্কুলের পার্ট টাইম ডেমনস্ট্রেটর।

ডেমনস্ট্রেটরের কাজ ছাত্রদের শেখানো। অর্থাৎ লেকচার দেওয়া। রোজ রাত্রে তাই ব্যানটিং বই খুলে বসতেন আর পরদিনের লেকচার তৈরী করতেন।

সেদিন ৩০শে অক্টোবর। ১৯২০ সাল। ব্যানটিং রাত্রে বই খুলে বসেছেন। পরদিন ছাত্রদের প্যাংক্রিয়াস (অগ্নাশয়) সম্বন্ধে লেকচার দিতে হবে।

এই প্যাংক্রিয়াস ছোট্ট একটি গ্ল্যাণ্ড (গ্রন্থি)। জিভের মত দেখতে। পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেছনে লিভারের (যকৃতের) নীচে থাকে। লিভার থেকে পিত্তরস যেমন প্রথমে যায় পিত্তাশয়ে (গলব্লাডার), তারপর ক্ষুদ্র অন্ত্রে (স্মল ইনটেস্টাইন) তেমনি প্যাংক্রিয়াস থেকে জারক রস আলাদা একটি নল

দিয়ে সোজা গিয়ে অন্ত্রে পৌছয়। পাকস্থলী থেকে খাদ্য যখন এখানে আসে, পিত্তরস ও প্যাংক্রিয়াসের রসে মিশে তা হজম হয় এবং পরে রক্তের সঙ্গে মেশে।

খাদ্যবস্তু হজম করতে যে প্যাংক্রিয়াসের জারক রসেরও প্রয়োজন হয় সে কথা তিন শ বছর আগেও কেউ জানত না।

এই তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেন হল্যাণ্ডের এক শারীরতত্ত্ববিদ: রেগনার দি গ্রাফ (১৬৪১—৭১) কুকুরের প্যাংক্রিয়াসের ঐ নল ফুটো করে এবং তা থেকে এই জারক রস সংগ্রহ করে। ১৬৬৪ সালে।

সেই থেকে এই প্যাংক্রিয়াস নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ঐ গ্ল্যাণ্ডের কোন কোন কোষ থেকে এই রস তৈরী হয় তাও বার করা হয়েছে।

এমনি করে দুশ বছর কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন পল ল্যাঙ্গারহানস নামে এক জার্মান ডাক্তার আবিষ্কার করলেন, প্যাংক্রিয়াসের ভেতর এমন অনেক কোষ আছে যা এই জারক রস তৈরী করে না। কাজেই খাদ্যবস্তু হজমের সঙ্গে এই কোষগুলির কোনও সম্বন্ধ নেই। ১৮৬৯ সালে এই নতুন কোষ আবিষ্কার হওয়ার পর এদের নাম দেওয়া হল, আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহানস। কিন্তু কি এদের কাজ কেনই বা এরা ঐ গ্ল্যাণ্ডে থাকে কিছুই তা জানা গেল না।

ঊনবিংশ শতাব্দী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগ। কাজেই প্যাংক্রিয়াস নিয়েও অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হল।

অবশেষে যোসেফ ফন মেরিং নামে এক জার্মান ডাক্তার এবং অসকার মিনাকাভিসকি নামে এক রুশীয় ডাক্তার আবার এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করে ফেললেন। ১৮৮৯ সালে।

এঁরা দুজনে মিলে অপারেশন করে একদিন কুকুরের পেট থেকে আস্ত এই প্যাংক্রিয়াস বার করে আনলেন। ভেবেছিলেন, প্যাংক্রিয়াসের অভাবে কুকুরের দেহে শুধু হজমেরই বুঝি গোলমাল হবে। কিন্তু দেখা গেল, কুকুরের এছাড়াও ডায়াবেটিস হয়েছে। মূত্রের সঙ্গে চিনি বেরিয়ে যাচ্ছে। মাত্র দশ দিনের মধ্যেই কুকুরটার মৃত্যু হল। ঐ ডায়াবেটিসে।

সেই থেকে জানা গেল, প্যাংক্রিয়াস থেকে দেহে এমন কোন বস্তু নিশ্চয় তৈরী হয় যা ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করে। দেহ থেকে চিনি বেরিয়ে যেতে দেয় না।

কিন্তু কি সেই বস্তু এবং কেমন করেই বা তা ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করে তা কিছুই বোঝা গেল না।

উনবিংশ শতাব্দী পার হয়ে বিংশ শতাব্দী শুরু হল। দেহের ভেতর নলহীন গ্রন্থি (ডাকটলেস গ্ল্যাণ্ড) যেমন পিটুইটেরী থাইরয়েড ইত্যাদি যে একরকম আন্তর-রস সৃষ্টি করে তা জানা গেল। এইসব আন্তর-রস লালা কিংবা চোখের জলের মত নল দিয়ে বেরোয় না। গ্রন্থি থেকে সোজা গিয়ে রক্তের সঙ্গে মেশে। তারপর দেহের বিভিন্ন অংশে গিয়ে কোষে কোষে পুষ্টি অথবা শক্তি উৎপন্ন করে। তাই এদের নাম দেওয়া হল, হরমোন অর্থাৎ রাসায়নিক বার্তাবাহক।

শুধু যে নলহীন গ্রন্থিরাই এই হরমোন তৈরী করে তা কিন্তু নয়। যৌন গ্রন্থিরও নল আছে। তবু তারা হরমোন উৎপন্ন করে। সেইজন্যই দেহে পুরুষ কিংবা নারীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

কাজেই বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, প্যাংক্রিয়াসেরও হয়ত এমনি কোন হরমোন আছে। সেই হরমোন দেহের কোষে কোষে খাদ্য থেকে উৎপন্ন চিনি পুড়িয়ে শক্তি (এনার্জি) উৎপন্ন করে। নইলে প্যাংক্রিয়াসের অভাবে দেহ থেকে চিনি বেরিয়ে যাবে কেন ?

তাহলে এই হরমোন প্যাংক্রিয়াসের কোন কোষে তৈরী হয় ? আমেরিকান ডাক্তার ইউজিন লিনডসে ওপি ১৯০১ সালে রুশিয়ান ডাক্তার লিওনিভ ভ্যাসিলিভিচ সোবোলেফ ১৯০২ সালে আর উইলিআম জর্জ ম্যাককলাম ১৯০৯ সালে গবেষণা করে বললেন, এ হরমোন তৈরী হয় প্যাংক্রিয়াসের আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহানসে। কারণ ডায়াবেটিসে মৃত রুগীর এই আইলেটসগুলি শুকিয়ে যায়।

রাত্রি জেগে ব্যানটিং এইসব তথ্য ঘেঁটে পরদিনের লেকচার তৈরী করলেন। তারপর আলো নিভিয়ে ঘুমবার আগে একখানা সাময়িক পত্রিকা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। এই ডাক্তারী পত্রিকাখানি সবে সেদিন ডাকে এসেছে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় ব্যানটিং দেখলেন, মোজেস ব্যারন নামে এক ডাক্তার প্যাংক্রিয়াস ও ডায়াবেটিস নিয়ে এক প্রবন্ধ লিখেছেন।

ব্যারন লিখেছেন, পিত্তাশয়ে পাথর (গলস্টোন) হয়ে যখন রুগীর মৃত্যু হয় তখন এই পাথরের চাপে যেখানে প্যাংক্রিয়াসের নলও চেপ্টে যায় সেখানে প্যাংক্রিয়াসের জারক রস সৃষ্টিকারী কোষগুলিও শুকিয়ে যায়। কিন্তু

আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহানস অক্ষত থাকে। কাজেই জীবিতকালে এদের দেহে ডায়াবেটিসের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। শুধু গলস্টোনেই এদের মৃত্যু হয়।

কুকুরের দেহে প্যাংক্রিয়াসের নল সেলাই করেও ব্যারন এই একই জিনিস দেখেছেন। জারক রস সৃষ্টিকারী কোষগুলি শুকিয়ে যায়। কিন্তু আইলেটসগুলি ঠিক থাকে। কুকুরের ডায়াবেটিস হয় না।

হঠাৎ ব্যানটিং-এর মাথায় একটা খেয়াল এল। প্যাংক্রিয়াস না থাকলে ডায়াবেটিসে কুকুরের মৃত্যু হয়। একটা কুকুরের প্যাংক্রিয়াস কেটে বার করে তার আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহানস আলাদা করে পিষে ঐ কুকুরকে ইনজেকশন দিলে কি হয়? কুকুরের ডায়াবেটিস কি প্রতিরোধ হয় না?

ব্যানটিং-এর ঘুম ছুটে গেল। মাথার মধ্যে এই নতুন ভাবনা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। ব্যানটিং-এর মনে পড়ল, প্যাংক্রিয়াসের একসট্রাক্ট ডায়াবেটিসের রুগীকে ইনজেকশন দিয়ে কোন ফল পাওয়া যায়নি। কিন্তু কেউ তো শুধু আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহানস আলাদা করে বার করে ইনজেকশন দেন নি?

রাত দুটোর সময় উঠে ব্যানটিং তাঁর নোট বই-এ লিখলেন, কুকুরের প্যাংক্রিয়াসের নল বাঁধ। জারক রস সৃষ্টিকারী কোষগুলি শুকিয়ে যেতে ছ থেকে আট সপ্তাহ সময় দাও। তারপর চুপসে যাওয়া প্যাংক্রিয়াস কেটে একসট্রাক্ট তৈরী কর।

এতক্ষণে তাঁর মাথা ঠাণ্ডা হল। ব্যানটিং আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন তাঁর মনে হল, সার্জারী প্র্যাকটিস অথবা ছাত্র পড়ানো তাঁকে দিয়ে আর হবে না। এই কুকুর নিয়েই তাঁকে এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে।

অতএব কলেজে গিয়ে সোজা তিনি ডাঃ ম্যাকলিঅডের কাছে হাজির হলেন। ডাঃ ম্যাকলিঅড স্বনামধন্য পুরুষ। মস্ত বড অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানী। টরেনটো বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্বের প্রধান। যেমন তাঁর নাম তেমনি তিনি পণ্ডিত। আর তেমনি বড তাঁর ল্যাবরেটরী।

এত বড় একজন নামী লোকের সামনে এসে গবেষণার কথা তুলতে গিয়ে ব্যানটিং-এর মুখে কথা আটকে গেল। জীবনে কখনও তিনি গবেষণা করেন নি, পাণ্ডিত্যও তাঁর কিছু নেই। কাজেই কি তিনি বলবেন? শুধু তাঁর মাথায় একটা খেয়াল এসেছে। কুকুরের প্যাংক্রিয়াসের নল বেঁধে আট

সপ্তাহ পর আইলেটসগুলি দিয়ে কুকুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধ হয় কিনা দেখতে হবে।

ম্যাকলিঅড শুধুই পণ্ডিত নন। কাজেও সদাই ব্যস্ত। তাই সময়ও তাঁর খুব কম। জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই?

হাত কচলে আমতা আমতা করে ব্যানটিং বললেন, আপনার ল্যাবরেটরীতে কুকুরের ওপর এইসব একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে চাই।

ম্যাকলিঅড জিজ্ঞাসা করলেন, কি পরীক্ষা?

ব্যানটিং বোঝালেন, প্রথমে তিনি কুকুরের প্যাংক্রিয়াসের নল বাঁধবেন। ছ সপ্তাহের মধ্যেই জারক রসের কোষগুলি শুকিয়ে যাবে, শুধু আইলেটস অফ

১৮ শতকের অ্যাপোথিকেরি

ল্যাঙ্গারহানস সুস্থ থাকবে। তখন তিনি প্যাংক্রিয়াস কেটে বার করে আইলেটস-এর একসট্রাকট ঐ কুকুরকে ইনজেকশন দিয়ে দেখবেন, ডায়াবেটিস বন্ধ করা যায় কিনা।

ম্যাকলিঅড বললেন, ঐ. নল বাঁধলেই যে কোষগুলি সত্যি শুকিয়ে যাবে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে কি? আর ঐ কোষগুলি আগে শুকিয়ে নেবার প্রয়োজনই বা কোথায়? এইসব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হলে যে পরিমাণ শারীর বিজ্ঞান ও অ্যানাটমির জ্ঞান থাকা আবশ্যক তোমার তা আছে কি?

এ কথার কি উত্তর ব্যানটিং দেবেন? তাঁর মাথায় শুধু একটা খেয়াল এসেছে। এছাড়া তাঁর আর কি যোগ্যতা আছে? তিনি সামান্য একজন

ডাক্তার। গবেষণা করবার মত উপযুক্ত জ্ঞান তাঁর কোথায়? সে অভিজ্ঞতাই বা কৈ?

তবু ব্যানটিং সাহস করে বললেন, একবার শুধু তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চান; আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহানসের মধ্যে সত্যি কোন হরমোন আছে কি নেই।

ম্যাকলিঅড .অবাক হয়ে বললেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এবং শারীর-তত্ত্ববিদরা যা আজ পর্যন্ত পারেন নি, তাই তুমি পারবে আশা কর?

এ কথার সত্যি কোন জবাব নেই। তবু ব্যানটিং তাঁর জেদ না ছেড়ে জোর দিয়ে বললেন, একবার শুধু চেষ্টা করে দেখতে চাই।

ম্যাকলিঅড ব্যানটিং-এর সাহস দেখে অবাক হলেন। কিন্তু ভেবে পেলেন না কি করে এই অর্বাচীন যুবককে তিনি সাহায্য করবেন।

বললেন, আমার কাছে কি তুমি চাও সোজা করে বল দেখি?

ব্যানটিং বললেন, আপনার ল্যাবরেটরীতে মাত্র আট সপ্তাহ আমি কাজ করে দেখতে চাই। আর চাই দশটি কুকুর এবং একজন অ্যাসিসট্যাণ্ট।

ম্যাকলিঅড ব্যানটিং-এর এই সামান্য দাবিতে আরও বেশী আশ্চর্য হলেন। তাড়াতাড়ি বিদায় করবার জন্য বললেন, বেশ তাই তুমি পাবে।

কিন্তু এই দশটি কুকুর এবং একজন অ্যাসিসট্যাণ্ট পেতে ছটি মাস লেগে গেল। ব্যানটিং নিজের সার্জারী প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন। ছাত্র পড়ানো তাঁর বন্ধ হয়ে গেল। এখন মাথায় শুধু একটি ভাবনা। কবে থেকে এই কুকুর নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যাবে।

ব্যানটিং-এর কাণ্ড দেখে সবাই তাজ্জব বনে গেল। লোকটা সত্যি পাগল হয়ে গেল নাকি? বন্ধুরা অনেক বোঝালো, প্রফেসররা অনেক উপদেশ দিলেন। কিন্তু ব্যানটিং কারু কথা শুনলেন না। প্র্যাকটিস ছেড়ে ছ মাস শুধু প্যাংক্রিয়াস নিয়েই পড়াশুনো করলেন। কোথায় কবে কে এই নিয়ে কাজ করেছে তাই খুঁজে দেখতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে ছ মাস কেটে গেল। অবশেষে একদিন ডাঃ ম্যাকলিঅডের ল্যাবরেটরীতে কাজ করবার সুযোগ এল। নিজের চেম্বারের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র সব বিক্রি করে ব্যানটিং টরেণ্টো মেডিক্যাল স্কুলে এলেন। সেদিন ১৬ই মে। ১৯২১ সাল।

ছাদের ওপর ছোট্ট খুপরির মত একখানা ঘর। তার না আছে জানালা,

না আছে আলো বাতাস। এই ঘরে ব্যানটিংকে কুকুরের পেট অপারেশন করে প্যাংক্রিয়াস বার করতে হবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে।

ছাদ থেকে নিচে নামবার ঘোরানো লোহার সিঁড়ি। এক তলায় ডাঃ ম্যাকলিঅডের প্রকাণ্ড বড় ল্যাবরেটরী। তারই একটি কোণে ছোট্ট একখানা ডেস্ক ব্যানটিং এর জন্য দেওয়া হল। কুকুরের রক্ত এবং মূত্রে কি পরিমাণ চিনি থাকে তা এখানে রাসায়নিক উপায়ে পরীক্ষা করা হবে।

এই পরীক্ষা করবে একুশ বৎসর বয়সের একটি ছেলে। এখনও সে ডাক্তার হয়নি। মাত্র ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। নাম তার চার্লস এইচ বেস্ট। ব্যানটিং-এর সে-ই সহকর্মী। কিন্তু রাসায়নিক উপায়ে রক্তে চিনি আছে কি নেই তার পরীক্ষা ব্যানটিং যা জীবনে কখনও করেননি, এই ছেলেটি তা সব জানে।

ডাঃ ম্যাকলিঅড তাঁর কথা রেখেছেন। ব্যানটিং যা চেয়েছিলেন ঠিক তাই তিনি দিয়েছেন। দশটি কুকুর, একজন অ্যাসিসট্যাণ্ট এবং আট সপ্তাহ কাজ করবার সুযোগ। বিনা বেতনে।

এই ব্যবস্থা করে ডাঃ ম্যাকলিঅড ইওরোপে চলে গেলেন। ব্যানটিং এসে কাজ শুরু করলেন।

তখন গ্রীষ্মকাল। ছাদের ওপর চিলেকোঠায় অসহ্য গরম। সেইখানেই ব্যানটিং কয়েকটা কুকুরের পেট অপারেশন করে প্যাংক্রিয়াসের নল বেঁধে দিলেন। অপারেশনে কোন বিঘ্ন ঘটল না। কুকুরের কাটা পেট দিব্বি জুড়ে গেল।

ব্যানটিং ভেবেছিলেন, অপারেশনের পর প্যাংক্রিয়াসের জারক রস সৃষ্টিকারী কোষগুলি সব শুকিয়ে যাবে। প্যাংক্রিয়াসও তাই চুপসে শুকিয়ে ছোট্টটি দেখতে হবে। কিন্তু দেড় মাস পর যখন আবার ব্যানটিং কুকুরের পেট খুললেন, দেখা গেল,প্যাংক্রিয়াস আগে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনি আছে। একটুও শুকোয় নি। ছোট হয়নি। দেখে ব্যানটিং যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল।

কি করে এমন হল? বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে ব্যানটিং ভাবলেন, তাহলে কি নলের বাঁধন খুলে গেছে?

ব্যানটিং খুঁজে দেখলেন, নলের বাঁধন ঠিকই আছে। কিন্তু পাশে এ কি? নতুন নতুন টিশু (কলা) গজিয়ে নতুন এক নল তৈরী হয়েছে।

কি করে তা সম্ভব হল? ব্যানটিং-এর মনে হল, প্রথম যখন তিনি নল বাঁধেন নিশ্চয়ই খুব জোরে গিঁট দিয়েছেন। ফলে নলের গা থেকে সিরাম বেরিয়ে এই নতুন টিশু গজিয়েছে এবং তার ভেতরে এই নতুন নল তৈরী হয়েছে।

ব্যানটিং এই টিশুগুলি কেটে আবার নতুন করে বাঁধলেন। যেখানে তাঁর সন্দেহ হল, সেখানেই নতুন এক গিঁট দিলেন। তারপর আবার কুকুরের পেট সেলাই করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেদিন ৬ই জুলাই। ১৯২১ সন। আট সপ্তাহের মধ্যে সাতটি সপ্তাহ পার হয়েছে। একটি সপ্তাহ মাত্র বাকি। কি করে তাঁর কাজ শেষ হবে?

দেখতে দেখতে সেই সপ্তাহটিও শেষ হল। কিন্তু ব্যানটিং-এর কাজ কিছুই এগোলো না। ডাঃ ম্যাকলিঅড তখনও ফেরেন নি। আট সপ্তাহ সময় তিনি দিয়ে গেছেন। তার পরেই যে ব্যানটিংকে কাজ বন্ধ করে চলে যেতে হবে তাও অবশ্য তিনি বলেন নি। তাই ব্যানটিং থাকতে পারলেন। কিন্তু বেস্টের মাইনে বন্ধ হয়ে গেল। ব্যানটিং নিজে তার খরচ চালাতে লাগলেন।

প্রথমে ব্যানটিং ভেবেছিলেন, জারক রসের কোষগুলি শুকোবার জন্য ছ থেকে আট সপ্তাহ অপেক্ষা করা দরকার। কিন্তু এখন আর অতদিন বসে থাকা চলে না। কাজেই তিনি ঠিক করলেন, তিন সপ্তাহ পরেই অপারেশন করে দেখবেন, প্যাংক্রিয়াসের কি অবস্থা। যদি প্যাংক্রিয়াস শুকিয়ে থাকে, সেদিনই তা বার করে অন্য এক প্যাংক্রিয়াসহীন কুকুরের ওপর পরীক্ষা করবেন।

দেখা গেছে, প্যাংক্রিয়াস কেটে বাদ দিলে দশ দিনের বেশী কুকুর বাঁচে না। কাজেই নল বাঁধা ঐ কুকুরের যেদিন তিন সপ্তাহ পূর্ণ হবে তার ন দিন আগেই তিনি অন্য একটি কুকুরের প্যাংক্রিয়াস কেটে বার করে রাখলেন। এই ন দিনে পেটের ক্ষত শুকিয়ে গেল; কিন্তু ডায়াবেটিসে কুকুরটা ক্রমশ নির্জীব হয়ে গেল। মূত্রের সঙ্গে চিনির পরিমাণ বাড়তে লাগল। রক্তে চিনি বাড়ল। সামান্য একটু চিনির জল খেয়েও বেচারা দেহে তা রাখতে পারে না। সব মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

ব্যানটিং বুঝলেন, ২।১ দিনের মধ্যেই কুকুরটার মৃত্যু হবে নিশ্চয়।

সেদিন ২৭শে জুলাই। ১৯২১ সাল। প্যাংক্রিয়াসের নল বাঁধার পর তিন সপ্তাহ পূর্ণ হয়েছে। ব্যানটিং ঠিক করলেন, আজই অপারেশন করবেন।

যদি প্যাংক্রিয়াস শুকিয়ে থাকে তাহলে আজই তা বার করে ঐ মৃতপ্রায় কুকুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখবেন।

ব্যানটিং-এর আজ ভাগ্য ভাল। পেট কেটে দেখলেন, সেই জিভের মত বড় প্যাংক্রিয়াস আর নেই। শুকিয়ে যেন বুড়ো আঙুলের মত হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি ঐ শুকনো প্যাংক্রিয়াস বার করে একটা খলের মধ্যে মেড়ে ব্যানটিং এবং বেস্ট তার একসট্রাক্ট তৈরী করলেন। পাত্রটি ডুবিয়ে রাখলেন বরফে।

তারপর একটু নোনা জলে মিশিয়ে ব্লটিং দিয়ে ছেঁকে এই একসট্রাক্ট কুকুরের দেহের সমান উত্তাপে একটু গরম করে সিরিঞ্জে ভরে নিলেন। এইবার মৃতপ্রায় ঐ প্রথম কুকুরের গলার শিরার ভিতর সিরিঞ্জের ছুঁচ ঢুকিয়ে এই একসট্রাক্ট ইনজেকশন করে দিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে দ্বিতীয় কুকুরের শুকিয়ে যাওয়া প্যাংক্রিয়াসের একসট্রাক্ট অর্থাৎ শুধু সুস্থ আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহানসের একসট্রাক্ট ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মৃতপ্রায় ঐ প্রথম কুকুরের রক্তে মিশে গেল।

এক ঘণ্টা পর এই কুকুরের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করে বেস্ট ঐ ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে ওপরে এসে বললেন, রক্তে চিনি কমে গেছে। ঠিক যেমন স্বাভাবিক রক্তে থাকে তেমনি হয়েছে।

আলো বাতাসহীন ঐ চিলে কোঠায় এই দারুণ গ্রীষ্মে বসে ব্যানটিং মৃতপ্রায় সেই কুকুরটাকে শুধু দেখছিলেন। যে কুকুর মুহূর্তকাল আগেও শুকনো গলা ভেজাবার জন্য জল খেতে মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারেনি, সে এখন মাথা তুলে ব্যানটিং-এর দিকে তাকালো। তাকালোই শুধু নয়, উঠে বসে ল্যাজ নাড়তে লাগল। ব্যানটিং অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কি আশ্চর্য, এতক্ষণ যার মরে ভূত হয়ে যাওয়ার কথা, সেই কুকুর এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। হাঁটছে। নিজের চোখে দেখেও যেন ব্যানটিং-এর বিশ্বাস হয় না।

আগের দিন এক ফোঁটা চিনির জলও এই কুকুর তার দেহে রাখতে পারেনি। সব মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। আর আজ? এই ইনজেকশন দেওয়ার পর মূত্রের মধ্যে এক কণাও চিনি নেই। চিনির জল খাইয়ে দেখা গেল, মূত্রে চিনি আসে না, রক্তেও চিনি বাড়ে না। যে চিনি আগে দেহ

থেকে বেরিয়ে যেত এখন তা যায় না। খাদ্য থেকে উৎপন্ন এই চিনি এখন দেহের কোষে কোষে জ্বলে। শক্তি উৎপন্ন করে।

পাঁচ ঘণ্টা ধরে বেস্ট এই কুকুরের মূত্র এবং রক্ত পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল, দেহ থেকে চিনি আর বেরোয় না। আর ব্যানটিং একা ওপরে ঐ চিলে কোঠায় বসে কুকুরটাকে দেখতে লাগলেন। আদর করলেন। ল্যাজ নেড়ে কুকুরটা যেন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাল। ব্যানটিং অভিভূত হয়ে গেলেন।

পরদিন কুকুরটা মরে গেল।

সত্যি তো ঐটুকু প্যাংক্রিয়াসের এক্সট্রাক্ট কতক্ষণ দেহে থাকবে? কতক্ষণই বা তাকে সজীব রাখবে?

তাহলে?

প্যাংক্রিয়াসহীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত একটা কুকুরকে চব্বিশ ঘণ্টা বাঁচাতে তা'হলে কটা কুকুরের প্যাংক্রিয়াস লাগবে?

ব্যানটিং-এর মনে হল, এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব অর্থহীন। কারু কোন কাজে লাগবে না। সব শ্রম পণ্ড হল। বৃথাই তিনি এতদিন খেটে মরলেন।

কিন্তু সত্যি কি তাই? কে আগে পরীক্ষা করে দেখেছে কুকুরের প্যাংক্রিয়াসের আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহানস-এর জন্যই দেহে চিনি জ্বলে? শক্তি উৎপন্ন হয়? কে প্রমাণ করে দেখিয়েছে এই আইলেটসই শুধু ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে পারে? অন্তত পাঁচটি ঘণ্টাও একটা প্রাণীকে বাঁচানো যায়?

কিন্তু একটা পরীক্ষায় কিছুই প্রমাণ হয় না। আরও অনেক পরীক্ষা চাই। তা না হলে বৈজ্ঞানিক কোনো তথ্যেরই প্রমাণ হয় না।

ব্যানটিং আবার পরীক্ষা শুরু করলেন। দুটো কুকুরের প্যাংক্রিয়াস দিয়ে এবার একটা কুকুর তিনদিন বাঁচানো গেল।

ডাঃ ম্যাকলিঅড তখনও ইওরোপ থেকে ফেরেন নি। তখনও তিনি জানেন না, তাঁরই ল্যাবরেটরীতে তখন কি এক ইতিহাস তৈরী হচ্ছে। গবেষণায় অনভিজ্ঞ অখ্যাত এক ছোকরা ডাক্তার আর এক মেডিক্যাল ছাত্র কি অসাধ্য সাধন করেছে।

ব্যানটিং আবার একটি কুকুরের প্যাংক্রিয়াস কেটে বার করলেন। এইবার আটদিন একে বাঁচানো গেল। পাঁচটি কুকুরের বিনিময়ে।

এত কাণ্ডের পর একটিমাত্র তথ্য জানা গেল। আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহানস থেকেই হরমোন তৈরী হয়। তাই দেহের কোষে কোষে চিনি পোড়ে। শক্তি উৎপন্ন হয়। ব্যানটিং এই হরমোনের নাম দিলেন, আইলেটিন।

কিন্তু এই জ্ঞানলাভে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রুগীর কোন সুরাহাই হল না। ডাঃ ম্যাকলিঅডও ইওরোপ থেকে ফিরে এসে নিজের গবেষণা নিয়েই মেতে রইলেন। ব্যানটিং-এর কাজের ওপর কোনো গুরুত্বই দিলেন না।

শীতকাল এল। ব্যানটিং-এর অবস্থা তখন কাহিল। এক পয়সা রোজগার নেই। চেম্বারের জিনিসপত্র বেচে যে টাকা হাতে এসেছিল অনেক আগেই তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার ওপর সহকারী বেস্টের খরচও তাকে চালাতে হচ্ছে। এখন তিনি কি করবেন?

এই সঙ্কটকালে ফার্মাকোলজির (ভেষজ বিজ্ঞান) অধ্যাপক হেনডারসন ব্যানটিংকে এক কাজ দিলেন। তাঁর ডিপার্টমেন্টে লেকচারারের চাকরি। নামেই শুধু লেকচারার। আসলে কোন লেকচার ব্যানটিংকে দিতে হল না। শুধু একবার হাজিরা দিয়ে ব্যানটিং নিজের কাজ, ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পেলেন।

কিন্তু কি পরীক্ষা তিনি করবেন? একটা প্যাংক্রিয়াসহীন কুকুরকে আটদিন বাঁচাতে যদি পাঁচটা কুকুর মারতে হয় তাহলে এ পরীক্ষায় কার কি লাভ? হাজার হাজার লোকের ডায়াবেটিস কি করে তাহলে সারানো যাবে?

একদিন রাত্রে পুরনো সব বৈজ্ঞানিক তথ্য ঘাঁটতে ঘাঁটতে ব্যানটিং দেখলেন, এক ডাক্তার লিখেছেন, নবজাত শিশুর প্যাংক্রিয়াসে জারক রস সৃষ্টিকারী কোষগুলি খুবই অপরিণত এবং সংখ্যায় অনেক কম থাকে। কিন্তু আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহানস থাকে প্রচুর এবং পরিপুষ্ট।

ব্যানটিং-এর চোখের সামনে হঠাৎ এক আশার আলো খেলে গেল। জীবদেহে তাহলে প্যাংক্রিয়াসের আইলেটস আগে তৈরী হয়। জারকরস সৃষ্টিকারী কোষগুলি হয় পরে। তাহলে তিন চার মাসের ভ্রূণে নিশ্চয়ই শুধু আইলেটসই থাকে। জারক রসের কোষ তখনও নিশ্চয়ই হয় না। তাহলে তো ডায়াবেটিসে এই ভ্রূণের প্যাংক্রিয়াসের নল বেঁধে জারক রসের কোষগুলি শুকিয়ে নেবারও কোন দরকার থাকে না। কিন্তু এত ভ্রূণই বা তিনি পাবেন কোথা?

ব্যানটিং কৃষকের ছেলে। ছেলেবেলায় দেখেছেন মাংসে বেশী চর্বি থাকে বলে ২।৩ মাসের গর্ভবতী গাভীও লোকে বধ করে। কাজেই পরদিন তিনি বেস্টকে নিয়ে কসাইখানায় ঘুরে ন'টি তিন চার মাসের ভ্রূণ অনায়াসে জোগাড় করে আনলেন। নোনা জল (সেলাইন) দিয়ে খলে মেড়ে একসট্রাক্ট তৈরী হল। প্যাংক্রিয়াসহীন কুকুরের দেহে এই একসট্রাক্টও ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করল। রক্তে চিনি (ব্লাড সুগার) কমে গেল। মূত্র চিনিশূন্য হল।

গাভীর ভ্রূণের এই আশ্চয ক্ষমতা দেখে ব্যানটিং-এর মাথা খুলে গেল। সদ্য বধ করা গোবৎসের প্যাংক্রিয়াস থেকে জারক রসের কোষগুলি বিনষ্ট করে শুধু ঐ আইলেটস কি করে আলাদা করা যায় তার উপায় তিনি এখন খুঁজতে লাগলেন।

এতদিন ব্যানটিং নোনা জল (সেলাইন) দিয়ে একসট্রাক্ট তৈরী করেছেন। এখন তার বদলে একটু অ্যাসিড মেশানো অ্যালকোহল ব্যবহার করলেন। তাতেই কিন্তু ফল হল। জারক রসের কোষগুলি শুকিয়ে গেল। কিন্তু আইলেটস-এর কোন ক্ষতি হল না।

তখন জানুয়ারী মাস। ১৯২২ সাল। এই নতুন উপায়ে ব্যানটিং এবার প্যাংক্রিয়াসহীন একটি কুকুর সত্তর দিন বাঁচিয়ে রাখলেন।

যে জিনিস কুকুরের ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করে মানুষেব ওপরও কি তা ঠিক ঐরকম কাজ করবে?

ব্যানটিং প্রথমে নিজের দেহে এই আইলেটিন একটু ফুঁড়ে দেখলেন। তারপর সহকারী বেস্টেব দেহে। দুজনের কারুর কিছু ক্ষতি হল না।

এই সময় ব্যানটিং-এব এক বাল্য বন্ধু পাঁচ বৎসর ডায়াবেটিসে ভুগে হঠাৎ একদিন হাজির হলেন। এই বন্ধুটি নিজেও একজন ডাক্তাব। নাম তাঁর জো গিলক্রাইস্ট। পাঁচ বছর ধরে এই বয়সে এই সাংঘাতিক রোগে ভুগে তিনি জানতেন, আর বেশীদিন তাঁর ভাগ্যে নেই। একটা ছোট শিশু যা সারাদিন খায় তার চেয়েও তিনি কম খেতেন। তবু মূত্রে চিনি বেরুত। দিনের পর দিন তার চেহারা খারাপ হতে লাগল। চামড়া শুকিয়ে গেল। নিঃশ্বাসে অ্যাসিটোনের গন্ধ বেরুল। তিনি নিশ্চিত বুঝলেন, একদিন এবার 'কোমা' হবে। তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। তারপর মৃত্যু হবে।

ব্যানটিং কুকুরের ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করেছেন শুনে তিনি নিজের দেহে এই ইনজেকশন নিতে রাজী হলেন। সেদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী। ১৯২২ সাল।

ব্যানটিং এবং বেস্ট প্রথমে জোকে এক গ্লাস গ্লুকোজের জল খাওয়ালেন। তারপর একটা ফুটবলের ব্লাডারের মত ব্যাগে ফুঁ দিয়ে ফোলাতে বললেন। ব্যাগটা কতখানি ফুলল এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে কি পরিমাণ অক্সিজেন অথবা কারবন ডায়াক্সাইড বেরুল তা একটি যন্ত্রে দেখা গেল। তারপর ঐ আইলেটিন জোর দেহে ইনজেকশন দেওয়া হল।

যদি এই আইলেটিন দেহে চিনি পোড়াতে সক্ষম হয় তাহলে কারবন ডায়াক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাবে। জোর দেহে শক্তি আসবে।

দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা পার হল। তারপর দু ঘণ্টা। আধ ঘণ্টা পর পর জো ব্যাগে ফুঁ দিলেন। কিন্তু কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। দুঘণ্টা দেখে ব্যানটিং উঠে পড়লেন। বাল্যবন্ধু জোর চোখে চোখ রেখে তাকাতে পর্যন্ত পারলেন না। ব্যানটিং বুঝলেন, এ সেই পুরোনো তথ্য। কুকুরের দেহে যা হয়, মানুষের দেহে তা হয় না। আইলেটিন ইনজেকশন করে কুকুরের ডায়াবেটিস প্রতিরোধ হলেও মানুষের ডায়াবেটিস বন্ধ করা যায় না।

ব্যানটিং তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। একটা কথাও না বলে ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে গেলেন। সোজা স্টেশনে এসে নিজের বাড়ির দিকে উত্তর ক্যানাডাগামী এক গাড়িতে উঠে বসলেন।

ব্যানটিংকে চলে যেতে দেখে জো নিজেও উঠে পড়বেন ভাবলেন, কিন্তু বেস্ট তাকে বাধা দিলেন। বললেন, আরও একটু বসে যাও। আর একবার পরীক্ষা করে দেখি।

কিছুক্ষণ পর আবার যখন জো ব্যাগে ফুঁ দিলেন তাঁর মনে হল যেন তিনি বুকে অনেক বেশী জোর পাচ্ছেন। ব্যাগটা আগের চেয়ে ডবল ফুলে উঠল। হঠাৎ জো চাৎকার করে বললেন, চার্লি, তোমার ইন্জেকশনে আমার এ কী হল? জোর মনে হল তাঁর মাথাটা যেন হঠাৎ খুলে যাচ্ছে। চোখে ভাল দেখছেন। কানে ভাল শুনছেন। যে দেহটা এতদিন পাথরের মত ভারী ছিল হঠাৎ যেন তা পালকের মত হালকা হয়ে গেছে।

আনন্দে বিস্ময়ে জো লাফিয়ে উঠলেন। ছুটে গিয়ে বাড়ি যাবার ট্রেন ধরলেন। বাড়িতে তাঁর বুড়ী মা ও ছোট্ট দুটি ভাই বোন। পাঁচ বছরের

মধ্যে জো যা কখনও করেন নি, আজ তাই করলেন। ট্রেন থেকে নেমে দৌড়ে এসে বাড়ি ঢুকলেন। বাচ্চা দুটো ভাইবোনকে নিয়ে হাসি তামাসা খুনসুটি এবং ছুটোছুটি করে হুল্লোড় বাঁধিয়ে তুললেন। দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

পরদিন আবার তাঁকে অবসাদে ধরল। মাথা ভার। পা চলে না। আবার তিনি নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে চললেন ব্যানটিং-এর কাছে। ইনজেকশন নিতে। গিয়ে দেখলেন, আইলেটিন সব ফুরিয়ে গেছে। আর ইনজেকশন হবে না।

এতদিনে ডাঃ ম্যাকলিঅড ব্যানটিং-এর কাজের ওপর নজর দিলেন। তাঁর ল্যাবরেটরী এইবার যেন জেগে উঠল। প্রথমেই তিনি ব্যানটিং-এর দেওয়া নাম আইলেটিন বাতিল করে নাম দিলেন, ইনসুলিন। কারণ, ছ বছর আগেই এই কাল্পনিক হরমোনের নামকরণ হয়েছিল। স্যার এডওআর্ড শেফার এর নাম দিয়েছিলেন ইনসুলিন। ১৯১৬ সালে।

এতদিন পরে রীতিমত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডাঃ ম্যাকলিঅড ইনসুলিন নিয়ে কাজ শুরু করলেন। বড় বড় পণ্ডিত সব সহকারীরা এই কাজে তাঁকে সাহায্য করল। ব্যানটিং এবং বেস্ট এই বিজ্ঞানীদের মধ্যে খাপ খাওয়াতে পারলেন না। তাঁদের চাকরি গেল।

ব্যানটিং-এর অবস্থা তখন সঙ্গিন। চাকরি নেই। ধার বাড়ছে। বাল্যবন্ধু জো গিলক্রাইস্ট ইনসুলিনের অভাবে মৃতপ্রায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের ব্যবহারের উপযুক্ত ইনসুলিন তখনও ম্যাকলিঅডের ল্যাবরেটরীতে তৈরী হয় না। দলে দলে রুগীরা ব্যানটিং-এর কাছে আসছে। এই ইনসুলিন চাই। ব্যানটিং কি করবেন?

এদিকে ডাঃ ম্যাকলিঅড চিকিৎসকদের আমেরিকান অ্যাসোসিএশনে এই নতুন আবিষ্কার প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন। এই সঙ্ঘ আমেরিকান চিকিৎসকদের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান একবাক্যে ডাঃ ম্যাকলিঅডের প্রশংসা করল। ধন্যবাদ জানাল।

বিরাট রকফেলার প্রতিষ্ঠানের ডায়াবেটিসের নামী বিশেষজ্ঞ ডাঃ অ্যালেন বললেন, এই অভিনব আবিষ্কারের জন্যে আমরা সবাই একবাক্যে ডাক্তার ম্যাকলিঅড এবং তাঁর সহকারীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ব্যানটিং তখন ভাবছেন, কি করে ইনসুলিন তৈরী করা যায়। কি করে

জো গিলক্রাইস্টকে বাঁচানো যায় এই সময় বেস্ট একটা সুখবর নিয়ে এলেন। কনোট ল্যাবরেটরীর কর্তারা ব্যানটিং এবং বেস্টকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন।

এইখানে এসে ব্যানটিং এবং বেস্ট আবার সেই আগেকার মতো নবীন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন। টাকার এখন আর অভাব নেই। যত খুশি প্যাংক্রিয়াস কেন। ইনস্থলিন তৈরী কর। আর জো গিলক্রাইস্টের ওপর পরীক্ষা চালাও।

নতুন নতুন ব্যাচ ইনস্থলিন তৈরী হয় আর খরগোসের ওপর পরীক্ষা করেই গিলক্রাইস্টকে ইনজেকশন দেওয়া হয়। তারপর অন্য রোগীদের দিতে সাহস হয়। গিলক্রাইস্ট যেন ব্যানটিং-এর হিউম্যান র‍্যাবিট, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মানবদেহধারী ক্ষুদ্র একটি প্রাণী।

এখন গিলক্রাইস্টের মৃত্যুভয় আর নেই। তিনি নিজে ডাক্তার। বুঝেছেন, যতদিন ইনস্থলিন আছে ডায়াবেটিসে আর তাঁর মৃত্যু হবে না। এবার তিনি নিজেই অন্য রুগীদের এই ইনজেকশন দিতে শুরু করলেন, টরেণ্টোর ক্রিস্টি স্ট্রীট হাসপাতালে।

এই হাসপাতাল ডায়াবেটিসে আক্রান্ত সৈন্যদের জন্য তৈরী। তখনকার দিনে এই রোগে যেসব সৈন্য অকেজো বলে বাতিল হত তারাই এসে এই হাসপাতালে বাকি জীবন কাটাত।

এই হাসপাতালে ব্যানটিং এবং জো গিলক্রাইস্ট এইসব রোগীদের ইনস্থলিন দিতেন। আর ল্যাবরেটরীতে বেস্ট ব্যাচের পরে ব্যাচ নতুন ইনস্থলিন তৈরী করতেন।

প্রথম প্রথম ইনস্থলিনে খুবই ব্যথা হত। ফুলে উঠত। এমন কি, ঘা পর্যন্ত হত। হাসিমুখে তবু এই সৈন্যরা রোজ দুবেলা ইনজেকশন নিত। আর বেস্ট চেষ্টা করতেন, কি করে আরও ভাল ইনস্থলিন তৈরী করা যায় এবং দূর করা যায় এইসব উপসর্গ।

এইসব সৈন্যও যেন গিলক্রাইস্টের মত ল্যাবরেটরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিচিত্র সব প্রাণী। হিউম্যান র‍্যাবিটস।

গিলক্রাইস্ট বলতেন, আমরা জানতাম, ইনস্থলিন না নিলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। আমরা কোন শহীদ অথবা বীর নই। আমরা ইনজেকশনের যন্ত্রণা সহ্য করেছি প্রাণের দায়ে। কী সে দায়, আমাদের মত অবস্থায় না পড়লে কেউ কখনও তা বুঝবে না।

বস্তুত এইসব সৈন্যের ওপর ইনসুলিনের প্রয়োগ অমন করে সম্ভব হয়েছিল বলেই ইনসুলিনের এত দ্রুত উন্নতি হয়েছে এবং ইনসুলিন সাধারণ রোগীর জন্য বাজারে চালু হয়েছে। ১৯২২ সালের মে জুন মাসের পর ঐ কুস্টি স্ট্রীট হাসপাতালে একটি রোগীও আর ডায়াবেটিসে মরে নি।

এখন ইনসুলিন আরও অনেক বেশী উন্নত হয়েছে। ব্যথা অথবা ফোঁড়া তো হয়ই না ; সারাদিনে মাত্র একবার ইনজেকশন নিলেই চলে।

কিন্তু ওষুধ বলতে যা বোঝায় ইনসুলিন সে জিনিস নয়। ইনসুলিনে ডায়াবেটিস সারে না। প্যাংক্রিয়াসের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহানস যে ইনসুলিন দেহে তৈরী করতে পারে না জান্তব ইনসুলিন ইনজেকশন করে তাব কাজ পূরণ করা হয় মাত্র।

তিন শ বছর আগে ইওরোপে যারা ওষুধ দিত তাদের বলা হত অ্যাপোথিকেরী। এই অ্যাপোথিকেরীরা রোগের লক্ষণ শুনে রুগীকে ওষুধ দিত, হয় কোন বড়ি বা পাঁচন অথবা গুঁড়ো কিংবা মিকশ্চার। এই ওষুধ রোগীরা খেত রোগমুক্তির আশায়। নয়ত দেহের ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে বলা হত। তাও লোকে লাগাত সেই আরোগ্যেরই আশায়।

আজও লোকে এই আশাতেই চিকিৎসকের কাছে যায়। ওষুধ খায়। কিন্তু ডায়াবেটিস এমন রোগ যা কখনও সারে না। তাই একবার এই রোগ ধরলে সারা জীবন ইনসুলিন নিতে হয় এবং সারা জীবন খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কবতে হয়।

সম্প্রতি ডায়াবেটিসের এক নতুন ওষুধ বেরিয়েছে। এই ওষুধে ইনজেকশন নিতে হয় না। শুধু বড়ি খেলেই চলে। এতেও রোগটা সারে না। ইনসুলিনেরই মতো রোগের উপসর্গের শুধু উপশম হয়। মূত্রে চিনি বেরোয় না। রক্তে চিনি বাড়ে না। কিন্তু যাঁদের বয়েস বেশী এবং দেহ মেদবহুল তাঁরাই শুধু এ ওষুধে উপকার পান।

সালফা ড্রাগ থেকে এ ওষুধ তৈরী হয়। আবার সালফা ড্রাগ সৃষ্টি হয় সালফানিলিক অ্যাসিড থেকে। আধুনিক জীবাণুধ্বংসী চিকিৎসার (কেমোথেরাপি) স্রষ্টা পল আরলিক সিফিলিসের ওষুধ স্যালভারসন আবিষ্কার করার সময় এই সালফানিলিক অ্যাসিড সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন। ভেবেছিলেন, পরে এ নিয়ে কাজ করবেন। কিন্তু সে সুযোগ তাঁর আর হল না। ডায়াবেটিসে তাঁর মৃত্যু হল। ১৯১৫ সালে। মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে।

আর মাত্র সাতটি বৎসরও যদি আরলিক বেঁচে থাকতেন তাহলে ডায়াবেটিসে কখনও তাঁর মৃত্যু হত না। ব্যানটিং-এর ইনসুলিন এই রোগ থেকে নিশ্চয়ই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখত। ঠিকমত ইনসুলিন নিয়ে ১৯২২ সালের পর এ রোগে আর কারুর মৃত্যু হয়নি।

ইনসুলিন আবিষ্কার করে ব্যানটিং চিকিৎসাবিদ্যার নোবেল পুরস্কার পেলেন ডাঃ ম্যাকলিঅডের সঙ্গে ভাগ করে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে। ১৯২৩ সালে। একবছর পরে নাইটহুডের সম্মানও তাঁকে দেওয়া হয়, ১৯২৪ সালে।

কথিত আছে, ইনসুলিন আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার যখন ব্যানটিংকে দেওয়া হবে বলে ঠিক হয় তখন সেই কথা শুনে ব্যানটিং বলেন, ওটা তাঁর একার প্রাপ্য নয় কারণ বেস্টও তাঁর সঙ্গে সমান ভাবে কাজ করেছেন। কাজেই তিনি লিখে জানালেন, বেস্টের সঙ্গে সমান ভাবে ভাগ করে না দিলে ঐ পুরস্কার তিনি নেবেন না।

তখনও গত মহাযুদ্ধ চলছে। ১৯৪৪ সাল। হঠাৎ একদিন উড়োজাহাজের এক দুর্ঘটনায় ব্যানটিং-এর মৃত্যু হল। মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে।

আশ্চর্য ফল

পুরাকালের অলৌকিক কোন ঘটনা নয়। বর্তমান বিংশ শতাব্দীরই কথা। তাও আবার আমেরিকার।

তেত্রিশ বৎসর আগে আমেরিকার বোস্টন শহরে একটি স্ত্রীলোক তার রুগ্ন স্বামীকে নিয়ে একদিন নামকরা এক বড় ডাক্তারের কাছে এল। বলল, তার স্বামী দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কিচ্ছু খেতে পারে না। পা ফোলে। হাঁফ ধরে। রঙ ক্রমশ ফ্যাকাশে হচ্ছে। গায়ের চামড়া যেন হলদে হয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার রুগী পরীক্ষা করে দেখলেন সাংঘাতিক রক্তশূন্যতা। পারনিসাস অ্যানিমিয়া। অর্থাৎ এমন মারাত্মক রক্তশূন্যতা যা জীবনে কখনও ভাল হবে না। ছ-মাস কি বড় জোর এক বৎসরের মধ্যেই রুগীর মৃত্যু হবে।

অথচ এই নিদারুণ ভীষণ কথা তাঁকে বলতে হবে। স্ত্রীলোকটিকে আড়ালে ডেকে তিনি যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে তাঁর বক্তব্য বোঝালেন। তারপর বললেন, ওষুধ খেয়ে কোনো লাভ নেই। ডাক্তার দেখিয়েও কোনো ফল নেই। এ রোগ সারে না।

ডাক্তারের কাছে রুগী যায় রোগ সারাতে। আশা থাকে ডাক্তার ভরসা দেবেন। বলবেন, কোনো ভয় নেই। কিন্তু এখানে ডাক্তার স্পষ্টই বলে দিলেন, এ রোগ সারবে না। স্ত্রীলোকটি তাই ভয়ে আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেল। শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে?

ডাক্তার বললেন, হাই প্রোটিন অর্থাৎ মাছ-মাংস বেশি খেলে কিংবা সুস্থ লোকের তাজা রক্ত রুগীর শিরায় ইনজেকশন দিলে হয়ত কিছু দিন বেশি বাঁচবে। তার বেশি আর কিছু করবার নেই।

গাঁটের পয়সা খরচা করে ডাক্তার দেখিয়ে স্ত্রীলোকটি স্বামীর এই মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরল। ভাবল, তাহলে কি বাঁচবার কোনও উপায় নেই? ডাক্তার বলছে, হাই প্রোটিন খেতে। মাছ মাংস বেশি খেতে। অত পয়সাই বা কোথা?

ভাবতে ভাবতে স্ত্রীলোকটি তার গৃহ-চিকিৎসকের কাছে গেল। জিজ্ঞাসা করল, আমিষ খাদ্য এমন কি আছে যাতে প্রোটিন এবং রক্ত বেশি অথচ দামে সস্তা?

ডাক্তার কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিলেন, লিভার।

বাড়ি ফিরে স্ত্রীলোকটি রোজ এক পো করে কাঁচা লিভার তার স্বামীকে খাওয়াতে শুরু করল। কাঁচা লিভার খেতে অতি বিস্বাদ। তবু জোর করে তার স্বামীকে সে খাওয়ালো। কয়েক দিনের মধ্যেই লোকটির দেহে শক্তি ফিরে এল। হজমশক্তি বাড়ল। তাই দেখে খেতে অত খারাপ লাগা সত্বেও লোকটি আর আপত্তি করল না। রোজ ঐ কাঁচা লিভার খেতে লাগল।

দেখতে দেখতে একটি বৎসর কেটে গেল। এইবার একদিন স্ত্রীলোকটি আবার তার স্বামীকে নিয়ে সেই প্রথম ডাক্তারের কাছে হাজির হল।

ডাক্তার তো রুগী দেখে আর চিনতেই পারেন না। এই কি সেই রুগী? বছরখানেক আগে যার তিনি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন? ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, পার্নিসাস অ্যানিমিয়ার চিহ্নমাত্রও রক্তে নেই। জীবনে এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও তিনি দেখেন নি। পারনিসাস অ্যানিমিয়া সেরে গেল? কি করে এমন অলৌকিক কাণ্ড সম্ভব হল?

গম্ভীরকণ্ঠে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, একে কি খাইয়েছেন?

হেসে স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, কাঁচা লিভার।

এই গল্প শোনা গেল ১৯২৫ সালে।

কিন্তু এই গল্পের পেছনে আরও একটি গল্প আছে। তার শুরু ১৯১২ সালে আমেরিকার মাসাচুসেট্‌স হাসপাতালে।

পার্নিসাস অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত একটি স্ত্রীলোক বিছানায় শুয়ে দিনের পর দিন মৃত্যুমুখে এগিয়ে যাচ্ছে। আর একটি নবীন ডাক্তার রোজ তার রক্ত পরীক্ষা করছে এবং রুগীর রোজকার অবস্থা খাতায় লিখছে।

এই ডাক্তারটির নাম জর্জ রিচার্ডস মিনো (১৮৮৫—১৯৫০)। এই হাসপাতালেরই প্রাচীন এক বড় ডাক্তারের ছেলে। সবে ডাক্তারী পাশ করেছেন, কিন্তু একদিকেই তাঁর ঝোঁক। এই সাংঘাতিক ব্যাধি, এই প্রাণধ্বংসী রক্তশূন্যতা কেন হয়?

তাই এই রোগীদের প্রতি অসীম তাঁর যত্ন। প্রতিটি উপসর্গের প্রতি এত

সজাগ দৃষ্টি। এই রকম একটি রুগীর পেছনে মিনো যত সময় ব্যয় করেন, এবং যত বেশী খাটেন, মনে হয় যেন হাসপাতালে তাঁর অন্য রুগী আর নেই। অন্য কোনো কাজও নেই।

প্রতিটি রুগী রোজ কি খায়, কোন জিনিস কতটুকু খায়, কেন অন্য জিনিস খেতে পারে না ইত্যাদি তিনি রোজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তারপর খাতায় নোট করেন।

আঙুল ফুটিয়ে এই রুগীর রক্ত নিয়ে তিনি মাইক্রোসকোপে চাপান এবং রক্তের লাল কণিকার পরিবর্তন লক্ষ্য করেন।

৬৩ বৎসর আগে লণ্ডনের গাইস হাসপাতালের নামী ডাক্তার টমাস অ্যাডিসন (১৭৯৩—১৮৬০) সর্বপ্রথম এই রোগের নিখুঁত বর্ণনা দেন। ১৮৪৯ সালে। সেই থেকে এই রোগের নাম হয়, অ্যাডিসনস অ্যানিমিয়া। তারপর থেকে সবাই জানে একবার ধরলে এ রোগে আর কারুর রক্ষা থাকে না। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না।

মিনো রুগীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, অ্যাডিসনের বর্ণনা, কি নিদারুণ সত্য। কি সাংঘাতিক নির্ভুল।

রোগীর অগোচরে ধীর মন্থর পায়ে ভীষণ এই রোগ দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু রোগী বোঝে না। তাই কবে সে অসুস্থ হয় কিছুই সে জানে না। দিনক্ষণ কিছুই সে বলতে পারে না। শুধু বোঝে কাজে আর মন লাগে না। শরীর ক্রমশ দুর্বল বোধ হয়। চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়। সর্বঅঙ্গ রসস্থ হয়। চোখের পাতা, ঠোঁট জিভ সব রক্তশূন্য হয়ে সাদা হয়ে যায়। জিভে ঘা হয়। খিদে কমতে থাকে। সামান্য পরিশ্রমেও তখন হাঁফ ধরে। মাথা ঘোরে। ক্রমে রোগী আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পর্যন্ত পারে না। চিন্তাশক্তি কমে যায়। কেমন যেন সব ভুল হয়ে যায়। শেষে আর জ্ঞান থাকে না। অবশেষে একদিন মৃত্যু হয়।

মিনো রোগীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, অ্যাডিসনের এই বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। কোথাও একটু ভুল হয় না। বেশীর ভাগ রুগীই দু তিন বৎসর বাঁচে। কদাচিৎ কেউ বাঁচে পাঁচ দশ বৎসর। তার বেশী আর কেউ বাঁচে না।

মিনো ভাবেন কেন এমন হয়? এই হতভাগ্যদের রক্তে লাল কণিকা কেন দিনের পর দিন কমে যায়?

মানুষের রক্তে লাল কণিকা (রেডসেল) তৈরী হয় মজ্জা থেকে। হাড়ের ভেতর সেই মজ্জায় এমন কি দোষ হয় যে এই লাল কণিকা আর দেহে তৈরী হয় না?

অ্যাডিসনের পর তেষট্টি বৎসর ধরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা এ রহস্যের সন্ধান করেছেন। কিন্তু তার হদিস পান নি কোনো। মিনো বিজ্ঞানী নন, সামান্য এক নবীন ডাক্তার। কি করে তিনি এ রহস্যের সমাধান করবেন?

টমাস অ্যাডিসন (১৭৯৩-১৮৬০)

মিনো দেখেছেন, রুগীর রক্তে লাল-কণিকা ক্রমশ কমে যায়। মাঝে মাঝে নতুন শিশু-কণিকা (রেটিকুলোসাইট) মজ্জা থেকে রক্তে আসে। মিনোর মনে আশা জাগে এইবার হয়ত এই শিশু-কণিকা সব লাল-কণিকায় পরিণত হবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় না। আবার সব তারা রক্ত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। রুগীর অবস্থা আরও খারাপ হয়।

এই রোগে মৃত এক রুগীর মজ্জা থেকে একখানা স্লাইড তৈরী করে মিনো একদিন বোসটনের জেমস হোমার রাইটএর ল্যাবরেটরীতে গেলেন। রাইট তখনকার দিনের নামকরা এক প্যাথোলজিস্ট। কিন্তু ভারি দুর্মুখ।

স্লাইডখানা রাইটকে দেখিয়ে মিনো জিজ্ঞাসা করলেন, এই শিশু-কণিকা সব কেন বাড়ে না? কেন লাল-কণিকায় পরিণত হয় না? রাইট বিরক্ত

হয়ে বললেন, কেন বাড়ে না তা আমি জানি না। কেউই তা জানে না। এইটুকু শুধু জেনে রাখ, এদের মজ্জা থেকে শুধু এই শিশু-কণিকাই (রেটিকুলো-সাইট) তৈরী হয়। এই শিশুরা চিরদিন শিশুই থাকে। কখনও সাবালক হয় না। তাই লাল কণিকায় পরিণত হয় না কখনও। এ যেন এক রকম ক্যানসার। যাদের হয়, তাদের মৃত্যু অনিবার্য। ব্যস এখন ভাগো।

মিনোর মনে তবু প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হবে? কোথায় এদের ত্রুটি? হাড়ের গড়নে কোনো দোষ নেই এদের। মজ্জাতেও দোষ দেখা যায় না কোনো। তাহলে?

মাসাচুসেট্স হাসপাতালে মিনো রোজ রোগী দেখেন আর তার রক্ত পরীক্ষা করেন। কিন্তু এ কঠিন প্রশ্নের কোনও উত্তর পান না।

অবশেষে তিনি বোসটন শহরে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। জেনারেল প্র্যাকটিস মানেই হরেক রকম রুগী দেখা। আর তার ওষুধ দেওয়া। বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাতে হয় না। তবু এরই মধ্যে পারনিসাস অ্যানিমিয়ার ৪৬টি রুগী তিনি পেলেন। তিন বছরে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সালে। সত্তরবার এদের শিরায় অপরের সুস্থ রক্ত ট্রানসফিউশন দেওয়া হল। অর্ধেক রুগী ২।১ সপ্তাহ একটু ভাল বোধ করল। তারপর তাদের মৃত্যু হল।

তারপর মিনো নিজেই অসুখে পড়লেন। তাঁকে ডায়াবেটিসে ধরল। মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে। ১৯২১ সালে। তখনকার দিনে এই বয়সে ঐ রোগ ধরলে প্রাণের কোনো আশাই থাকত না। চিকিৎসা ছিল শুধু আহার কমানো। মিনোও তাই খাওয়া কমালেন। কাজকর্ম বন্ধ করে না খেয়ে কোনও রকমে প্রাণটা শুধু বাঁচিয়ে রাখলেন।

এমনি সময় ব্যানটিং ইনসুলিন আবিষ্কার করলেন। এই ইনসুলিন নিয়ে মিনো আবার দেহে শক্তি পেলেন। তাঁর প্রাণ রক্ষা হল। নতুন উৎসাহে আবার তিনি পারনিসাস অ্যানিমিয়ার কারণ নিয়ে মেতে উঠলেন।

এইসব রুগীরা রোজ কি খায় তার খোঁজ নিয়ে মিনো দেখলেন, এরা সাধারণত মাংস খায় না। অনেকেই মাংস খুব অপছন্দ করে আর মাখন চর্বি যেন বেশী ভালবাসে।

কাজেই তিনি এই রুগীদের নতুন এক খাদ্যতালিকা তৈরী করে দিলেন। বললেন, মাংস বেশী খেতে হবে। মাখন চর্বি চলবে না।

উত্তর আমেরিকার লোকেরাই এ রোগে তখন ভুগত বেশী। আর তারাও

সব যেন মাংসের চেয়ে মাখন চর্বিই বেশী পছন্দ করত। মিনোর মনে হল, এই রোগের কারণ সত্যি হয়ত এই খাদ্য। তাই খাদ্য বিষয়ের নানা বই যোগাড় করে তিনি পড়তে শুরু করলেন।

এক জায়গায় দেখলেন, লিভার খাওয়াবার ফলে শাদা ইঁদুরের বাড়ন্ত গড়ন হয়েছে। শাদা ইঁদুরের লিভার খাইয়ে আবার গিনি পিগের রক্ত বেড়েছে।

আর এক জায়গায় দেখলেন, চিড়িয়াখানায় নবজাত সিংহের শাবককে শুধু মাংস খাইয়ে বাঁচানো যায় নি। তাদের হাড় বাড়ে নি। শেষে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু যখন ঐ শাবককে লিভার চর্বি এবং হাড় খাওয়ানো হয়েছে তারা দিব্যি বড় হয়েছে।

পড়তে পড়তে মিনোর মাথায় একটা খেয়াল ঢুকল। লিভার না খেলে সিংহশাবকের হাড় বাড়ে না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল প্যাথোলজিস্ট রাইটের কথা, হাড়ের ভেতর মজ্জার দোষ হলে মানুষের হয় পারনিসাস অ্যানিমিয়া। অথচ লিভার খাওয়ালে হাড় বাড়ে। মজ্জাও নিশ্চয় ভাল থাকে। তাহলে এইসব রুগীকে লিভার খাওয়ালে কেমন হয়?

মিনোর হাতে একটি রুগী ছিল, তার যদিও পারনিসাস অ্যানিমিয়া, তবু সে অনেকদিন বেঁচে আছে। রোগের প্রকোপও খুব কম। মৃত্যু হতে তাই তার বেশ কিছু দেরি। প্রায়ই সে মিনোর কাছে আসে। মিনো যা বলেন, ঠিক সেই মত সে চলে।

এই রুগীটিকে মিনো বললেন, সপ্তাহে বার কয়েক তুমি খাবারের সঙ্গে লিভার খাও। মাখন আর চর্বি কম করে খেও।

এই লোকটি বাড়ি গিয়ে রোজ লিভার খেতে শুরু করল। মাখন, চর্বিও কমিয়ে দিল।

কিছুদিন পরে আবার যখন সে এল, মিনো দেখে অবাক হয়ে গেলেন। লোকটার চেহারায় বেশ যেন জৌলুস এসেছে। মুখে লাল আভা দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর?

লোকটি বলল, আগের চেয়ে এখন অনেক ভাল আছি। গায়ে বেশ জোর পাচ্ছি।

মিনো বললেন, সে তো চেহারা দেখেই বুঝতে পাচ্ছি।

মিনো লোকটির রক্ত পরীক্ষা করলেন। দেখলেন আগের চেয়ে অনেক

ভাল। রক্তে লাল কণিকা বেড়েছে। বললেন, যেমন যেমন খেতে বলেছি তেমনি সব খাবে। লিভার খেতে ভুলো না। তখন ১৯২৩ সাল।

সেইবার শীতকালে আর একটি রুগী এল। সাধারণ একটি স্ত্রীলোক। কিন্তু রোগ তার আগেরটির চেয়ে অনেক বেশী খারাপ। মিনো জানেন, কিছুতেই কিছু এর হবে না। শিগগিরই এই হতভাগ্য স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হবে। তবু ভরসা দিয়ে বললেন, বেশী করে লিভার খাও, পরে আবার এস।

এই বলে মিনো হানটিংটন হাসপাতালে ক্যানসারের গবেষণায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

কিছুদিন পর এই দুটি রুগী আবার তাঁর কাছে এল। কি আশ্চর্য, লিভার খেয়ে দুজনেই বেশ ভাল বোধ করছে। রক্তশূন্যতা কমে যাচ্ছে।

এইবার মিনো বললেন, রোজ আধপো করে লিভার খাও।

প্রতি সপ্তাহে এই রুগী দুটি মিনোর কাছে আসতে লাগল। মিনো দেখলেন তাদের দেহে শক্তি ফিরে আসছে। খিদে বাড়ছে। জিভের ঘা সেরে যাচ্ছে।

এমনি করে দশটি রুগী তিনি লিভার খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখলেন। তখন ১৯২৪ সাল। লিভারের পরিমাণ বাড়িয়ে ক্রমে একপো করে দিলেন। কিন্তু রোজ এই লিভার খাওয়া অনেকেই ভালবাসে না। লিভারের গন্ধ অনেকেরই বরদাস্ত হয় না। মিনো পাক-প্রণালী ঘেঁটে কি করে এই লিভার সুস্বাদু করা যায় তার নতুন নতুন রান্না বার করলেন এবং সেইভাবে লিভার রান্না করে রুগীদের খেতে বললেন।

তখন ১৯২৫ সাল। সেই সময় নতুন এক বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হল। জি. এইচ. হুইপ্‌ল এবং এফ. এস. রবশিট রবিন্স প্রমাণ করে দেখালেন গোরুর লিভার কাঁচা খাওয়ালে রক্তশূন্যতা সেরে যায়। রক্তে লাল কণিকা বাড়ে।

কিন্তু এ রক্তশূন্যতা পারনিসাস অ্যানিমিয়ার রক্তশূন্যতা নয়। শিরা কেটে একটা কুকুরের দেহে রক্তশূন্যতা করে লিভার খাইয়ে দেখা হল রক্তে লাল কণিকা বাড়ে। এ অ্যানিমিয়া রক্তক্ষয়জনিত অ্যানিমিয়া। অর্থাৎ সেকেণ্ডারী অ্যানিমিয়া। পার্নিসাস অ্যানিমিয়ার সঙ্গে তার কোন মিল নেই।

কাজেই এ আবিষ্কারে মিনোর কোনো লাভ হল না। তিনি অবশ্য দশটি

পারনিসাস অ্যানিমিয়ার রুগীকে লিভার খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তা যে সত্যি লিভারের জন্যই সম্ভব হয়েছে, তারই বা যথেষ্ট প্রমাণ কোথায়? কাজেই এ তথ্য এতদিন মিনো গোপন রেখেছেন। কারু কাছে আভাস ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেন নি। এমন কি, বন্ধুদের কাছেও না।

সেই সময় পিটার বেন্ট ব্রিগহাম হাসপাতালে এই রোগের অনেক রুগী ভর্তি হল। অবস্থাও তাদের ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করল। মিনোর বন্ধু ডাঃ উইলিআম প্যারী মারফি তখন এই হাসপাতালের ডাক্তার। তাঁর কাছে একথা শুনে একদিন মিনো ঐ দশটি রুগীর কথা মারফিকে বললেন। লিভার খেয়ে এই দুবছর তারা কত ভাল আছে তার গল্প করলেন। বললেন, তোমার হাসপাতালে রুগীদের ওপর একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখ না?

কথাটা মারফির মনে ধরল। পরদিন হাসপাতালে গিয়ে তিনি ঐ রুগীদের খাদ্যে লিভারের কথা লিখে দিলেন। কিন্তু হাসপাতালে রুগীদের নূতন খাদ্য প্রবর্তন করা অত সহজ ব্যাপার নয়। তাঁর কথায় একদিন না হয় কর্তারা লিভার দিলেন, কিন্তু রোজ আধপো করে লিভার? কেন? রুগীরাও আপত্তি তুলল। এমনিতেই তাদের খেতে কোন রুচি নেই। তার ওপর এই বিচ্ছিরি আঁষটে গন্ধের জিনিস! কেন তারা খাবে?

মিনোর ঐ দশটি রুগীর কথা ভেবে মারফিরও যেন রোখ চেপে গেল। হাসপাতালের কর্তাদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে রুগীদের বুঝিয়ে তিনি লিভার খাওয়াতে শুরু করলেন। তখন মে মাস। ১৯২৫ সাল।

আট মাস ধরে মারফি রুগীদের লিভার খাওয়ালেন এবং রুগীরা ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠল। যে রুগীর ছ-মাসের মধ্যেই মৃত্যু হবার কথা, সে পর্যন্ত বেঁচে রইল। ক্রমশ দেহে পুরনো শক্তি ফিরে পেল। আহারে রুচি হল।

রুগীরা যদি একবার কোনো কিছুতে উপকার পায় সে খবর আর গোপন থাকে না। লিভারের এই অলৌকিক গুণের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তবু মিনো চুপ করে রইলেন। নিজের অভিজ্ঞতার কথা ঘুণাক্ষরেও আর প্রকাশ করলেন না।

তখন ফেব্রুয়ারী মাস। ১৯২৬ সাল। মিনোর বন্ধুরা, মাসচুসেট্স হাসপাতালের ডাক্তাররা একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনেছ ব্রিগহাম হাসপাতালে নাকি শুধু লিভার খাইয়ে পারনিসাস অ্যানিমিয়ায় আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে?

তখনও মিনো নিজের কথা কিছু বললেন না। শুধু বললেন, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

বন্ধুরা তর্ক তুললেন। বললেন, লিভার কেউ রোজ কখনও খায় না। কাজেই খাদ্যে লিভার থাকে না বলেই রুগীদের পারনিসাস অ্যানিমিয়া হতে পারে না। আর শুধু লিভার খাইয়েই কখনও এ রোগ সারতে পারে না।

এখন থেকে মিনো এবং মারফি রুগীদের আধপোর জায়গায় রোজ একপো করে লিভার খাওয়াতে লাগলেন। প্রথম দুবছরে হাসপাতালে মাত্র দুটি রুগীর মৃত্যু হল।

সেই সময় একদিন এক স্ত্রীলোক এসে মারফিকে বলল, আচ্ছা লিভার রান্না না করে খাওয়ানো যায় না? যদি কাঁচা লিভার বেটে কমলালেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কি চলে না?

মারফি এবং মিনো বললেন, তাতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই কিন্তু এক পো করে রোজ লিভার খাওয়া চাই।

তারপর হাসপাতালে খুব খারাপ কয়েকটি রুগী এল। শরীরে যেন বিন্দুমাত্রও আর রক্ত নেই এমনি তাদের চেহারা। অজ্ঞান অবস্থায় স্টেচারে করে তাদের আনা হয়েছে।

স্টমাক টিউব ঢুকিয়ে মারফি এবং মিনো কাঁচা লিভার বেটে জলে গুলে এই নল দিয়ে তাদের খাওয়াতে লাগলেন। রুগীদের জ্ঞান হল। চোখ মেলে তাকাল। সাত দিনের মধ্যেই আশ্চর্য ফল হল। যমদুয়ার থেকে ফিরে এই রুগীরা বিছানায় উঠে বসে খেতে চাইল। সেই থেকে কাঁচা লিভার খাওয়া চালু হল।

এইবার মিনো তাঁর আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের সভায় একদিন প্রকাশ করলেন। ১৯২৬ সালে। মিনো ভেবেছিলেন, তাঁর প্রবন্ধের নাম দেবেন, 'লিভার দিয়ে পারনিসাস অ্যানিমিয়ার চিকিৎসা' কিন্তু বন্ধুরা সবাই বারণ করল। বোঝালো, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে দুম করে লিভারের ওপর এত বেশী জোর দেওয়া ঠিক হবে না। কাজেই তিনি প্রবন্ধের নাম দিলেন, 'বিশিষ্ট একটি খাদ্য দিয়ে চিকিৎসা'। (ট্রিটমেণ্ট বাই এ স্পেশাল ডায়েট।)

চার বৎসর আগে আমেরিকার চিকিৎসকদের বৈজ্ঞানিক এই সভায়

ডাঃ ম্যাকলিঅড ঘোষণা করেছিলেন, কি করে তাঁরই ল্যাবরেটরীতে ব্যানটিং এবং বেস্ট ইনস্থলিন আবিষ্কার করেছিলেন। আজ সেই সভায় মিনো ঘোষণা করলেন, কি করে তিনি এবং মারফি পারনিসাস অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছেন, শুধু মাত্র লিভার খাইয়ে।

মিনোর বক্তৃতা শুনে পারনিসাস অ্যানিমিয়ার এতগুলি রুগী এতদিন ধরে বেঁচে আছে জেনে বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। শুধু লিভার খাইয়ে চিকিৎসার এই আশ্চর্য ফল শুনে সভায় সকলের উচ্ছ্বাস যেন ফেটে পড়ল। চারিদিক থেকে প্রশ্ন শোনা গেল, কি? সব রুগী এখনও বেঁচে আছে? সত্যি?

বক্তৃতা শেষ করেই মিনো সভা থেকে চুপিচুপি পালিয়ে এলেন। ছুটে নিজের হোটেলে ফিরলেন। দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, জান আজ আমি সব বলেছি। এতদিন ধরে তথ্য সংগ্রহ করে যে চার্ট আমি তৈরী করেছি, সব খুলে বলেছি। একটা একটা করে যখন কেসগুলি পড়ে যাচ্ছি আমার নিজেরই মনে হচ্ছিল, একি সত্যি? অতি তুচ্ছ এই লিভার খাইয়ে এই সাংঘাতিক রোগে এমন আশ্চর্য ফল হয়? নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে সত্যি কি এই লিভার দিয়ে রুগীকে বাঁচানো যায়?

মিনো দেখলেন, লিভার খাওয়ালে রক্তে এই শিশুকণিকা বেশী সংখ্যায় আসে। ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে লালকণিকায় পরিণত হয়। কতটুকু লিভার খাওয়ালে এই শিশুকণিকা কত বেশী তৈরী হয় তাও রক্ত পরীক্ষায় ধরা পড়ে। ঠিক যেন অঙ্কের মত এই হিসাব।

সেই থেকে এই চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থপ্রতিষ্ঠিত হল। বড় বড় বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে মেতে উঠলেন। লিভার থেকে লিভার এক্সট্রাক্ট তৈরী হল। খাওয়া থেকে ইনজেকশন চালু হল।

ইনজেকশনও প্রথমে দেওয়া হত রোজ। পরে সপ্তাহে দুদিন। শেষে একদিন। তারপর মাসে দুদিন থেকে একদিন। তাইতেই এই রোগ আয়ত্তে রাখা সম্ভব হল।

রুগীর নিজের পাকস্থলীর দোষেই যে এই রোগের স্থষ্টি হয় তাও একদিন জানা গেল। পাকস্থলীর দোষে খাদ্য থেকে সার বস্তু রোগীর লিভারে গিয়ে

সঞ্চিত হয় না। অথচ মজ্জার ভেতর শিশুলালকণিকা (রেটিকুলোসাইট) লিভারে এ বস্তু না থাকলে বাড়ে না। তাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে রক্তে লাল-কণিকায় এরা পরিণত হয় না। সুস্থ জন্তুর লিভারে এই বস্তু প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে। তাই লিভার খাওয়ালে রুগীর দেহে এ বস্তুর অভাব দূর হয়। স্বাভাবিক নিয়মে মজ্জার শিশু লালকণিকা তখন রক্তের লালকণিকায় পরিণত হয়। রক্তে লালকণিকা বাড়ে। রক্তশূন্যতা আর হয় না।

১৮৪৯ সালে লণ্ডনের টমাস অ্যাডিসন প্রাণহারী এই সাংঘাতিক রোগের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে ঘোষণা করেছিলেন, একবার এই রোগ হলে আর কারু রক্ষা নেই। মৃত্যু তার অনিবার্য। কারু সাধ্য নেই তা রোধ করে।

পঁচাত্তর বৎসর ধরে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা এ সত্য স্বীকার করেছেন। ডাক্তারী ছাত্ররা পাঠ্য পুস্তকে এ বর্ণনা মুখস্ত করেছে। হাসপাতালে রুগীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে এই মর্মান্তিক সত্য তারা নিজের চোখে দেখেছে। রোগের কাছে চিকিৎসকরা হার মেনেছেন।

মিনোর আবিষ্কারে এতদিনকার এ সত্য নিমেষে হঠাৎ মিথ্যে হয়ে গেল। এ রোগে এখন আর মৃত্যু ভয় নেই। খাদ্যের সঙ্গে লিভার খেলে আর এতে মৃত্যু হয় না। এই চিকিৎসায় ১৯২৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত একটি রুগীরও মৃত্যু হয়নি।

মিনো তারপর বোস্টন সিটি হাসপাতালের থর্নডাইক মেমোরিয়াল ল্যাবরেটরীর ডাইরেক্টর নিযুক্ত হলেন। ১৯২৭ সালে। সেই সঙ্গে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের অধ্যাপক। এই দু জায়গায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি কাজ করে গেছেন। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। চিকিৎসা বিদ্যায় নোবেল পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন, ডাঃ হুইপল এবং মারফির সঙ্গে। ১৯৩৪ সালে।

কিন্তু এত কৃতিত্ব, এত সম্মান কিছুই তাঁর ভাগ্যে ঘটত না, যদি ব্যানটিং-এর ইনসুলিন না থাকত। ১৯২১ সালে মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে কি দিয়ে তিনি প্রাণরক্ষা করতেন? ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখত?

ব্রহ্মাস্ত্র

লণ্ডনে তখন সেপ্টেম্বর মাস ; ১৯২৮ সাল। শীতের আগেই সেবার খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। সেণ্ট মেরী হাসপাতালের খোলা জানালা দিয়ে এই ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়া ল্যাবরেটরীতে ঢুকছে।

ল্যাবরেটরীর জীবাণুতত্ত্ববিদ ডাঃ আলেকজান্দার ফ্লেমিং জীবাণু গজাবার

স্যার আলেকজান্দার ফ্লেমিং

একখানা কাঁচের প্লেট (কালচার প্লেট) হাতে নিয়ে দেখছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এই তাঁর কাজ। জীবাণু এবং জীবাণুধ্বংসকারী বস্তু নিয়ে গবেষণা।

আজ ফ্লেমিং দেখলেন, ভিজে হাওয়ায় এই কালচার প্লেটে ছাতা পড়েছে। আগের দিন এই প্লেটে স্ট্যাফাইলোককাস জীবাণুর যে থোকা থোকা কলোনি গজিয়েছিল, সব তা নষ্ট হয়ে গেছে।

ল্যাবরেটরীতে এ জিনিস নিত্য ঘটে। ভিজে হাওয়ায় কালচার প্লেট, টেস্ট টিউব ইত্যাদিতে ছাতা পড়ে। ভৃত্য এসে সব তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখে।

আজ ফ্লেমিং নিজে এই প্লেটখানা ধুতে গেলেন। বেসিনের ওপর জলের কল খুলে আবার ঐ প্লেটখানার দিকে তাকালেন।

হঠাৎ এক অদ্ভুত জিনিস তাঁর চোখে পড়ল। এই প্লেট কাল জীবাণু ভরা ছিল ; থোকা থোকা জীবাণু গজিয়ে সারা প্লেট ভরে ছিল। কিন্তু আজ এ কি ?

প্লেটের ওপর ছাতা যেখানে পড়েছে, তার চারদিকে ইঞ্চিকয়েক জায়গায় একটি জীবাণুও নেই। সব যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কাব হয়ে গেছে।

ফ্লেমিং দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কি করে এটা সম্ভব হল ?

জলের কল বন্ধ করে তিনি প্লেটখানা তাকের ওপর তুলে রাখলেন। ভাবলেন, ব্যাপারটা ভাল করে একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ফ্লেমিং জাতে স্কচ। স্কটল্যাণ্ডের লকফিল্ডে তাঁর জন্ম। ১৮৮১ সালে। উইলমারনক অ্যাকাডেমি এবং লণ্ডন ইউনিভার্সিটির এই সেণ্ট মেরী হাসপাতালের মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করে এইখানেই তিনি চাকরি করেন। গবেষণা করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে কিছুদিন আর্মি ডাক্তারের কাজ নিয়ে তিনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তারপর আবার এইখানে ফিরে এসেছেন। জীবাণু নিয়ে গবেষণা এবং ছাত্রদের শেখানো এই নিয়ে তিনি মেতে আছেন।

ছ-বছর আগে এই ল্যাবরেটরীতে গবেষণা করে তিনি বিশেষ এক উদ্ভিদ এবং জীবদেহ থেকে ক্ষরিত জীবাণুধ্বংসী এক রস আবিষ্কার করেছিলেন। সেই রসেব নাম লাইসোজাইম। সেই থেকে জীবাণুধ্বংসী সব জিনিসেই তাঁর: খুব কৌতূহল। তাই ছাতাপড়া এই কালচার প্লেট দেখে তাঁর মনে আজও আবার নতুন এক কৌতূহল জেগে উঠল।

কিন্তু আজ ফ্লেমিং যা দেখলেন, ল্যাবরেটরীতে এতদিন কাজ করে এই ৪৭ বৎসর বয়সে কখনও তা দেখেন নি। জীবাণুধ্বংসী এমন অদ্ভুত ছাতা আগে কখনও তাঁর নজরে পড়েনি।

হাতেব কাজ শেষ করে ফ্লেমিং এই প্লেট থেকে ঐ ছাতা একটুখানি তুলে আর একটা কালচাব প্লেটে লাগিয়ে দিলেন। এই প্লেটও যখন

ঐ ছাতা গজিয়ে ভরে গেল, তখন তার একটুখানি তুলে তিনি ব্রথের সঙ্গে মেশালেন।

পনেরো দিন পরে ঐ ব্রথ ছেঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি যা দেখলেন, নিজের চোখে তা শুধুই বিস্ময়কর নয়, নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলেই মনে হল।

ফ্লেমিং দেখলেন, এই ব্রথের সামান্য একটু ছোঁয়া লাগলেও কোন জীবাণুই আর বাঁচে না। মাত্র এক ফোঁটা এই ব্রথ মুহূর্তের মধ্যে স্ট্যাফাইলোককাস, স্ট্রেপটোককাস, নিউমোককাস, এমন কি গনোরিয়া, ডিপথেরিয়া ইত্যাদির জীবাণু পর্যন্ত ধ্বংস করে। এই ব্রথের ছোঁয়ায় সব জীবাণুই যেন নিমেষের মধ্যে গলে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

জীবাণুধ্বংসী এই রকম শক্তিশালী কোনো জিনিস যে এত সহজে গজাতে পারে আগে কখনও তিনি দেখেন নি। তাই তাঁর মনে হল, নিশ্চয়ই এটা বিষ; প্রাণহারী উগ্র সাংঘাতিক এক হলাহল।

কাজেই দুটি খরগোস নিয়ে তিনি একটির দেহে একটুখানি এই ব্রথ ইনজেকশন দিলেন, অপরটি রইল কণ্টোল।

পেনিসিলিন

ফ্লেমিং অবাক হয়ে দেখলেন, দুটি খরগোসই সমান সুস্থ রইল। কারু দেহে বিষের সামান্যতম ক্রিয়াও পরিস্ফুট হল না। কোনটা যে এই ব্রথ পেয়েছে আর কোনটা যে পায়নি চেহারা দেখে কিছুই তা বোঝা গেল না।

এইবার ফ্লেমিং বুঝলেন, এই জিনিসে বিষ নেই। মাইক্রোসকোপে এই ছাতা দেখে মনে হয়, যেন সরু সরু এক গোছা পেনসিল পড়ে আছে। তাই ফ্লেমিং এর নাম দিলেন, পেনিসিলিন।

ল্যাবরেটরীতে অনেক জিনিসই জীবাণু ধ্বংস করে, কিন্তু মানুষের দেহে পারে না। এই পেনিসিলিন তা পারবে কি?

ফ্লেমিং ভাবলেন, রোগীর ওপর এর গুণ পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

কিন্তু তিনি চিকিৎসক নন; শুধুই একজন বিজ্ঞানী, তাও আবার জীবাণুতত্ত্ববিদ। রোগীর চিকিৎসা তিনি করেন না। কাজেই রোগীর ওপর প্রয়োগ করে দেখতে হলে ডাক্তারের সাহায্য চাই। হাসপাতাল চাই।

ফ্লেমিং বেছে বেছে কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর

আবিষ্কার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব ফল বিশদভাবে বর্ণনা দিলেন। হাসপাতালের ডাক্তাররা মন দিয়ে সব শুনলেন, কিন্তু হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসা এই ছাতা রোগীর ওপর প্রয়োগ করার ঝুঁকি কেউ নিলেন না।

তাঁরা বললেন, ল্যাবরেটরীতে খরগোসের ওপর পরীক্ষা করে আপনি দেখেছেন, পেনিসিলিন বিষ নয়; তা বেশ ভাল কথা। কিন্তু যতটুকু পেনিসিলিন তৈরী হয়েছে তাতে একটি রুগীরও পুরো চিকিৎসা কখনও হবে না। তাহলে ? তাছাড়া, হঠাৎ যদি কোনো বিপত্তি ঘটে ? রুগী যদি মরে যায় ? মিছিমিছি এ দায়িত্ব কে নেবে ?

কাজেই হাসপাতালের সাহায্য ফ্লেমিং পেলেন না। ভাবলেন, সত্যি যদি যথেষ্ট পরিমাণে এই জিনিস তৈরী করা না যায়, তাহলে এর ফল জেনেই বা লাভ কি ? আর রোগীর ওপর একদিন হঠাৎ পরীক্ষা করেই বা হবে কি ?

তবু ফ্লেমিং তাঁর আট মাসের এই গবেষণার ফল এক ডাক্তারী পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। মে মাসে, ১৯২৯ সালে। কিন্তু এই আবিষ্কার কারো মনে কোনো সাড়াই তুলল না। বিজ্ঞানীরা এর প্রতি কোনো গুরুত্বই দিলেন না।

শুধু ফ্লেমিং একা এই পেনিসিলিন নিয়ে গবেষণা চালালেন। কি উপায়ে এ জিনিস বেশী করে তৈরী করা যায় তাই শুধু ভাবতে লাগলেন। বড় বড় রসায়নবিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, নিজে দিনরাত খাটলেন কিন্তু কোনো সুবিধা হল না। সব চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হল। রোগে ব্যবহার করার মত যথেষ্ট পেনিসিলিন তৈরীর কোনো উপায়ই আর খুঁজে পেলেন না তিনি। যে দু-একজন বিজ্ঞানী কৌতূহলী হয়ে এই গবেষণায় ঝুঁকেছিলেন, তাঁরাও শেষে হাল ছেড়ে অন্যদিকে মন দিলেন।

ফ্লেমিং কিন্তু ছাড়লেন না। দীর্ঘ দশটি বছর ধরে তাঁর ল্যাবরেটরীর অন্ধকার একটি কোণে একটু একটু করে এই পেনিসিলিন গজিয়ে এই ছাতা দিনের পর দিন তিনি জিইয়ে রাখলেন।

এই দশ বছরে পৃথিবীতে অনেক কাণ্ড ঘটে গেল। জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয় হল। জার্মান বিজ্ঞানীরা প্রনটসিল অর্থাৎ প্রথম সালফা ড্রাগ আবিষ্কার করে চিকিৎসা জগতে যুগান্তর এনে দিলেন।

প্রনটসিল প্রথম তৈরী হয় ১৯৩২ সালে, রাসায়নিক উপায়ে তৈরী এক

রঙ থেকে। পল আরলিকের পদ্ধতি অনুসরণ করে, লাল ক্রাইসোইডিন রঙ-এর সঙ্গে সালফানিলামাইড সংযুক্ত করে।

১৯৩৫ সালে জার্মানীর ডাঃ গেরহার্ড ডোমাগ পরীক্ষা করে দেখলেন, স্ট্রেপ্টোককাসে আক্রান্ত ইঁদুর এই প্রনটসিলে আরোগ্য লাভ করে।

কিন্তু তখনও মানুষের ওপর এই প্রনটসিল প্রয়োগ করা হয়নি। মানুষের দেহে এই ওষুধে কি ফল হয় তা জানা যায়নি। কথিত আছে, ডোমাগের নিজের বাড়িতে কিছুদিন পরে এক কাণ্ড হল। তাঁর মেয়ের একদিন গলা ব্যথা হয়ে জ্বর হল। ডোমাগ বুঝলেন, এ জ্বর স্ট্রেপটোককাস জীবাণুঘটিত। প্রচলিত সব ওষুধ ব্যবহার করা হল। কিন্তু কোনো ফল হল না। মেয়ের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হতে লাগল।
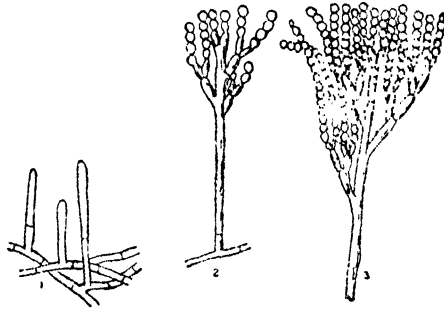
পেনিসিলিন গুটি

ডোমাগ বুঝলেন, মেয়ে তার আর বাঁচবে না। কাজেই যে প্রনটসিল ইঁদুরের ওপর অমন ভাল কাজ করেছে তাই একবার ব্যবহার করে দেখতে ক্ষতি কি ?

সাহস করে তখন তিনি ঐ প্রনটসিল তাঁর মেয়ের ওপর প্রয়োগ করলেন। জ্বর ছেড়ে গেল। সেই থেকে এই প্রনটসিল জার্মান হাসপাতালে বিভিন্ন রোগীর ওপর ব্যবহার হতে লাগল। মানুষের সেপটিক জ্বর যে এতে সারে তা এইবার প্রমাণ হল। ১৯৩৬ সালে।

অর্থাৎ পল আরলিকের স্যালভারসান আবিষ্কারের ঠিক ছাব্বিশ বছর পরে আবার মহামূল্য যুগান্তকারী এক ওষুধের আবিষ্কার হল। এবার আর যৌনব্যাধি নয় ; সাধারণ জীবাণুঘটিত রোগ, যা প্রতিটি ঘরে হয়। এমন কি, সেই প্রসবজনিত জ্বরেরও এক অমোঘ অস্ত্র চিকিৎসকের হাতে এল।

তখন জার্মানীতে হিটলারের দোর্দণ্ড প্রতাপ। এই আবিষ্কারের জন্ম ডোমাগ নোবেল পুরস্কার পেলেন ; কিন্তু ইহুদীর দান বলে হিটলার ঘৃণায় তা প্রত্যাখ্যান করলেন। জার্মান গভর্নমেণ্ট নিজে ডোমাগকে অনেক পুরস্কার দিলেন, কিন্তু নোবেলের এই দান গ্রহণ করতে দিলেন না।

এই আশ্চর্য ওষুধ আবিষ্কারে জার্মানীর প্রতিপত্তি আরও অনেক বেড়ে গেল। ওষুধের নাম প্রকাশ হবার আগেই জার্মান শিল্পপতিরা এই প্রনটসিল তৈরীর বিবিধ প্রণালী শক্ত পেটেণ্টে বেঁধে তবে বাজারে ছাড়লেন। হিটলারের জার্মানী সারা পৃথিবীতে একা এই প্রনটসিলের মালিক হয়ে রইল।

ভাগ্যক্রমে কিছুকাল পরে প্যারিসের তেফুএল নামে এক বিজ্ঞানী তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখালেন প্রনটসিল দেহের ভিতর ভেঙ্গে সালফানিলামাইড উৎপন্ন করে। আর শুধু সালফানিলামাইডের জন্যই প্রনটসিলের এই জীবাণুধ্বংসী ক্ষমতা।

অতএব জানা গেল, প্রনটসিল দিয়ে মানবদেহে যে কাজ হয শুধু সালফানিলামাইডেও ঠিক তাই হয়।

অথচ সালফানিলামাইডের কোনো পেটেণ্ট নেই। যার ইচ্ছে সেই এই ওষুধ তৈরী করতে পারে।

সেই থেকে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের এই ওষুধের জন্য আর জার্মানীর মুখ চেয়ে বসে থাকতে হল না। সালফা ড্রাগ ইওরোপ, আমেরিকা সব দেশেই তৈরী হতে লাগল। দেখতে দেখতে হুহু করে নতুন নতুন সালফা ড্রাগ বেরিয়ে গেল।

দু বৎসরের মধ্যেই সালফা পাইরিডিন অর্থাৎ এম এণ্ড বি ৬৯৩ বেরিয়ে নিউমোনিয়া, মেনিঞ্জাইটিস ইত্যাদি রোগ আয়ত্তে রাখা সম্ভব করে ফেলল। তারপর বেরুল সালফাথিওজল বা সিবাজল এবং সালফাগোআনিডিন। এইসব শক্তিশালী সালফা ড্রাগ চিকিৎসায় যুগান্তর এনে দিল।

চিকিৎসায় যদিও বা যুগান্তর এসে গেল, তবু কারু মনে শান্তি এল না। হিটলারের দাপটে ইওরোপের আকাশে যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠল। বিনাযুদ্ধে চেকোস্লোভাকিয়া দখলের পর পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ যেন অনিবার্য হয়ে উঠল।

তখন ১৯৩৮ সাল। ডাঃ হাউআর্ড ফ্লোরএ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

জীবাণুতত্ত্বের অধ্যাপক। সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর জন্ম। একদিন তাঁর খেয়াল হল, দশ বছর আগে ফ্লেমিং বলেছিলেন, পেনিসিলিন একরকমের ছাতা। কিন্তু সাংঘাতিক জীবাণুধ্বংসী। এই পেনিসিলিন এখন কোথায় পাওয়া যায় ?

ফ্লোরএ তাই একদিন ডাঃ ফ্লেমিং-এর সঙ্গে দেখা করলেন। দেখলেন, এই দশ বছরে ফ্লেমিং-এর মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে কিন্তু হাসিটি ঠিক তেমনি আছে।

পেনিসিলিনের মত একরকমের ছাতা কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করায় ফ্লেমিং হেসে ফেললেন। বললেন, দশটি বছর ধরে সেই ছাতা তিনি জিইয়ে রেখেছেন, এই ল্যাবরেটরীরই একটি কোণে। তাই থেকে একটু তুলে তিনি ফ্লোরএকে দিলেন। সেণ্ট মেরী হাসপাতাল থেকে এই ছাতা এখন অক্সফোর্ডে এল। তারপর প্যাথোলজির ল্যাবরেটরীতে গিয়ে বাসা বাঁধল।

দু বছর ধরে ফ্লোরএ, ডাঃ চেইন এবং তাঁদের সহকারীরা এই পেনিসিলিন নিয়ে গবেষণা করলেন। দেখলেন ফ্লেমিং এর গুণ যা বর্ণনা করেছেন একটুও তা বাড়াবাড়ি নয়; কিংবা মিথ্যা নয়। এক ফোঁটা পেনিসিলিন এক বোতল জলে মেশালেও সেই জলে স্ট্যাফাইলককাস জীবাণু গজায় না।

এইবার ফ্লোরএ জন্তুর উপর পরীক্ষা চালালেন। আটটা ইঁদুরের গায় স্ট্যাফাইলককাস জীবাণু ইনজেকশন করা হল। তার মধ্যে চারটের গায় তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর দিনরাত এই পেনিসিলিন ইনজেকশন দেওয়া হল। যে চারটে ইঁদুর শুধু স্ট্যাফাইলোককাস-এ সংক্রামিত হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তারা মরে গেল। কিন্তু বাকি চারটে পেনিসিলিন পেয়ে বেঁচে গেল।

কিন্তু ফ্লোরএ দেখলেন, এই পেনিসিলিন জীবদেহে বেশীক্ষণ থাকে না। দেহে প্রবেশ করার পর থেকেই অতি দ্রুত দেহ থেকে নির্গত হয়। এ যেন এক ফুটো পাত্রে জল ঢালা; ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। চারটে ইঁদুরকে মাত্র ২৪ ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখতে অক্সফোর্ড ল্যাবরেটরীর সব পেনিসিলিন নিঃশেষ হয়ে গেল।

ফ্লোরএ ভাবলেন, তাহলে উপায়? মানুষের ওপর এ জিনিস ব্যবহার হবে কি করে ?

তখন ১৯৪০ সাল। যুদ্ধ আরম্ভের পর সবে একটিমাত্র বৎসর পার হয়েছে। জার্মানীর যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। সালফা ড্রাগের যে বিরাট প্রতিশ্রুতি

আগে ফলাও করে ঘোষণা করা হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের চিকিৎসায় তা টিকল না। নানারকম বিপত্তি দেখা দিল।

ফ্লোরএ ঠিক করলেন, যতটুকু পেনিসিলিন তৈরী করা যায় তাই দিয়েই একবার মানুষের ওপর পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

তখন লণ্ডনের এক পুলিস দাড়ি কামাতে গিয়ে একদিন তার গাল কেটে ফেলল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ক্ষত দূষিত হল, রুগীর গাল মুখ সব ফুলে উঠল। রক্তে স্ট্যাফাইলোককাস ঢুকে সেপ্টিসিমিয়া ঘটাল। সালফা ড্রাগ এই দূষিত রক্তে জীবাণু ধ্বংস করতে পারল না। কাজেই র‍্যাডক্লিফ হাসপাতালের ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিলেন।

খবর পেয়ে ফ্লোরএ ছুটে এলেন। পাঁচ দিন ধরে তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর রুগীর শিরার ভিতর তিনি পেনিসিলিন ইনজেকশন দিলেন। তৃতীয় দিনে গালের সেই সাংঘাতিক ফোলাও কমতে শুরু করল। পরদিন জ্বর প্রায় ছেড়ে গেল। পঞ্চম দিনে মনে হল, রুগী এবার সেরে উঠবে। কিন্তু সেদিনই পেনিসিলিন সব ফুরিয়ে গেল।

নতুন পেনিসিলিন তৈরী করতে যে কদিন দেরী হল সেই ফাঁকে আবার রুগীর জ্বর এল। আবার ঐ পেনিসিলিন শুরু করবার আগেই বেচারা একদিন মারা গেল।

রুগীর যদিও মৃত্যু হল তবু যাঁরা এই চিকিৎসা দেখলেন সবাই বুঝলেন, পেনিসিলিন কি অদ্ভুত জিনিস। জীবাণু ধ্বংসের কী সাংঘাতিক তার ক্ষমতা।

কাজেই ফ্লোরএ এবং তাঁর সহকর্মীরা সবাই মিলে চেষ্টা শুরু করলেন কি করে এই পেনিসিলিন আরও বেশী তৈরী করা যায়।

র‍্যাডক্লিফ ইনফারমারির ডাক্তাররা ঐ একটা কেস দেখেই বুঝেছিলেন, পেনিসিলিন কি অসাধ্য সাধন করে। তাই কিছুদিন পরে মাত্র পনেরো বৎসরের একটি ছেলে যখন হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোককাসে আক্রান্ত হল এবং সালফা ড্রাগ দিয়ে তা প্রতিরোধ করা গেল না তখন ঐ হাসপাতালের ডাঃ ফ্লোচার একদিন ফ্লোরএকে টেলিফোন করলেন। বললেন, আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশী এই ছেলেটি আর বাঁচবে না। কাজেই তুমি যদি একবার এসে একে দেখে যাও তাহলে ভাল হয়।

ফ্লোরএ তক্ষুণি ঐ হাসপাতালে গেলেন। যে রুগী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই

নিশ্চিত মরে যাবে, তার দেহে এই পেনিসিলিন তিনি ইনজেকশন শুরু করলেন। ভাগ্যক্রমে ছেলেটি এবার বেঁচে গেল। যতটুকু পেনিসিলিন ছিল তাইতেই তার এই মারাত্মক অসুখ সেরে গেল।

এতদিনে এমন দুটি রুগীর ওপর পেনিসিলিন প্রয়োগ করা গেল যাদের মৃত্যু ছিল সুনিশ্চিত। অন্য কোনও উপায়ে বাঁচবার কোনও আশাই তাদের ছিল না। তার মধ্যে একটি রুগী মরে গেল পেনিসিলিনের অভাবে। অপরটি বেঁচে গেল পেনিসিলিন নিয়ে।

ফ্লোরএ ভাবলেন, এই পেনিসিলিন নিয়ে আর হেলাফেলা করলে চলবে না। এমন উপায়ে এ জিনিস তৈরী করতে হবে যাতে রোজ হাজার হাজার
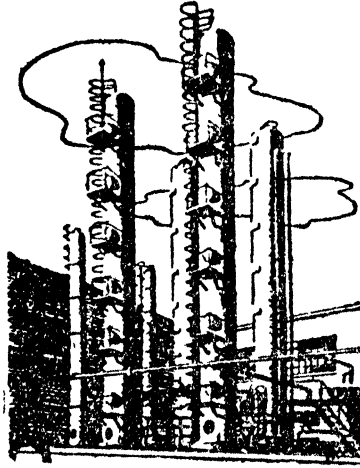
পেনিসিলিন তৈরীর আধুনিক কারখানা

টন পেনিসিলিন তৈরী হয়। সে কাজ ছোট্ট কোনো ল্যাবরেটরীর নয়, তাঁর মতো ডাক্তারেরও নয়। সে কাজ বড় বড় ওষুধের কারখানার।

কিন্তু বড় বড় কারখানার মালিকরা কেন এতে হাত দেবেন? ফ্লোরএ হঠাৎ একটি ছেলেকে সেপ্টিসিমিয়া থেকে বাঁচিয়েছেন বলেই কেন তাঁরা এই কাজে লাখ লাখ টাকা ঢালবেন?

ফ্লোরএর মনে হল, তাঁকে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। রুগীর ওপর প্রয়োগ করে আরও অনেক সুফল দেখাতে হবে। পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে হবে।

কিন্তু এ কাজও খুব কঠিন। যথেষ্ট পরিমাণ পেনিসিলিন ল্যাবরেটরীতে

তৈরী করবার উপায় বার করতেই ফ্লোরএ, চেইন এবং তাঁর সহকর্মীরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। তার উপর রুগীর ওপর পরীক্ষা করবার সময় কোথায়? এ কাজের জন্য নিজের দলের মধ্যে বিশ্বস্ত একজন ডাক্তার চাই যিনি রোগীর ওপর এই পেনিসিলিনের ফল লক্ষ্য করবেন। রুগীর অবস্থার দৈনন্দিন পরিবর্তন লিখে পরিসংখ্যান তৈরী করবেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় এমন বেকার একটি ডাক্তার ফ্লোরএ পাবেন কি করে? ফ্লোরএর মনে হল, এতদিন পরে পেনিসিলিন নিয়ে গবেষণা আর বুঝি চলবে না।

কিন্তু তাঁর ভাগ্য সত্যি খুব ভাল। ভেবে ভেবে যখন তিনি কোনো ডাক্তারই খুঁজে পেলেন না, তখন হঠাৎ তাঁর মনে হল, নিজের বাড়িতেই তো এমনি একটি উপযুক্ত ডাক্তার আছেন!

ফ্লোরএর স্ত্রী ইথেল নিজে একজন পাশ করা ডাক্তার। ইংলণ্ডে ডাক্তারের স্ত্রী হয়ে আসবার আগেই তিনি অস্ট্রেলিয়াতে কয়েক বৎসর ডাক্তারী প্র্যাকটিস করেছেন। এখন অবিশ্যি ডাক্তারী আর তিনি করেন না। ডাক্তারী ছেড়ে ঘরসংসার দেখেন। তাঁর দুটি সন্তান। এই যুদ্ধের হিড়িকে তাদের আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফ্লোরএর মনে হল, এই পেনিসিলিনের কাজ লক্ষ্য করে পরিসংখ্যান তৈরী করার জন্য স্ত্রী ইথেলই সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত।

কিন্তু স্ত্রীর কাছে এই কথাটা পাড়তেই ইথেল প্রবল এক আপত্তি তুললেন। বললেন, তোমার কি মাথা খারাপ? সেই কবে আমি ডাক্তারী ছেড়ে দিয়েছি। সব ভুলে বসে আছি। এ কাজ আমি পারব কেন? না না, এ আমি পারব না। তুমি অন্য লোক দেখ।

এই যুদ্ধের বাজারে বিশ্বাসী অন্য লোক পাওয়া কি সহজ কথা? তাই ফ্লোরএ অনেক অনুনয়-বিনয় করে ইথেলের হাত দুটি ধরে মিনতি করে বললেন, লক্ষ্মীটি, তুমি আর অমত করো না। তুমি ছাড়া এ কঠিন কাজ আর কেউ পারবে না। এ দায়িত্ব তুমি ছাড়া কেই বা নেবে? আর কেনই বা নেবে?

সত্যি এ কাজের অনেক বেশী দায়িত্ব। ফ্লোরএ ল্যাবরেটরীতে দিনরাত খেটে যেটুকু পেনিসিলিন তৈরী করবেন তার একটি কণাও অপচয় করা চলবে না। রুগী বেছে এই জিনিস প্রয়োগ করতে হবে। নিষ্ঠার সঙ্গে ওষুধের ফল লক্ষ্য করতে হবে। রেকর্ড রেখে পরিসংখ্যান তৈরী করতে হবে। এ দায়িত্ব এখন থেকে ইথেলের।

অনেক সাধ্য সাধনা, অনেক কাকুতি-মিনতি এবং অনেক কাঠ খড় পোড়াবার পর ইথেল অবশেষে রাজী হয়ে গেলেন। জীবাণুশূন্য ক্লোড ক্রীমের শিশিতে সোনার চেয়ে দামী এই পেনিসিলিন ভরে নিজের পুরোনো ভ্যানিটি ব্যাগে ঢুকিয়ে সাইকেলে চড়ে ইথেল র‍্যাডক্লিফ ইনফারমারিতে গিয়ে হাজির হলেন। ইথেল দেখলেন, একটি মেয়ে স্ট্রেপটোকক্কাসে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন; আর দু মাসের একটি শিশু, শিরদাঁড়া বেঁকে সারা দেহে অষ্টিওমায়লাইটিস হয়ে মৃত্যু পথযাত্রী।

পেনিসিলিনে এদের কোনো উপকার হবে এমন কোনো দুরাশা ইথেলের মনে ছিল না। তবু তিনি পেনিসিলিন দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, কয়েকদিনের মধ্যেই এই রুগী দুটি বেঁচে উঠল। ইথেল দিনের পর দিন তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর রাত জেগে ইনজেকশন দেবার সব কষ্ট নিমেষে ভুলে গেলেন। সাইকেলে চড়ে সোজা অক্সফোর্ড ল্যাবরেটরীতে এসে স্বামীর কাছে উচ্ছ্বসিত হয়ে এই খবর দিলেন।

এইবার ইথেলকে যেন এক নেশায় ধরল। তিনি এই পেনিসিলিন, এমপাইমা অর্থাৎ বক্ষপিঞ্জরে যার পুঁজ হয়েছে, সেই রুগীর ওপর ব্যবহার করলেন, স্ট্রেপটোককাল মেনিঞ্জাইটিসে প্রয়োগ করলেন। সব রুগীই বেঁচে গেল। ইথেল দেখলেন, এই পেনিসিলিন যেন জীবাণুধ্বংসী এক ব্রহ্মাস্ত্র। দেখতে দেখতে এক বৎসরের মধ্যে ১৮৭টি কঠিন কঠিন রোগ সারিয়ে ইথেল পেনিসিলিনের বিরাট এক কেস রিপোর্ট তৈরী করে ফেললেন।

ফ্লোরেএও দেখলেন, এইবার এই পেনিসিলিন জনসাধারণের জন্য তৈরী করবার সময় এসেছে। যুদ্ধের সময় এতবড় কাজ লণ্ডনে শুরু করা সম্ভব নয়। একদিন তাই তিনি আমেরিকা রওনা হলেন।

তখন ১৯৪১ সাল, জুলাই মাস। ডাঃ হাউআর্ড ফ্লোরেএ তাঁর সহকর্মী ডাঃ নরম্যান হিটলির সঙ্গে একদিন আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে ফ্লেমিং-এর আবিষ্কৃত সেই ছাতা থেকে গজানো অধস্তন এক পুরুষের পেনিসিলিন।

এইবার পেনিসিলিন আমেরিকার হাতে পড়ল। জাহাজ থেকে নামতে না নামতেই ডাঃ ফ্লোরেএ এবং হিটলিকে যুক্তরাজ্যের পিওরিআতে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে ফারমেণ্টেশনের মস্ত বড় রিসার্চ ল্যাবরেটরী। এই ল্যাবরেটরীতে পেনিসিলিন গজানো শুরু হল।

অক্সফোর্ডে ডাঃ ফ্লোরএ এই পেনিসিলিন গ্লুকোজের সঙ্গে ধাতব দ্রব্য মিশিয়ে গজাতেন। ফলে পেনিসিলিন সেখানে খুব ভাল গজাত না। এক লিটার ঐ গ্লুকোজের জলে মাত্র এক হাজার ইউনিট পেনিসিলিন তৈরী হত। অথচ একটি রুগীর চিকিৎসায় দিনে অন্তত এক লাখ ইউনিট পেনিসিলিন না হলে চলে না।

তাই আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা বললেন, হয় পেনিসিলিন গজাবার অন্য কোনো দ্রুত উপায় বার করতে হবে, না হয় এ জিনিস ছাড়তে হবে।

ম্যাজিসিআন যে রকম মাথার কালো টুপির ভেতর থেকে হঠাৎ একটি পায়রা বার করে দর্শকদের বিমূঢ় করে দেয়, তেমনি একদিন ডাঃ এ জে ময়আর পেনিসিলিন অতি দ্রুত গজিয়ে সব্বাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন।

কিসে পেনিসিলিন ভাল গজায় তা পরীক্ষার জন্য তিনি নানা জিনিস নিয়ে রোজ পরীক্ষা করতেন। একদিন সকালে এইসব বিভিন্ন ফ্লাস্ক পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ তিনি দেখলেন, একটি ফ্লাস্কএ পেনিসিলিন খুব বেশী গজিয়েছে। পরীক্ষা করে দেখলেন, প্রতি সি সি-তে দু-শ ইউনিট। তাহলে এক লিটারে দু-লক্ষ ইউনিট। যেখানে একদিনে মাত্র এক হাজার ইউনিট পেনিসিলিন গজাত সেখানে এক রাত্রের মধ্যেই দু-শ গুণ বেশী পেনিসিলিন পাওয়া গেল। অথচ যে জিনিসে এই পেনিসিলিন এত বেশী গজাল সে একরকমের বাড়িতে তৈরী অতি সাধারণ তাড়ি (কর্নষ্টিপ লিকার)।

এইবার ওষুধের কারখানার মালিকরা সব এগিয়ে এলেন। আগে যাঁরা মাথা নেড়ে নাক সিঁটকে এ জিনিস প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁরাও সব একে একে এই পেনিসিলিন তৈরীর জন্য টাকা ঢালতে রাজী হলেন। দেখতে দেখতে বড় বড় ওষুধের কারখানায় এই পেনিসিলিন তৈরী শুরু হল। সারা আমেরিকায় রসায়নবিদ, জীবাণুবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, গভর্নমেণ্ট কর্মচারী এবং চিকিৎসার গবেষণাকারীরা রাত্রি জেগে এই পেনিসিলিনের হিসেব দেখতে লাগলেন, এবং বসে বসে টেস্ট টিউব দেখে রাত কাটালেন।

জাতির সমবেত চেষ্টায় ইউনিটের পর ইউনিট এই পেনিসিলিন তৈরী হল। পাঁচ মাসের মধ্যে চল্লিশ কোটি ইউনিট কড়া রেশন করা এই দুর্মূল্য পেনিসিলিন তৈরী হল। তখন ১৯৪৩ সাল। বৎসরের শেষে দেখা গেল, ৯শ উনিশ কোটি ৪০ লক্ষ ইউনিট পেনিসিলিন তৈরী হয়েছে।

পেনিসিলিন প্রথমে ব্যবহার হত শুধু যুদ্ধে আহত সৈন্যদের ওপর। যুদ্ধের পর কণ্টোল তুলে সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহার হচ্ছে।

আজকাল বিরাট বিরাট কারখানায় এই পেনিসিলিন তৈরী হয়। কাজেই পেনিসিলিন এখন আর দুর্মূল্য নয়। এই পৃথিবীর গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে আজ রুগীরা এই ওষুধ পায়।

এই আবিষ্কারের জন্য ডাঃ আলেকজান্দার ফ্লেমিং রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হলেন; ১৯৪৩ সালে। নাইট হুডের সম্মানেও তাঁকে ভূষিত করা হল। ১৯৪৪ সালে।

এক পেনিসিলিনের জন্যই তিনজন ডাক্তার নোবেল পুরস্কার পেলেন, ১৯৪৫ সালে।

স্যার আলেকজান্দার পেলেন পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য; আর স্যার হাউআর্ড ফ্লোরএ এবং ডাঃ আর্নেস্ট বি চেইন পেলেন পর্যাপ্ত পরিমাণে এই পেনিসিলিন তৈরী করে রুগীর ওপর প্রয়োগের জন্য।

প্রনটসিল অর্থাৎ সালফা ড্রাগের আবিষ্কারের জন্যও জার্মান ডাঃ গেরহার্ড ডোমাগ এই পুরস্কার পেয়েছিলেন; ১৯৩৯ সালে। কিন্তু হিটলার তা প্রত্যাখ্যান করেন। যুদ্ধ শেষে হিটলারের পতনের পর সেই পুরস্কার আবার তাঁকে দেওয়া হল ১৯৪৯ সালে।

পেনিসিলিন ভিজে হাওয়ায় আসা সামান্য এক ছাতা থেকে তৈরী জীবাণুধ্বংসী এক বস্তু। সালফা ড্রাগের মত রসায়নঘটিত কোনো দ্রব্য নয়। তাই এর নাম অ্যান্টিবাওটিক।

এ জিনিসের অমন সাংঘাতিক জীবাণুধ্বংসী ক্ষমতা দেখে বিজ্ঞানীরা এখন রসায়ন ছেড়ে এইদিকে ঝুঁকেছেন। তাই নিত্য নতুন অ্যান্টিবাওটিক আবিষ্কার হচ্ছে।

রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুরা এই পৃথিবীর অতি প্রাচীনকালের জীব। মানুষের জন্মের অন্তত ৫০ লক্ষ বৎসর আগে এদের জন্ম। প্রাচীন পাহাড়ের গুহায় এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জন্তুর কঙ্কালে এই রোগ সৃষ্টিকারী মৃত জীবাণু পাওয়া গেছে এবং পল আরলিকের পদ্ধতিতে সেই জীবাণু এতদিন পরেও রাঙানো সম্ভব হয়েছে।

এতদিন পরে আজ মানুষ এই জীবাণুধ্বংসী অমোঘ এক অস্ত্র পেয়েছে।

কিন্তু এই ব্রহ্মাস্ত্র এতদিন কোথায় ছিল?

এই অস্ত্র লুকিয়ে ছিল মানুষেরই আশে পাশে। এই পৃথিবীরই মাটিতে।

সেই আদিম যুগ থেকে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের পর মানুষ এই অস্ত্রের খোঁজ করেছে। মাটি খুঁড়ে পরীক্ষা করেছে। এই কাজে এই চেষ্টায় নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছে। দলের পর দল মানুষ মহামারীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; তবু মানুষ হাল ছাড়েনি। যুগের পর যুগ ধরে রোগ ধ্বংসকারী অস্ত্রের সন্ধান করেছে।

এতদিনের চেষ্টায় এই অস্ত্র পাবার পর মানুষ এখন ভরসা পেয়েছে। মনে হচ্ছে, সংক্রামক রোগে আর মানুষ মরবে না।

কিন্তু মানুষের চিরশত্রু অদৃশ্য এই জীবাণুরাও কম চালাক নয়। এই পৃথিবীতে মানুষের বহু আগে তাদের জন্ম। মানুষের হাতে নতুন এই অস্ত্র দেখে তারাও এখন সাবধান হয়েছে এবং তৎপর হয়েছে আত্মরক্ষার জন্য।

পেনিসিলিন জীবাণুর কাছে সাংঘাতিক এক বিষ। একটু একটু করে এই বিষ খেয়ে খেয়ে একদল জীবাণু এই বিষ এখন প্রতিরোধ করতে শিখেছে। পেনিসিলিনে এখন আর তাদের কিছু হয় না।

তাই নিত্য নতুন অ্যান্টিবাওটিক আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, পেনিসিলিন যেখানে হার মানে, অরিওমাইসিন সেখানে কাজ করে। স্ট্রেপ্টোমাইসিন যা পারে না ক্লোরোমাইসেটিন বা টেট্রাসাইক্লিন তা পারে।

কাজেই জীবাণুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে মানুষকে চিরদিন এমনি খোঁজই করতে হবে। যুগের পর যুগ ধরে এমনি চেষ্টাই করতে হবে। পুরনো অস্ত্র ফেলে দিয়ে নতুন অস্ত্র গড়তে হবে। যুদ্ধ ছাড়া এ পৃথিবীতে মানুষ কখনও বাঁচবে না।

স্যার আলেকজান্দার ফ্লেমিংএর মৃত্যু হয় ১১ই মার্চ ১৯৫৫ সালে; ৭৪ বৎসর বয়সে।

ভেলকি থেকে ভেষজ

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের ভারতবর্ষ। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে জনজাগরণ শুরু হয়েছে। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে ভারতবাসী স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে। শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে ভারতীয়রা যে অন্য কোন সভ্য মানুষের চেয়ে কোনো অংশেই ছোট নয় সবাই তা বুঝতে শিখেছে।

সেই সময় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জটিল এক বিষয় নিয়ে গবেষণার জন্য অখ্যাত এক ভারতীয় ডাক্তার লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ট্রপিকাল রোগের হাসপাতাল থেকে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গবেষণার জন্য এক আমন্ত্রণ পেলেন। ১৯২৩ সালে।

এই অখ্যাত ডাক্তারটির নাম ইয়েলাপ্রাগডা সুব্বারাও (১৮৯৬-১৯৪৮)।

অন্ধ্র দেশের পূর্ব গোদাবরী জেলায় সুব্বারাও-এর জন্ম। ১৮৯৬ সালে। তাঁর বাবা ছিলেন সরকারী আপিসের সামান্য এক কেরানী।

সুব্বারাও যখন শিশু তখনই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। কিন্তু কৈশোরে যখন তাঁর বড় ভাই মারাত্মক ট্রপিকাল স্প্রু রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন সুব্বারাও সব কিছু বুঝতে শিখেছেন। এই বড় ভাইটিকে তিনি খুব ভালবাসতেন।

সেই দাদা এমন অসুখে পড়লেন যে, দিনের পর দিন ডাক্তারের বাড়ি ছুটোছুটি করে ওষুধ এনে, এমনকি ভগবানের কাছে আকুল মিনতি করেও কোনো ফল হল না। একদিন তাঁর মৃত্যু হল।

ট্রপিকাল স্প্রু তখন অতি নির্মম মারাত্মক এক রোগ। কেন এ রোগ হয় কি করেই বা সারানো যায় ডাক্তাররা কিছুই তা জানেন না। শুধু জানা আছে, এ রোগে পেট খারাপ হয়। পরে সাংঘাতিক রক্ত-শূন্যতা হয়ে মৃত্যু ঘটে। এ রোগের যে কোন ওষুধ নেই বালক সুব্বারাও পর্যন্ত তা বুঝে ফেললেন।

সেইদিন মনে মনে সুব্বারাও কঠিন এক শপথ করে বসলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, বড় হয়ে এ রোগের কারণ তিনি খুঁজে বার করবেন এবং আবিষ্কার করবেন এই রোগের প্রতিকার।

তাই পরে একদিন তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী ক্লাসে ভর্তি হলেন। যথারীতি পাশ করে যখন তিনি ডাক্তার হলেন, তখনও তাঁর মনে সেই কঠিন সংকল্প। স্প্রু রোগের কারণ কি, তা খুঁজে দেখতে হবে। কি তার প্রতিকার তা জানতে হবে।

কাজেই প্র্যাকটিসে বসা তাঁর আর হল না। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফ্যাকালটিতে এই নিয়ে গবেষণার চেষ্টা করলেন। এক বৎসব ঐ ফ্যাকালটিতে কাজ করে সুব্বারাও বুঝলেন, এই কঠিন গবেষণা সামান্য এই ডাক্তারী বিদ্যায় হয় না। তাঁকে আরও অনেক শিখতে হবে। সে সুযোগ মাদ্রাজে নেই; কিন্তু লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ট্রপিকাল স্কুলে আছে।

অতএব গবেষণার মতো বিদ্যা শিখতে হলে তাঁকে বিলেত যেতে হয়। কিন্তু অত টাকা তিনি পাবেন কোথায়?

সুব্বারাও তাঁর বন্ধুদের কাছে সাহায্য চাইলেন। বড় বড দানবীরদেব সঙ্গে দেখা করলেন। ভাগ্যক্রমে বন্ধুদের সাহায্যে এবং মল্লদি সত্যলিঙ্গম লাইকার-এর দানে তাঁর বিলেত যাওয়ার টাকা যোগাড হল।

তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে গিয়ে ভর্তি হলেন। মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই সেখান থেকে ডক্টরেট উপাধি পেয়ে গেলেন।

সেই সময় আমেরিকার হারভার্ড ইউনিভার্সিটির ট্রপিক্যাল রোগের নামকরা অধ্যাপক ছিলেন ডাঃ রিচার্ড স্ট্রং। তিনি একদিন আমেরিকা থেকে লণ্ডনে এলেন এবং ট্রপিক্যাল রোগের হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন।

সুব্বারাও তখন সেই হাসপাতালে কাজ করেন। ডাঃ রিচার্ড স্ট্রংকে নিয়ে তিনি হাসপাতাল দেখালেন। ট্রপিক্যাল রোগ সম্বন্ধে এই হাসপাতালে কি গবেষণা হয় সব বোঝালেন। এই বিষয়ে দুজনের মধ্যে অনেক আলোচনা হল।

ডাঃ রিচার্ড স্ট্রং পরে এই আলোচনার সম্বন্ধে বলেছেন, লণ্ডন হাসপাতালে ঐ ভারতীয় ডাক্তারের প্রশ্ন শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ছোকরা যেন প্রশ্নের পর প্রশ্নের তীর হেনে আমাকে বিঁধতে লাগল। আর সে সব প্রশ্নের

কোন উত্তরই আমার জানা নেই। ওব প্রশ্নের একটি উত্তরও আমি দিতে পারলাম না। এমন অদ্ভুত অনুসন্ধিৎসু মন আগে কখনও আমি দেখিনি। ছোকরার উৎসাহে যেন এক বকমের উন্মাদনা আছে। তাই আমি তাকে হারভার্ডে এসে গবেষণা কবতে পরামর্শ দিয়েছি।

সুব্বারাও লণ্ডন ছেড়ে আমেরিকায এলেন। তারপর ডাঃ ষ্ট্রং-এর সাহায্যে বিখ্যাত হারভার্ড স্কুলে গবেষণার সুযোগ পেলেন। ১৯২৩ সালে। কিন্তু তাঁর পকেটে তখন দেড়শটি মাত্র টাকা। এই সামান্য টাকায় কদিন তিনি চালাবেন ?

কাজেই সুব্বারাও ল্যাবরেটরীতে আদালীর কাজ করতেন, রাস্তা থেকে উটকো বেড়াল ধবে পরীক্ষা-নিরীক্ষাব জন্য ল্যাবরেটরীতে বিক্রি করতেন। কখনও বা সামান্য কুলির মত চিমনির ময়লা সাফ করতেন। কথিত আছে, সেই সময শুধু দুধ এবং কিছু সেঁকা বিনস খেযে তিনি জীবন ধারণ কবেছেন।

এমনি কবে হারভার্ড ল্যাববেটরীতে কাজ কবে এক বছরের মধ্যেই তিনি গবেষণাব জন্য একটি বৃত্তি পেয়ে গেলেন।

এতদিন পবে সুব্বারাও বুঝেছিলেন, স্প্রু র কারণ বুঝতে হলে আগে বাযোকেমিষ্ট্রি খুব ভাল করে শেখা চাই। তাই দুটি বৎসর ধরে তিনি হারভার্ড ল্যাবরেটরীতে বিখ্যাত বায়োকেমিস্ট অটোফলিনের সঙ্গে এবং পরে ডাঃ সাইবাস এইচ ফিসকের সঙ্গে কাজ করলেন।

এমনি করে কাজ চালিযে একদিন সুব্বারাও জীবদেহে ফসফোবাসের অস্তিত্ব ধরায় নতুন এক ল্যাবরেটবী-প্রথা আবিষ্কার করে নিজের অজান্তে হঠাৎ একেবারে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেলেন। ১৯২৫ সালে। এই ফিস্ক-সুব্বারাও প্রথায় এখনও ফসফরাস সর্বদেশে ধরা হয়।

সুব্বারাও-এর প্রকৃতি ছিল নিরীহ। আত্মপ্রচার তিনি চাইতেন না। কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল দৃঢ। তাই বিজ্ঞানী মহলে বিশ্ববিখ্যাত হয়েও তিনি হারভার্ড ল্যাবরেটরীতে আত্মগোপন করে রইলেন। জনতার সামনে এসে আত্মপ্রকাশ করলেন না কিছুতেই।

বায়োকেমিষ্ট্রিতে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি এইচ ডি উপাধি দিল। ১৯৩০ সালে।

সুব্বারাও বুঝেছিলেন স্প্রু রোগের কারণ বুঝতে হলে আগে বায়োকেমিষ্ট্রি

ভাল করে শিখতে হবে। সেই বায়োকেমিষ্ট্রি তাঁর শেখা হল। এইবার তিনি নতুন করে আবার সেই গবেষণায় মন দিলেন। দশটি বছর ধরে এই গবেষণা চলল। হারভার্ডের ঐ ল্যাবরেটরীতে। এই সময় কখনও কখনও তিনি ছাত্রদের পড়িয়েছেন, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই তাঁর কেটেছে ঐ গবেষণায়। এমনও হয়েছে, রাত দিন তিনি ল্যাবরেটরীতে কাটিয়েছেন। মাত্র দুটি ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে বাকি বাইশ ঘণ্টা তাঁকে হয় ল্যাবরেটরীতে নয়ত লাইব্রেরীতে দেখা গেছে।

তখন বোস্টনের ডাক্তার রিচার্ড মিনো কাঁচা লিভার খাইয়ে দুরারোগ্য পারনিসাস অ্যানিমিয়ার চিকিৎসা প্রবর্তন করেছেন। স্প্রুতেও সাংঘাতিক রক্তশূন্যতা হয়। দেখা গেছে এই লিভার খাইয়ে অথবা লিভার এক্সট্রাক্ট ইনজেকশন দিয়ে কিছু উপকার হয়।

সুব্বারাও ভাবলেন, লিভার এক্সট্রাক্টএ নিশ্চয়ই এমন কোনো বস্তু আছে যা এ রোগ প্রতিরোধ করে। কি সে বস্তু?

তাই তিনি রাসায়নিক উপায়ে লিভার এক্সট্রাক্ট ভাঙ্গতে শুরু করলেন। রাসায়নিক কোন কোন দ্রব্য মিলে এই জিনিস তৈরী হয়, তার সন্ধানে তৎপর হলেন।

কিন্তু কাজে নেমে দেখলেন এ জিনিস বার করা অত সহজ নয়। এজন্য আলাদা যন্ত্রপাতি চাই। বড় গবেষণাগার চাই।

তাঁব মনে হল, বিরাট এই গবেষণা হারভার্ডের মতো ছোট্ট এই ল্যাবরেটরীতে কখনও সম্ভব হবে না।

ঠিক সেই সময় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, আমেরিকান সায়নামাইড কোম্পানীর লেডারলি ল্যাবরেটরী থেকে এক ডাক এল। অত বড় ল্যাবরেটরীর গবেষণা বিভাগ চালানোর জন্য সুব্বারাও এক আমন্ত্রণ পেলেন।

আমেরিকান সায়নামাইড কোম্পানী যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। লেডারলির গবেষণা বিভাগ এই প্রতিষ্ঠানেরই ভিন্ন একটি শাখা।

এই লেডারলির সঙ্গে সুব্বারাও-এর প্রথম পরিচয় হয় ডাঃ ক্লার্কের মাধ্যমে। ডাঃ ক্লার্ক লেডারলিতে লিভার এক্সট্রাক্ট নিয়ে কাজ করতেন। তাই মাঝে মাঝে তাঁকে হারভার্ডে আসতে হত।

সুব্বারাও হারাভার্ডে লিভার এক্সট্রাক্ট ভাঙ্গতে শুরু করেছেন। তাই

দুজনের মধ্যে পরিচয় হল। ক্লার্কের আমন্ত্রণে সুব্বারাও নিজেও লেডারলিতে আসতে লাগলেন।

সুব্বারাও দেখলেন, হারভার্ডের এই ল্যাবরেটরী লেডারলির কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। হারভার্ডে মেডিক্যাল স্কুল, হাসপাতাল এবং ল্যাবরেটরী সব মিলিয়ে ১৩ লক্ষ ডলার মাত্র খরচ হয়; আর লেডারলিতে শুধু গবেষণার জন্যই খরচ হয় ২৬ লক্ষ ডলার।

কাজেই যখন সুব্বারাও দেখলেন, এই বিরাট গবেষণাগারের সহকারী পরিচালকের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, তখন গবেষণায় এখানে অনেক বেশী সুবিধে হবে ভেবে তিনি একাজ গ্রহণ করলেন, ১৯৪০ সালে। দুই বৎসরের মধ্যেই সুব্বারাও এই প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা হয়ে গেলেন। এইবার পরিচালকের পদটি তাঁকে দেওয়া হল। তিনি হলেন ডাইরেক্টর অফ রিসার্চ। ১৯৪২ সালে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এত বড় সম্মান এর আগে অন্য কোনো ভারতীয় আমেরিকায় কখনও পান নি। তাঁর অধীনে তখন তিনশজন বড় বড় বিজ্ঞানী।

খ্যাতির এই উচ্চ শিখরে উঠেও সুব্বারাও জনতার সামনে এগিয়ে এলেন না। এমনকি তাঁর নিজের দেশ ভারতবর্ষেও একথার কোনো প্রচার হল না। সর্বদা তিনি নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, আত্মপ্রচার অপছন্দ করতেন। তাঁর ল্যাবরেটরীতে বড় ছোট সব কর্মীরাই তাঁকে 'সুব' বলে ডাকত। সবাই তাঁকে ভালবাসত।

লেডারলিতে এসেই সুব্বারাও প্রথমে এক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করলেন। গবেষণা সম্বন্ধে যেখানে যা কিছু তথ্য বেরিয়েছে, সব এই লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করলেন। দেখতে দেখতে এই লাইব্রেরী বড় হল। এখন সেই লাইব্রেরী পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক রেফারেন্স লাইব্রেরীতে পরিণত হয়েছে। তাঁর সম্মানের জন্য এই লাইব্রেরীর নাম দেওয়া হয়েছে সুব্বারাও মেমোরিয়াল লাইব্রেরী।

সুব্বারাও বুঝেছিলেন, আজকালকার মত জটিল এবং উন্নত টেকনোলজির যুগে বায়োকেমিস্ট্রির কোনো আবিষ্কার একা কোনো ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে আর সম্ভব নয়। এ কাজের জন্য দল চাই। সেই দল আবার ঠিকমত তৈরী হওয়া চাই।

সুব্বারাও তাই ষোলোজন বিজ্ঞানী নিয়ে একটা দল তৈরি করলেন; ১৯৪৩ সালে। তার মধ্যে আটজন লেডারলির; এবং বাকি আটজন লেডারলির সংযুক্ত ক্যালকো কোম্পানীর। এঁদের কাজ হল খাদ্যে পুষ্টির অভাবে অথবা স্প্রু হয়ে যে রক্তশূন্যতা হয়, তার কারণ খোঁজা।

দুই বৎসরের চেষ্টায় সুব্বারাও-এর পরিচালনায় এই দল রক্তশূন্যতার সেই কারণ খুঁজে পেল। ফলিক অ্যাসিড আবিষ্কার হল। এতদিনে বোঝা গেল খাদ্যবস্তুতে এই জিনিসের অভাবেই স্প্রু রোগ হয়। লিভারে এই জিনিস থাকে। তাই খুব বেশী করে লিভার খেলে অথবা ইনজেকশন নিলে কিছু উপকার পাওয়া যায়।

সুব্বারাও-এর নেতৃত্বে এই দল কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক পদ্ধতিতে হলদে রঙএর এই ফলিক অ্যাসিড ল্যাবরেটরীতে তৈরি করতে সক্ষম হল। ১৯৪৫ সালে। রক্তশূন্যতা রোগের নতুন এক অস্ত্র চিকিৎসকের হাতে এল। এতদিনে সুব্বারাও-এর ছেলেবেলার সেই স্বপ্ন সফল হল।

স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিন যখন আমেরিকায় আসে, তখন লেডারলির কারখানায় তা তৈরি করা সম্ভব হয় এই সুব্বারাও-এরই চেষ্টায়।

সেই থেকে অন্য সব বিজ্ঞানীদের মত সুব্বারাও নিজেও ভাবলেন, কৃত্রিম উপায়ে এই পেনিসিলিন তৈরি করার গবেষণা করতে হবে। কিন্তু অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি বুঝলেন কৃত্রিম উপায়ে পেনিসিলিন তৈরীর চেষ্টা না করে নতুন নতুন অ্যান্টিবাওটিক তৈরি করার প্রয়োজন অনেক বেশী। কারণ পেনিসিলিনে সব জীবাণু ধ্বংস হয় না। পেনিসিলিন যা পারে না, সেই জীবাণু ধ্বংসের জন্য নতুন আরো অ্যান্টিবাওটিক চাই।

কাজেই পেনিসিলিনের মত ছাতা নিয়ে যে সব বিজ্ঞানী কাজ করেছেন, সেই রকম একজন বিজ্ঞ লোকের সন্ধান তিনি শুরু করলেন। ভেবে ভেবে তাঁর মনে পড়ল, এই রকম একটি পণ্ডিত লোক আছেন, তাঁর নাম বেঞ্জামিন ডাগার। সম্প্রতি তিনি উইনকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়েছেন।

সুব্বারাও এই ডাগারকে আমন্ত্রণ করে লেডারলিতে নিয়ে এলেন এবং নতুন এক অ্যান্টিবাওটিকের গবেষণায় লাগালেন। ১৯৪৫ সালে ডাগার অরিওমাইসিন আবিষ্কার করলেন। পেনিসিলিন যেখানে হার মানে, এই অরিওমাইসিন সেখানে কাজ করে।

সুব্বারাও-এর চেষ্টায় এই অরিওমাইসিন সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা শুরু হল।

নিউ ইয়র্কের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিতে ১৯৪৮ সালে এক বক্তৃতায় ডাঃ বেঞ্জামিন ডাগার বলেছেন, এই অরিওমাইসিন আবিষ্কারের জন্য সকলের আগে আমি পরলোকগত ডাঃ সুব্বারাও-এর কাছে ঋণ স্বীকার করি। তাঁরই চালনায় এবং নিয়ত উৎসাহে এই আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

সুব্বারাও-এর পরিচালনায় আরও একটি যুগান্তকারী ওষুধের আবিষ্কার হয়েছে। তার নাম হেটরাজান। ফাইলেরিয়া রোগে আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ লোক আজ এই ওষুধে রোগমুক্ত হচ্ছে।

সুব্বারাও অনেক সময় বলতেন, আমি জন্মেছি কিছু না নিয়ে, তেমনি মরবও কিছু না নিয়ে। তাই তাঁর যা কিছু সম্পদ, যা কিছু তিনি রোজগার করেছেন সবই পরকে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন।

তাঁর ল্যাবোরেটরীতে একটি মেয়ে কাজ করত। তার একদিন যক্ষ্মা হল। মেয়েটিব আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না। তাই সুব্বারাও দীর্ঘ আটটি বৎসর ধরে তাঁর মাইনের অর্ধেক টাকা দিয়ে এই মেয়েটির টি বি স্যানাটোরিয়ামের খরচ চালিয়েছেন।

কোনো মেডিক্যাল ছাত্র মাইনে দিতে পারে নি কিংবা কোনো রুগী হাসপাতালের খরচ দিতে পাচ্ছে না শুনলেই সুব্বারাও তক্ষুণি তা মিটিয়ে দিতেন। গির্জার মর্টগেজ ছাড়াতে অথবা রামকৃষ্ণ মিশনেও তিনি নিয়মিত দান করতেন।

এত বড একজন বিজ্ঞানীর অদ্ভুত এক দুর্বলতা ছিল শিশুদের প্রতি। শিশুদের তিনি কী ভালো যে বাসতেন তা বোঝা যেত বড়দিনের সময়। প্রতি বৎসর এই দিনে সুব্বারাও সর্বস্বান্ত হয়ে যেতেন। গরীব শিশুদের জন্য উপহার কিনে কিনে সব টাকা তাঁর খরচ হত। তারপর দেখা যেত নিজের জন্য একটি পয়সাও তার পকেটে নেই।

সেদিন সোমবার, ৯ই আগস্ট, ১৯৪৮ সাল। রোজকার মত সুব্বারাও আজ আর ল্যাবোরেটরীতে এলেন না। একজন সহকর্মী তাঁর ঘরে গিয়ে দেখল, তখনও তিনি বিছানায়। পরম আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে সুব্বারাও ঘুমিয়ে আছেন। আগের রাত্রে করোনারি থ্রম্বোসিসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ভারতবর্ষে বোম্বাই শহরের কাছে বুলসরে লেডারলি ল্যাবোরেটরী যে

বিরাট একটি ওষুধের কারখানা তৈরী করেছেন, তা এই সুব্বারাও-এর স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করা।

এই কারখানার মুখেই সুব্বারাও-এর যে আবক্ষ প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে, তার চারিধারে খোদাই করে লেখা আছে, বিজ্ঞান শুধুই জীবনের পরমায়ু বাড়ায়, কিন্তু ধর্ম তা প্রগাঢ় করে। সুব্বারাও-এর নামের নিচে লেখা হয়েছে, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, দার্শনিক এবং মানবধর্মী। এই কারখানা প্রথম যেদিন খোলা হয় সুব্বারাও-এর বৃদ্ধা মা এই মূর্তি উদঘাটিত করেন। মে মাসে ১৯৫৩ সালে।

বিশ হাজার বছর ধরে অথবা তারও বহু পূর্ব থেকে যুগে যুগে মানুষ এমনি করেই রোগের কারণ খুঁজেছে আর খুঁজেছে তার প্রতিকার। যুগ যুগ ধরে এমনি করে খুঁজেছে বলেই সে পেয়েছে ভেলকি থেকে ভেষজ।

একজনের আবিষ্কারে অন্য সব লোক রোগমুক্ত হয়েছে। আবিষ্কারক নিজে হয়ত অন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন।

এই মানুষের ভাগ্য। এই তার স্বভাব। রোগ যতদিন আছে, মানুষও ঠিক ততদিন তার কারণ খুঁজে বেড়াবে আর খুঁজবে তার প্রতিকার। এই খোঁজা যেদিন শেষ হবে এ পৃথিবীতে মানুষ সেদিন থাকবে না।

শেষ

পরিশিষ্ট

এই গ্রন্থের যাবতীয় উপাদান এবং ছবি যে সব পুস্তক এবং পুস্তিকা থেকে নেওয়া হয়েছে তার তালিকা :—

1. The Doctor in History—Howard W. Haggard, M.D., Associated Professor of applied Physiology in Yale University, New Haven, Yale University Press, London, Humphry Milford, Oxford University Press, 1934.
2. Devils, Drugs and Doctors—Howard W. Haggard, M.D. Cardinal Edition, Pocket Books, Inc., New York, N. Y. 1954.
3. An Introduction to the History of Medicine—Fielding H. Garrison, A.B., M D. W. B. Saunder & Co. 1929.
4. A History Medicine—Ralph Major, M.D. Charles C. Thomas, Springfield, Illinois.
5. Science Digest, Vol. 34. No. 3., Sept. 1953.
6. A Short History of Nursing—Dock and Steuart, G. P. Putnam & Sons.
7. Milestones of Medicine—Ruth Fox, Raudon House, N. Y.
8. The Molds and Man—Clyde M. Christensen, University of Minnesota Press.
9. Indian Journal of Medical Sciences, April 1958. Medical Meetings & Conferences in Ancient India—P. M. Mehta, Director, Central Insitute of Research in Indigenous System of Medicine, Jamnagar.
10. America Before Man—Elizabeth Chesley Baity, The Viking Press, N. Y.
11. Patients & Doctors—Kenneth Walker, Penguin Book.

12. Masters of Medicine—Harley Williams, PAN Books, London 1954.
13. Great Adventures in Medicine—Samuel Rapport & Helen Wright. Dial Press, N. Y. 1952.
14. The Story of Medicine—Victor Robinson M. D., Prof. of History of Medicine, Temple University School of Medicine, Philadelphia, The New House Library, New York 1944.
15. Men Against Death—Paul De Kruif, Armed Service Edition N.Y.
16. Microbe Hunters—Paul de Kruif, Pocket Book Edition N. Y.
17. Joseph Lister—Rhoda Truax, Armed Service Edition, N.Y.
18. A General Medical Service for the Nation—British Medical Association Nov. 1938.
19. Surgeons Heritage—James Harpole.
20. Lederle Bulletin 1957. 10th anniversary issue.
21. Kalazar—U. N. Brahmachari.
22. Calcutta Medical Journal Vol. 50. No. 8. Aug., 1953.
23. Scientific Work of Sir U. N. Brahmachari.
24. Post Graduate Lectures in Surgery, University of Edinburgh.
25. The Story of Civilisation—Will Durant, Simon & Schuster, New York 1942.